UNIVERSITY
BENGALI SELECTIONS

ABRIDGED EDITION

UNIVERSITY OF CALCUTTA
1972

ভূমিকা

এই পুস্তকে সঙ্কলিত রচনাগুলি প্রকাশের জন্য যে সকল স্বত্বাধিকারী আমাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সূচী

পদ্যাংশ

UNIVERSITY BENGALI SELECTIONS

পদ্যাংশ

ফুল্লরার বারমাস্যা

ধীরে ধীরে কহে রামা যত দুঃখ-বাণী।
ভাঙ্গা কুড়ে ঘর, তালপাতার ছাউনি।।
ভেরেণ্ডার থাম ওই আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।।
বৈশাখে অনল-সম বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা।।
পা পোড়ায় খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞ্চার বসন।।
বৈশাখ হৈল বিষ গো, বৈশাখ হৈল বিষ।
মাংস নাহি খায়—সর্ব্বলোক নিরামিষ।।

পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন।
রবিকর করে সর্ব্ব শরীর দহন।।
পসরা এড়িয়া জল খাইতে যাইতে নারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে লয় আধা-সারি।।
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস, পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস।
বঁইচির ফল খেয়ে করি উপবাস।।

আষাঢ়ে পূরিল মহী নব-মেঘে জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল।।
মাংসের পসরা লইয়া ফিরি ঘরে ঘরে।
কিছু খুদ কুড়া পাই, উদর না ভরে।।
কি কহিব দুঃখ মোর কহনে না যায়।
কাহারে বলিব বল দোষী বাপ মায়।।

শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবসরজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।।
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী।।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
লঘু বৃষ্টি হইলে কুড়েতে আইসে বান।।

ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
নদনদী একাকার আট দিকে জল।।
কিরাতনগরে বসি না মিলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি যেবা সহে ভার।।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
বৃষ্টি হইলে কুড়্যায় ভাসিয়া যায় বান।।

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে।
ছাগ মেষ মহিষ দিয়া বলিদানে।।
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।।
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ-মাংস সবাকার ঘরে।।

কার্ত্তিক মাসেতে হইল হিমের জনম।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।।
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।।
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।
পিরাণ দোপাটা দিতে করে টানাটানি।।

মাসমধ্যে মার্গশীর্ষ আপনি ভগবান্।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান।।
উদর ভরিয়া ভক্ষ্য দিল বিধি যদি।
যম-সম শীত তাহে নিরমিল বিধি।।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।।

পৌষে প্রবল শীত, সুখী জগজনে।
তৈল তুলা তনুনপাৎ তাম্বুল তপনে।।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।
অভাগী ফুল্লরা-মাত্র শীতের ভাজন।।
হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা।
পরিতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধুলা।।
বৃথা বনিতাজনম, বৃথা বনিতাজনম।
ধূলিভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন।।

মাঘ মাসে অনিবার সদাই কুজ্মটী।
আঁধারে লুকায় মৃগ, না পায় আখেটী।।
ফুল্লরার আছে যত কর্ম্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক।।

নিদারুণ মাঘ মাস, নিদারুণ মাঘ মাস।
সর্ব্বজন নিরামিষ কিংবা উপবাস।।

সহজে শীতল ঋতু ফাল্গুনে মাসে।
পোড়য়ে যুবতীগণ বসন্ত বাতাসে।।
কত না ভুগিব আমি নিজ কর্ম্মফল।
মাটিয়া পাথর বিনা না আছে সম্বল।।
শুন মোর বাণী রামা, শুন মোর বাণী।
কোন সুখে মোর সনে হইবে ব্যাধিনী।।

মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ।।
অনলসমান পোড়ে চইতের খরা।
চালু সেরে বাঁধা দিনু মাটিয়া পাথরা।।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান।।

ফুল্লরার কথা শুনি কহেন পার্ব্বতী।
আজি হৈতে দূর হৈল সকল দুর্গতি।।
আজি হৈতে মোর ধনে আছে তোর অংশ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গান ভৃগুবংশ।।

—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

বীরবাহুর পতনে

সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি, অমৃতভাষিণি!
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলা-বিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন-কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি!
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি।
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক! ঊর তবে ঊর, দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত: ঊরি দাসে দেহ পদচ্ছায়া।

তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন মধু
লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ্, নতভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত,
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকসিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা, যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে।
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়, মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা,
হর-কোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধররূপে।
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ-মুরতি,
পাণ্ডব-শিবিরদ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধ বহি,

অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী-লহরী, মরি! মনোহর, যথা
বাঁশরী-স্বরলহরী গোকুল-বিপিনে!
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা,
স্বহস্তে গড়িলা তুমি, তুষিতে পৌরবে?

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে। ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। করযোড় করি
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্বকলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
একমাত্র বাঁচে বীর; যে কাল-তরঙ্গ,
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।

এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগৎ, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে। কতক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ :
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে

কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল-কুল-মান এ কাল-সমরে!
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলিশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায় শূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে তোর দুঃখে দুঃখী
পাবক শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায়, ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুম-দাম-সজ্জিত, দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;

তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে করিতে বাস বাসনা আঁধারে?"

এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ হায় রে, মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয় পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।

তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে,—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে।
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"

উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি;—
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য প্রধান
সারণ! জানি হে আমি, এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল বিকল-হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,

যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"
এতেক কহিয়া রাজা দূত পানে চাহি,
আদেশিলা, "কহ দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?"

প্রণমি রাজেন্দ্র-পদে করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত;—"হায়, লঙ্কাপতি!
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীর কুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে।
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে,
সিংহনাদে, জলধির কল্লোলে; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে!
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর!
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহুসহ
রণে, যূথনাথসহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে; বিদ্যুৎঝলাসম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে! ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কতক্ষণ পরে

প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব;
কনক মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,—” এতেক ক’হ, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্ব্বদুঃখ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরী-মনোহর ;—“কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?”

“কেমনে, হে মহীপতি,” পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত ;—“কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি!
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীমদন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে, চৌদিকে এবে সমবতরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ুসহ
নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশিরবে!—
আর কি কহিব, দেব? পূর্ব্বজন্ম-দোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি। হায়, রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈম লঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহুসহ
রণভূমে, কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে, পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।”

এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা;—"সাবাসি দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল-ফণী
কভু কি অলসভাবে নিবসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা বীরপুত্রধারী! চল, সবে,
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্‌জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীরচূড়ামণি
বীরবাহু; চল দেখি জুড়াই নয়নে।"

মধুসূদন দত্ত

ঐকতান

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্ত্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক
রয়ে গেছে ফাঁক।
কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা-একতান
কত না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।
দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়,
আমার অন্তরে বারবার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।
দক্ষিণ মেরুর ঊর্দ্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহাজনশূন্যতায় রাত্রি তার করিতেছে সারা,
সে আমার অর্দ্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব্ব আলোকে।
সমুদ্রের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর
মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্বর।
প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানাদিক্ হ'তে—
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ;
গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ—
নিখিলের সংগীতের স্বাদ।।

সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্ব্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,

বাধা হ'য়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল ;—
বহুদূর-প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্ম্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্ব্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হ'লে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্ব্বত্রগামী।।

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্ম্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা ক'রেছে অর্জ্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি' কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারিনি দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।।
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজদুরি।
এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্ব্বাক মনের
মর্ম্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।

প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাওতো উদ্ধারি।

সাহিত্যের ঐকতান-সংগীত-সভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি ;—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বারাণসী

যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল—'দেখা যায় বারাণসী!'
চমকি চাহিনু, স্বর্গ সুষমা মর্ত্যে প'ড়েছে খসি'।
এ পারে সবুজ বজ্রবার ক্ষেত, ও পারে পুণ্য-পুরী,
দেবের চৌপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ-ঝুরি;
শারদ দিনের কনক আলোকে কিবা ছবি ঝলমল,—
অযুত যুগের পূজা-উপচার,—হেম চম্পকদল।

আধ-চাঁদখানি রচনা করিয়া গঙ্গা রয়েছে মাঝে,
স্নেহ-সুশীতল হাওয়াটি লাগায় তপ্ত দিনের কাজে।
জয়! জয়! বারাণসী!
হিন্দুর হৃদি-গগনের তুমি চির-উজ্জ্বল শশী।

অর্দ্ধমহোত্রী মিলেছে হেথায় ব্রহ্মর্ষিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে।
এই সেই কাশী ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিল এইখানে,
খ্যাত যাঁর নাম শাক্যমুনির জাতকে, গাথায়, গানে ;—
যাঁর রাজত্ব-সময়ে বুদ্ধ জন্মিলা বার বার,
ন্যায়-ধর্ম্মের মর্য্যাদা প্রেমে করিতে সমুদ্ধার।
এই সেই কাশী—ভারতবাসীর হৃদয়ের রাজধানী,
এই বারাণসী জাগ্রত চোখে স্বপন মিলায় আনি'!

এই পথ দিয়া ভীষ্ম গেছেন ভারত-ধুরন্ধর—
কাশী-নরেশের কন্যারা যবে হইল স্বয়ংবর।
সত্য পালিতে হরিশ্চন্দ্র এই কাশীধামে, হায়,
পুত্র-জায়ায় বিক্রয় করি' বিকাইলা আপনায়।
তেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র সাধনায় করি' জয়—
হেথা লভিলেন তিনটি বিদ্যা সৃষ্টি, পালন, লয়,
বিন্যাস যিনি জ্যোতিষ পুঞ্জ করিলেন সমাহার,-
নূতন স্বর্গ করিলেন যিনি আপনি আবিষ্কার।

শুদ্ধোদনের স্নেহের দুলাল ত্যজিয়া সিংহাসন
করুণা-ধর্ম্ম হেথায় প্রথম করিলা প্রবর্ত্তন।
এই বারাণসী কোশল-দেবীর বিবাহের যৌতুক—
দেখিতেছি যেন বিম্বিসারের বিস্মিত স্মিত-মুখ!

নৃপতি অশোকে দেখিতেছি চোখে বিহারের পৈঠায়,
শ্রমণগণের আশীর্ব্বচনে প্রাণ মন উথলায়।
সম্মুখে হাজার স্থপতি মিলিয়া গড়িছে বিরাট স্তূপ,
শত ভাস্কর রচে বুদ্ধের শত জনমের রূপ।
চিক্কণ চারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী
ধর্ম্মাশোকের মৈত্রী-করুণ অনুশাসনের লিপি।
মহাচীন হ'তে ভক্ত এসেছে মৃগদাব-সারনাথে,
স্তূপের গায় চিত্র করিছে সূক্ষ্ম সোণার পাতে।
জয়! জয়! জয় কাশী।
তুমি এসিয়ার হৃদয়-কেন্দ্র,—মূর্ত্ত ভকতিরাশি!

এই কাশীধামে ভক্ত তুলসী লিখেছেন রামকথা,—
ভকতি যাঁহার অপ্রমত্ত প্রভুপদে সংযতা।
এই কাশীধামে জোলাদের ছেলে কবীর রচিল গান,
যাঁহার দোঁহায় মিলেছিল দুই হিন্দু মুসলমান।
এই কাশীধামে বাঙ্গালীর রাজা মরেছে প্রতাপ রায়,
যাঁর সাধনায় নবীন জীবন জেগেছিল বাংলায়।
মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই—শুধু শিব!
মনে লয় মোর হেথা একদিন মিলিবে নিখিল জীব;
আত্মার সাথে হবে আত্মার নবীন আত্মীয়তা,
মিলনধর্ম্মী মানুষ মিলিবে; নহে এ স্বপ্নকথা।
জয় কাশী! জয়! জয়!
সারা জগতের ভকতি-কেন্দ্র হবে তুমি নিশ্চয়!

স্ফটিক-শিলার বিপুল বিলাস মাত্র নহ তো তুমি
আমি জানি তুমি আনন্দধাম ছুঁয়ে আছ মরুভূমি,
আমি জানি তুমি ঢাকিয়াছ হাসি ভ্রূকুটির মসীলেপে,
অমৃত-পাত্র লুকায়ে রেখেছ সময় হয়নি ভেবে;
তৃষিত জগৎ খুঁজিতেছে পথ, ডেকে লও, বারাণসি!
পথিকের প্রীতে প্রদীপ জ্বালিয়া কেন আছ দূরে বসি?

মধু-বিদ্যায় বিশ্ব-মানব দীক্ষিত কর আজ,
ঘুচাও বিরোধ, দম্ভ ও ক্রোধ, ক্ষতি, ক্ষোভ, ভয়, লাজ।
সার্থক হ'ক সকল মানব, জয়ী হ'ক ভালবাসা,
সংস্কারের পাষাণ-গুহায় পড়ুক কর্ম্মনাশা।

ব্যাসের প্রয়াস ব্যর্থ সে কভু হবেনাকো একেবারে,
সবারেই দিতে হবে গো মুকতি এ বিপুল সংসারে।
তুমি কি কখনো করিতে পার গো শুচি-অশুচির ভেদ?
তুমি যে জেনেছ চরাচর-ব্যাপী চিরজনমের বেদ!
স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম অবধি অভেদ ব'লেছ তুমি,—
ভেদের গণ্ডী তুমি রাখিয়ো না, আয় বারাণসী-ভূমি।
ঘোষণা ক'রেছ আশ্রয়ে তব ক্ষুধিত রবে না কেহ;—
প্রাণের অন্ন দিবে না কি হায়? কেবলি পুষিবে দেহ?

দাও সুধা দাও, পরাণের ক্ষুধা চিরনিবৃত্ত হোক্,
বিশ্বনাথের আকাশের তলে মিলুক সকল লোক।
অখিল জনের হৃদয়ে রাজ্য কর তুমি বিস্তার,
সকল নদীর সকল হৃদির হও তুমি পারাবার।
পর যে মন্ত্রে আপনার হয় সে মন্ত্র তুমি জানো,
বিমুখ বিরূপ জগত-জনেরে মুগ্ধ করিয়া আনো।
বিচিত্র মালা কর বিরচন নানা বরণের ফুল,
অবিরোধে লোক সার্থক হোক্ পাশাপাশি মিলেজুলে,
দূর ভবিষ্য নিখিল বিশ্ব যে ধনের আশা করে—
তুমি বিতরিয়া দাও সে অমৃত জগত-জনের করে।
জয়! বারাণসী জয়!
অভেদ-মন্ত্রে জয় কর তুমি জগতের সংশয়।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ইন্দ্রপতন

তখনো অস্ত যায়নি সূর্য, সহসা হইল শুরু
অম্বরে ঘন ডম্বরু-ধ্বনি গুরু গুরু গুরু গুরু!
আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন্ ইন্দ্রের আগমনী?
শুনি, অম্বুদ-কম্বু-নিনাদে ঘন বৃংহিত ধ্বনি।
বাজে চিক্কুর-হ্রেষা-হর্ষণ মেঘ-মন্দুরা-মাঝে,
সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলয়ঙ্কর সাজে!

ঘনায় অশ্রু-বাষ্প-কুহেলি ঈশান-দিগঙ্গনে
স্তব্ধ বেদনা দিগ্-বালিকারা কি যেন কাঁদনি শোনে!
কাঁদিছে ধরার তরু, লতা, পাতা, কাঁদিতেছে পশুপাখী,
ধরার ইন্দ্র স্বর্গে চলেছে ধূলির মহিমা মাখি'!

বাজে আনন্দ-মৃদং গগনে, তড়িৎ-কুমারী নাচে,
মর্ত্য-ইন্দ্র বসিবে গো আজ স্বর্গ-ইন্দ্র-কাছে!
সপ্ত-আকাশ সপ্তস্বরা হানে ঘন করতালি,
কাঁদিছে ধরায় তাহারি প্রতিধ্বনি—খালি, সব খালি!

হায় অসহায় সর্বংসহা মৌনা ধরণী মাতা,
শুধু দেব-পূজা তরে কি মা তোর পুষ্প, হরিৎ-পাতা?
তোর বুকে কি মা চির-অতৃপ্ত রবে সন্তান-ক্ষুধা?
তোমার মাটির পাত্রে কি গো মা ধরে না অমৃত-সুধা?

জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে-কেহ আনিবে অমৃত-বারি
অমৃত-অধিপ দেবতার রোষ পড়িবে কি শিরে তারি?
হয়ত তাহাই, হয়ত নহে ত—এটুকু জেনেছি খাঁটি,
তারে স্বর্গের আছে প্রয়োজন যারে ভালোবাসে মাটি!

কাঁটার মৃণালে উঠেছিল ফুটে যে চিত্ত-শতদল,
শোভেছিল যহে বাণী-কমলার রক্ত চরণ-তল,
সম্ভ্রমে নত পূজারী মৃত্যু ছিঁড়িল সে শতদলে—
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অর্পিবে ব'লি' নারায়ণ-পদতলে!

জানি জানি মোরা শঙ্খ চক্র গদা যার হাতে শোভে—
পায়ের পদ্ম হাতে উঠে তাঁর অমর হইয়া রবে!
কত সান্ত্বনা আশা-মরীচিকা কত বিশ্বাস-দিশা
শোক-সাহারায় দেখা দেয় আসি', মেটে না প্রাণের তৃষা

আজ শুধু জাগে তব অপরূপ সৃষ্টি-কাহিনী মনে,
তুমি দেখা দিলে অমিয় কণ্ঠ বাণীর কমল বনে!
কখন্ তোমার বীণা ছেয়ে গেল সোনার পদ্ম দলে,
হেরিন্ সহসা ত্যাগের তপন তোমার ললাট-তলে!

লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বাণী,
শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি কণ্ঠে গরল দানি',
বিষ্ণু দিলেন ভাঙনের গদা, যশোদা-দুলাল বাঁশী,
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর, মৃগাঙ্ক দিল হাসি।

চীর গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারত-জননী কাঁদি'
প্রতাপ শিবাজী দানিল মন্ত্র, দিল উষ্ণীষ বাঁধি'।
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারা দিল মন্দার-মালা, মানব মাখালো ধূলি।

নিখিল চিত্তরঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি'—
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্ম্মী, জ্ঞানী!
হিমালয় হ'তে বিপুল বিরাট, উদার আকাশ হ'তে,
বাধা-কুঞ্জর তৃণসম ভেসে গেল তব প্রাণস্রোতে!

ছন্দোগানের অতীত হে ঋষি, জীবনে পারিনি তাই
বন্দিতে তোমা', আজ আনিয়াছি চিত্ত-চিতার ছাই—
বিভূতিতিলক! কৈলাস হতে ফিরেছ গরল পিয়া,
এনেছি অর্ঘ্য শ্মশানের কবি ভস্মবিভূতি নিয়া!

নাও অঞ্জলি, অঞ্জলি নাও, আজ আনিয়াছি গীতি
সারা জীবনের না-কওয়া-কথার ক্রন্দন-নীরে তিতি'!
এত ভালো মোরে বেসেছিলে তুমি, দাওনিক অবসর
তোমারেও ভালোবাসিবার, আজ তাই কাঁদে অন্তর!

তোমারে দেখিয়া কাহারও হৃদয়ে জাগেনিক সন্দেহ—
হিন্দু কিংবা মুসলিম তুমি অথবা অন্য কেহ।
তুমি আর্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি,
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি।

হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজিব,
যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শিব!
নিন্দা গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া বাউল, মিলন হেতু
হিন্দু মুসলমানের পরাণে তুমিই বাঁধিলে সেতু।

জানি না আজিকে কি অর্ঘ্য দেবে হিন্দু মুসলমান,
ঈর্ষা-পঙ্কে পঙ্কজ হয়ে ফুটুক এদের প্রাণ!
হে অরিন্দম মৃত্যুর তীরে ক'রেছ শত্রু জয়,
প্রেমিক! তোমার মৃত্যুশ্মশান আজিকে মিত্রময়।

তাই দেখি, যারা জীবনে তোমায় দিল কণ্টক হুল,
আজ তাহারাই এনেছে অর্ঘ্য নয়ন-পাতার ফুল!
কে যে ছিলে তুমি জানিনাক কেহ দেবতা কি আউলিয়া
শুধু এই জানি, হেরে আর কারে ভরেনি এমন হিয়া।

* * *

অসুর নাশিনী জগন্মাতার অকাল উদ্বোধনে
আঁখি উপাড়িতে গেছিলেন রাম, আজিকে পড়িছে মনে,
রাজর্ষি! আজি জীবন উপাড়ি দিলে অঞ্জলি তুমি,
দনুজ দলনী জাগে কিনা—আছে চাহিয়া ভারতভূমি।

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

গৌরচন্দ্রিকা

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব।।
কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম- কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর।।
চঞ্চল চরণ- কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত অগোর।।
অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরণে
অখিল-মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর।।

—গোবিন্দদাস

দীপ-শিখা

তপন যখন অস্ত মগন ভুবন ভ্রমণ শেষে,
আমি তপনের স্বপন দেখি গো, পথিক-বধূর বেশে।
সারা দেহে মোর জ্বালিয়া অনল,
এলাইয়া দিই ধূম কুন্তল,
কালো-অঞ্চল ছায়া হ'য়ে লোটে চরণের তলদেশে,
মোর দেহময় দাহনের জয় তপনের উদ্দেশে।

মাটির বাটিতে স্নেহরস শুষি', বুন্ত সে বর্ত্তিকা
ফুটায় হরষে তিমির-তোষিণী চম্পা-রূপিণী শিখা ;
বৃন্ত বাহিয়া যত স্নেহরস
যোগায় আমার জ্বালায় হরষ—
আমি তৃষিতের প্রাণের নিশীথে বাসনা-বাসন্তিকা।
ধূম নয়, সে যে অলি-লাঞ্ছন কাঞ্চন-মল্লিকা।

আলোকের লাগি' আঁধার প্রাচীরে নিশা মরে মাথা কুটে,
আমি সে ললাটে রক্তের ফোঁটা দিকে দিকে উঠি ফুটে।
কালোর অঙ্গে আলোকের ক্ষত—
সারারাত জাগি নিমেষ-নিহত,
জাগর-রক্ত আঁখির কাজল অশ্রুতে নাহি টুটে,
যত সে জ্বলুক, কালিটুকু থাকে লাগিয়া আঁখিপুটে।

* * *

দিক্-অঙ্গনা গগনাঙ্গনে ফুলকির ফুল গাঁথে –
অবোধ বনানী তাই হেরি' পরে জোনাকির হার মাথে।
মিছা মায়া সেই আলোর কণিকা,
মিছা হাসি হাসে আঁধার-গণিকা—
রক্ত-বিহীন পাণ্ডুর ভাতি, তাপ নাই তার সাথে,
বিদ্রূপ করে সখের দীপালি সুপ্ত দিবস-নাথে।

আমি যামিনীর নীল অঞ্চলে আগুনের ফুল বুনি,
আমি আঁধারের বুকের বাঁধারে হৃৎস্পন্দন শুনি।
দিবা পুড়ে' মরে স্বামীর চিতায়
আমি ছিনু তার সিঁদুর সিঁথায়,
জ্বলে উঠে শুনি ভর-সন্ধ্যায় ঝিঁঝির ঝুনঝুনি,
আমি সারারাত ও কাল রাত্রির আয়ুর প্রহর গুণি।

আমি দীপ-শিখা—আলোক-বালিকা—বসি যবে বাতায়নে,
দূর প্রান্তরে আলেয়া-ডাকিনী মিলায় আঁধার সনে;
নিশার দুলাল প্রেত-কবন্ধ
নৃত্য অমনি করে যে বন্ধ।
উন্মত-পাখা পিপীলিকা মরে রূপশিখা-চুম্বনে।
আমি বহ্নির তন্বী কুমারী তপনেরে জপি মনে।

আমি নিয়ে যাই অধীরা বধূরে অচেনার অভিসারে,
দেব আয়তনে আরতি করি গো প্রেমহীন দেবতারে।
আমি কালো-চোখে পরাই কাজল,
বাসর-নিশাটি করি যে উজল,
আমি চেয়ে থাকি অনিমিখ-আঁখি মরণ-শয়নাগারে;
প্রলয় ঘটাই, তবু নিবে যাই মলয়ের ফুৎকারে।

—মোহিতলাল মজুমদার

—

নব নিদাঘ

অঙ্গে আমার লেগেছে রে আজ নব নিদাঘের ঘোর।
ওরে মন, আয় সাঙ্গ করিয়া সকল কর্ম্ম তোর!
বিছায়ে নে মোরে শিথিল শরীর শ্লথ আঁচলের প্রায়;
চেয়ে থাক্ দূরে, অর্ধ শয়নে আধখোলা জানলায়।

দুপুর বেলায় রূপালি রৌদ্রে ফুলদল পড়ে নুয়ে,
মৌমাছিগুলি গুঞ্জন তুলি' উড়ে যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে;
ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘেরিয়া গুমট করিয়া আছে,
অমনি গান কি গন্ধের মতো ঘুরে বেড়া মোর কাছে!

দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র ঝিঁঝির পাখার মত,
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি' কে হাপরে ফুঁ দিতেছে অবিরত?
দিকে দিকে দিকে, জানি না কি পাখী হাতুড়ি ঠুকিছে তালে
কোন রূপসীর স্বপ্ন-মেখলা গড়িছে বিজনশালে?

কালো দীঘিজলে গাহন করিতে নেমেছে গাছের ছায়া,
নিদ্রিত মাঠে নির্জ্জন ঘাটে জাগিছে এ কার মায়া?
মরীচিকা চাহি' শ্রান্ত পথিক ফুকারে স্ফটিক জল,
অঙ্গে আলস আসে জড়াইয়া ছাড়ে না অশথতল।

আজিকে নিশ্চ কি মধুমধুর মদির নেশায় ভোর।
মাথায় তাহার ঘুরিছে হাজার ঘূর্ণি হাওয়ার ঘোর।
বাসনা তাহার মরীচিকা হ'য়ে আঁকা পড়ে দূর পটে;
কল্পনা তার গুন গুন ক'রে অলিগুঞ্জনে রটে।

শীতল শিলায় শ্রান্তি বিছায়ে শিথিল অঙ্গ রেখে,
নিমীল নয়নে মলিন বিরহ মিলনস্বপন দেখে।
সুদূর অতীত কাছে আসে আজ গোপন সেতু বাহি'।
অদেখা অগম দাঁড়ায়েছে যেন মোর মুখপানে চাহি'।

এসেছে তাহারা দিগন্ত-হারা সাহারা-প্রান্ত হ'তে,
এসেছে রে কারা কোন্ বসোরার খর্জ্জুরবীথিপথে,
কত বেদুয়ীন্ পারে ক'রে মরু দীপ্ত অগ্নিচালা,
নামায় আমার হৃদয়ের হাটে তরুণী ইরাণী বালা!

মর্ম্মরে গাঁথা মর্ম্মবেদীতে, কে পাতি' পদ্মপাতা,
পত্রলেখায় লিখিতে অঙ্গ ঘুমে ঢুলে' পড়ে মাথা!
আঁখি মুদে একা প'ড়ে আছি এই সুখস্মৃতিঘেরা নীড়ে,
প্রাণ ভ'রে যায় চেনা অচেনার মিলনমধুর ভিড়ে।

বেলা প'ড়ে আসে, বধূ চলে ঘাটে ভরিতে সাঁজের জল,
পথপাশে তরু গায়ে তুলে নিল চ্যুত ছায়া-অঞ্চল।
স্বপ্নান্তরে নিয়ে চলে মোরে নিদাঘনিশীথ ঘোর
ওরে মন আয়, ছিঁড়ে ফেলে আয় সকল কর্ম্ম-ডোর।

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বিড়াল

(শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর উক্তি)

আমি শয়ন-গৃহে চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা-হাতে ঝিমাইতে ছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেওয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এ জন্য হুঁকা-হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না? এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল 'মেও'।

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট আফিঙ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে পাষাণবৎ কঠিন হইয়া বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, 'মেও'।

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে, একটি ক্ষুদ্র মার্জার। প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে,—আমি ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই; এক্ষণে মার্জার সুন্দরী নির্জল দুগ্ধ-পানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, 'মেও'। বলিতে পারি না, বুঝি তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি মার্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল সেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে 'মেও' শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায়

করিয়াছিল! বুঝি বিড়ালের মনের ভাব—'তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি, এখন বল কি?' বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না, দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই, সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গারস্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত। সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া একটু সরিয়া বসিল। বলিল, 'মেও!' প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া মার্জারের বক্তব্য সকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, 'মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে, আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটা বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহৃত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল, অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভাগী। আমি চুরিই করি আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্ম সঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ।

অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ-ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী।

"দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত নর্দ্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে? হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখনও অন্ধকে মুষ্টিভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোট-লোকের দুঃখে কাতর? ছি! কে হইবে?

"দেখ, যদি অমুক শিরোমণি কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড় হাত করিয়া বলিতে, 'আর একটু কি আনিয়া দিব?' তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি বড় পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তাহা তো নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!

"দেখ, আমাদের দশা দেখ। দেখ, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদের মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের

সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহ-মার্জার হইয়া মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি।

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, মেও! মেও! খাইতে পাই না। আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস্য-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার-সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল তবে সে তাহার খাওয়ার পর যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম! মার্জার-পণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক, সমাজ-বিশৃঙ্খলার মূল। যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধন সঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধন-সঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজে ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জারী বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের ক্ষতি কি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।

বিড়াল রাগ করিয়া বলিল, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বিড়ালকে বুঝানো দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্‌কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব

ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন; অতএব চোরের দণ্ড-বিধান কর্তব্য।"

মার্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে কাহারও ভাণ্ডার-ঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জারীকে বলিলাম, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। মন হইতে এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর। প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে। জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না, বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষাভর আফিঙ দিব।"

মার্জার বলিল, "আফিঙের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জার বিদায় হইল।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র

যেকালে বঙ্কিমের নবীন প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলাদেশের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।

সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল। এবং ক্ষুদ্র যে-লেখক-সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত, তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

আবার এখনকার যে নূতন পাঠক- ও লেখক-সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্যভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু বর্তমান লেখকের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় তখন সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোরূপ পূর্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই এবং বর্তমান কালের নূতন ভাবপ্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত ও অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গসাহিত্যেরও যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।

পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা একমুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক এত আশা, এত সংগীত এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম

বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ'। এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাতকলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম; সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিয়াছিলাম সেই জন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। মনে হয় সেদিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল তদনুরূপ ফললাভ করিতে পারি নাই। সে জীবনের বেগ আর নাই। কিন্তু এ নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কখনো স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব আনন্দ নবীন আশার স্মৃতির সহিত বর্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে রাগিণীতে বংশীধ্বনি হয় সে রাগিণী চিরদিনের নহে। সেদিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্তব্য, মিশ্রিত সুখদুঃখ, ক্ষুদ্র বাধাবিঘ্ন, আবর্তিত বিরহমিলন—তাহার পর হইতে গভীর গম্ভীরভাবে নানা পথ বাহিয়া নানা শোকতাপ অতিক্রম করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিদিন আর সে নহবত বাজিবে না। তথাপি সেই একদিনের উৎসবের স্মৃতি কঠোর কর্তব্যপথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যেদিন নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন সেদিনের সর্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ উৎসব আমাদের মনে আছে। সেদিন আর নাই। আজ নানা লেখা নানা মত নানা আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ কোনোদিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে, কোনোদিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এইরূপই হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল সে কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণকর্তা বলিয়া আমরা জানি না। কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা,

কী সমাজ, কী ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক। যখন নবশিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃতপ্রায় বেদপুরাণতন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ অদ্য এই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না।

রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন-দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে; এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।

মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙালীর যে কী মহৎ কী চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে-কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা আর দুর্ভাগ্য কিছুই নাই। তৎপূর্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরেজি পণ্ডিতেরা বর্বর জ্ঞান করিতেন বাংলাভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা যাইতে পারে সে-কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এইজন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকের জন্য অনুগ্রহপূর্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠ্যযোগ্যতা সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা রেভরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত এন্ট্রান্স-পাঠ্য বাংলাগ্রন্থে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সংকুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তখনকার কালে কী যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরাজিতে দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরাজি সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালির মতো বালির বাঁধ নির্মাণ করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কী হইতে পারে? সম্পূর্ণ ক্ষমতা সত্ত্বেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাঁহাদের নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া একটি অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা উদ্যম ক্ষমতাকে প্রেরণ করা কত বিশ্বাস এবং কত সাহসের বলে হয় তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্বে সেই অনাদরমলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

তখন, পূর্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন তাঁহারা বঙ্গভাষার যৌবন-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমতঃ, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য। দ্বিতীয়তঃ যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোন আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প

ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্বদা সম্মুখে বর্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতি-লাভের প্রলোভন সংবরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম। চতুর্দিক্‌ব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মতো এমন গুরুভার আর কিছু নাই; তাহার নিয়তপ্রবল ভারাকর্ষণশক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম তাহা এখনকার সাহিত্যব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন। তখন যে আরো কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভাবলে যে কার্য করিলেন তাহা অত্যাশ্চর্য। বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনশৃঙ্গের শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদবর্গের কত ঊর্ধ্বে সমুত্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে। একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব অভ্যাসবশতঃ সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরো কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোকে যে একদমে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস তখন জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখনো দাঁড়াইয়া

হয় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিমচন্দ্র একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানের যে ফল তাহাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মনে আছে বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচকপদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। এবং কল্পনাপ্রবণ লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক ছোটো ছোটো দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল; তিনি জানিতেন বর্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এইজন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোনোদিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব করিতে হয় নাই।

নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া গ্রাম্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। এই প্রগল্‌ভ বিদূষকটি বহুই প্রিয়পাত্র থাক কখনো সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীর ভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা হইত সেখান হইতে হাস্যের চপলতা সর্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে, উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না কেবল তাহার সৌন্দর্য

এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল সুসংগতি নহে, সুরুচি এবং শিষ্টতার সীমা নির্ণয় করিতেও একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তির আবশ্যক। মাঝে মাঝে অনেক বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে সেই বোধশক্তির অভাব দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভায় বল এবং সৌকুমার্যের একটি সুন্দর সংমিশ্রণ ছিল। নারীজাতির প্রতি যথার্থ বীর-পুরুষের মনে যেরূপ একটি সসম্ভ্রম সম্মানের ভাব থাকে তেমনই সুরুচি এবং শ্লীলতার প্রতি বঙ্কিমের বলিষ্ঠ বুদ্ধির একটি ভদ্রোচিত বীরোচিত প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্কিমের রচনা তাহার সাক্ষ্য। বর্তমান লেখক যেদিন প্রথম বঙ্কিমকে দেখিয়াছিল, সেদিন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচিপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়ুনিয়ন নামক মিলনসভা বসিয়াছিল। ঠিক কতদিনের কথা ভালো স্মরণ নাই কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারও পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনোরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে প্রথম-দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেকবার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমলহাস্যে

অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম-দর্শনে সেই যে তাঁহার মুখে উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগ-মূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সংকুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন।

বঙ্কিমের সেই সসংকোচ পলায়নদৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে সময়কার সাহিত্য অন্য যে-কোনোপ্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক, ঠিক সুরুচিশিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে-সময়কার অসংযত বাক্-যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা যে কী আশ্চর্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতার প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোনোকালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম সংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়সঙ্গিনী

বঙ্গভাষা আজ বঙ্কিমের জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এই শোকোচ্ছ্বাসের অতীত শান্তিধামে দুষ্কর জীবনযজ্ঞের অবসানে নির্বিকার নিরাময় বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে একটি কোমল প্রসন্নতা, একটি সর্বদুঃখতাপহীন গভীর প্রশান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—যেন জীবনের মধ্যাহ্নরৌদ্রদগ্ধ কঠিন সংসারতল হইতে মৃত্যু তাঁহাকে স্নেহসুশীতল জননীক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছে। আজ আমাদের বিলাপ পরিতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমাদের ভক্তি উপহার গ্রহণ করিবার জন্য সেই প্রতিভাজ্যোতির্ময় সৌম্য প্রসন্নমূর্তি এখানে উপস্থিত নাই। আমাদের এই শোক এই ভক্তি কেবল আমাদেরই কল্যাণের জন্য। বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এই শোকে এই ভক্তিতে সেই আদর্শ প্রতিমা আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল এবং স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রস্তরের মূর্তিস্থাপনের অর্থ এবং সামর্থ্য আমাদের যদি না থাকে, তবে একবার তাঁহার মহত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমাদের বঙ্গহৃদয়ের স্মরণস্তম্ভে স্থাপন করিয়া রাখি। রাজনৈতিক সমাজনৈতিক মতামত সহস্রবার পরিবর্তিত হইতে পারে; যে-সকল ঘটনা যে-সকল অনুষ্ঠান আজ সর্বপ্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার উন্মাদনার কোলাহলে সমাজের শান্তিহীন শব্দহীন কর্তব্যগুলিকে নগণ্য বলিয়া ধারণা হইতেছে কাল তাহার স্মৃতিমাত্র চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে না পারে, কিন্তু যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদিগের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের মধ্যে চিরসৌন্দর্যের অক্ষয় আকর উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যাহা-কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা-কিছু অমর করিবে সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার পোষণ করিবার প্রকাশ করিবার এবং সর্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।

রচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে। আজ আমাদিগের নিকট যাহা প্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা রুচি এবং অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের উত্তরপুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম

বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতঃস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন,—ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ কথা কোনো বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাংলা লেখকদিগের গুরু, বাংলা পাঠকদিগের সুহৃদ্‌, এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিমদিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভাগীর স্বর্গ

১

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলে-মেয়েদের ছেলে পুলে হইয়াছে, জামাইরা, প্রতিবেশীর দল, চাকর-বাকর—সে যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধুমধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দুর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার—এ যেন বড় বাড়ীর গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামিগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া অলক্ষ্যে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল, সে কাঙালীর মা। সে তাহার কুটীর-প্রাঙ্গণের গোটা-কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার আঁচলে বেগুন বাঁধা—সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্রামের একান্তে গরুড় নদীর তীরে শ্মশান। সেখানে পূর্ব্বাহ্নেই কাঠের ভার, চন্দনের টুকরা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল কাঙালীর মা ছোটজাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না,

তফাতে একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্য্যাপ্ত চিতার 'পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাঁহার রাঙা পা দুখানি দেখিয়া তাহার দুচক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আল্‌তা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহু কণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্ছো—আমাকেও আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও আমিও যেন এম্‌নি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন! সে ত সোজা কথা নয়! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতিনী, দাস, দাসী, পরিজন—সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ—দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্যঃপ্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতা-পাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছেন, মুখ তাঁহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিঁদুরের রেখা, পদতল দুটি আল্‌তায় রাঙানো। ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চোদ্দ-পনেরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস্ মা, ভাত রাঁধবি নে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধবো'খন রে! হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, দ্যাখ্ দ্যাখ্ বাবা—বামুনমা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্ছে!

ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, কই? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই ক্ষেপেছিস্! ও ত ধুঁয়া! রাগ করিয়া কহিল, বেলা দুপুর বাজে, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি? এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল লক্ষ্য করিয়া বলিল, বামুনদের গিন্নী মরেছে তুই কেন কেঁদে মরিস্ মা?

কাঙালীর মার এতক্ষণে হুঁস হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এই ভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমন কি, ছেলের অকল্যাণের

আশংকায় মুহূর্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাঁদব কিসের জন্যে রে—চোখে ধোঁ লেগেছে বই ত নয়!

হাঁ, ধোঁ লেগেছে বই ত না। তুই কাঁদ্‌ছিলি!

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালীকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল—শ্মশান-সংকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।

২

সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলোকেই যেন আমরণ ভ্যাঙ্‌চাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট, কিন্তু সেই ছোট্ট কাঙালজীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর মা হইতে বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ও শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

তাহার সেই কাঙালী বড় হইয়া আজ পনরয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি, যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলি নে মা?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল, না, ক্ষিদে নেই বই কি! কই দেখি তোর হাঁড়ি?

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর একজনের মত ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্নমুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়সের ছেলে সচরাচর এরূপ করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্ন ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গী সাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলা-ধূলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে। এক হাতে গলা জড়াইয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া পোড়ানো কি তুই—

মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, ছি বাবা, মড়া পোড়ানো বলতে নেই, পাপ হয়। সতীলক্ষ্মী মাঠাকরুণ রথে করে সগ্যে গেলেন।

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা। রথে চড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যে যায়?

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখনু কাঙালী, বামুনমা রথের ওপরে বসে। তেনার রাঙা পা দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখলে রে!

সবাই দেখলে?

সব্বাই দেখলে।

কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই সে শিশুকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই মা যখন বলিতেছে সবাই চোখ মেলিয়া এতবড় ব্যাপার দেখিয়াছে, তখন অবিশ্বাস করিবার আর কিছু নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তা হলে তুইও ত মা সগ্যে যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসিকে বলতেছিল ক্যাঙ্লার মার মত সতীলক্ষ্মী আর দুলেপাড়ায় কেউ নেই।

কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, কাঁতাটা পেতে দেব মা, শুবি?

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে বালিশটী পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, কাঙালী, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভাল লাগিল, কিন্তু কহিল, জলপানির পয়সা দুটো ত তা হলে দেবে না মা!

না দিক্ গে—আয় তোকে রূপকথা বলি।

আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না, কাঙালী তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল্ তা হলে। রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুর আর সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া—

অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ সকল তাহার পরের কাছে কত দিনের শোনা এবং কত দিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত্ত-কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র—সে এমন উপকথা সুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়—নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—কাঙালীর স্বল্প দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকারে কেবল রুগ্ন মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশানযাত্রার কাহিনী। সেই রথ, সেই রাঙা পা দুটি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া। কেমন করিয়া শোকার্ত্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তারপরে সন্তানের হাতের আগুন। সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালী, সেই ত হরি! তার আকাশজোড়া ধুঁয়ো ত ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই ত সগ্যের রথ! কাঙালীচরণ, বাবা আমার!

কেন মা?

তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুনমার মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো।

কাঙালী অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ—বলতে নেই।

মা সে কথা বোধ করি শুনিতেও পাইল না, তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোটজাত ব'লে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না ক'রতে পারবে না—দুঃখী ব'লে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস্! ছেলের হাতের আগুন—রথকে যে আসতেই হবে।

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস্ নে মা, বলিস্ নে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ্ কাঙালী, তোর বাবাকে একবার ধ'রে আন্‌বি, অম্‌নি যেন পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে আমাকে বিদায় দেন। অম্‌নি পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুর দিয়ে—কিন্তু কে বা দেবে? তুই দিবি, না রে কাঙালী? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব! বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

৩

অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্তৃতি বেশি নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেম্‌নি সামান্যভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালী গিয়া কাঁদাকাটি করিল, হাতে-পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে একটাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটা-চারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত কি আয়োজন; খল, মধু, আদার সত্ত্ব, তুলসীপাতার রস—কাঙালীর মা ছেলের উপর রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না ব'লে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি, বাবা! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভাল হই ত এতেই হব, বাগ্দী-দুলেদের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না!

দিন দুই-তিন এম্‌নি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে যাহা মুষ্টি-যোগ জানিত, হরিণের শিঙ্‌ঘষা জল, গেটে-কড়ি পুড়াইয়া

মধুতে মাড়িয়া চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোব্‌রেজের বড়িতে কিছু হ'ল না বাবা, আর ওদের ওষুধে কাজ হ'বে? আমি এম্‌নিই ভাল হ'ব।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি ত খেলি নে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এম্‌নি কি কেউ সারে?

আমি এম্‌নি সেরে যাবো। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।

কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফেন ঝাড়িতে, না পারিল ভাল করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না—ভিতরে জল পড়িয়া ধুঁয়া হয়; ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; মায়ের চোখ্ ছল ছল করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি ক'রিয়া কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণকণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরল-ধারে জল পড়িতে লাগিল।

গ্রামের ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সম্মুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না! সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আন্‌তে পারিস্ বাবা?

কাকে মা?

ওই যে রে—ও গাঁয়ে যে উঠে গেছে—

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল।

কাঙালী বলিল, সে আস্‌বে কেন মা?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বল্‌বি, মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধুলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদা-কাটা করিস্ বাবা, বলিস্, মা যাচ্ছে।

একটু থামিয়া কহিল, ফেরবার পথে অম্নি নাপ্‌তে বৌদির কাছ থেকে একটু আল্‌তা চেয়ে আনিস ক্যাঙালী, আমার নাম করলেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালবাসে।

ভাল তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিষের কথা এতবার এতরকম করিয়া শুনিয়াছে যে সে সেইখান হইতেই কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিল।

৪

পরদিন রসিক দুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ সংসারের কাজ সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে। কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেছে—পায়ের ধুলো নেবে যে!

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথ-যাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া দিয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধুলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দির পিসি দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধুলো।

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশনবসন দেয় নাই, কোন খোঁজ খবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধুলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রাখালের মা বলিল, এমন সতীলক্ষ্মী বামুন কায়েতের ঘরে না জন্মে' ও আমাদের দুলের ঘরে জন্মালো কেন! এইবার ওর একটু গতি করে দাও বাবা—ক্যাঙ্লার হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।

অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া এ কথা যেন তীরের মত বিঁধিল।

সেদিন দিনের-বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটাও কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। কি জানি, এত ছোট-

জাতের জন্যও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়—কিন্তু এটা বুঝা গেল রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

কুটীর প্রাঙ্গণে একটা বেল গাছ ছিল, একটা কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দরওয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কসইয়া দিল; কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা, একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাট্‌তে লেগেছিস্?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ, এ যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ দরওয়ানজী। বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানী দরওয়ান তাহাকেও একটা অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়া ছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকা-হাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভাল হয় নাই, তাহারাই আবার দরওয়ানজীর হাতে পায়ে ধরিতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন। কারণ, অসুখের সময় যে কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালীর মা তাহারই হাতে ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছে।

দরওয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাতমুখ নাড়িয়া জানাইল, এ সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন; গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্তা। লোকগুলা যখন হিন্দুস্থানীটার কাছে ব্যর্থ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালী উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারি বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল অতবড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যদি কর্ত্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না। হায় রে অনভিজ্ঞ! বাঙলা দেশের জমিদার ও তাহার কর্ম্মচারীকে সে চিনিত না। সদ্যোমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, অধর রায় সেইমাত্র

সন্ধ্যাহ্নিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কে রে?

আমি কাঙালী। দরওয়ানজী আমার বাবাকে মেরেছে।

বেশ করেচে। হারামজাদা খাজনা দেয় নি বুঝি?

কাঙালী কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাটতেছিল—আমার মা মরেচে—, বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।

সকাল-বেলা এই কান্না-কাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল না কি! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস্ রে, এখানে একটু গোবরজল ছড়িয়ে দে! কি জাতের ছেলে তুই?

কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।

অধর কহিলেন, দুলে! দুলের মড়ার কাঠ কি হবে শুনি?

কাঙালী বলিল মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে! তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে, সক্কলে শুনেছ যে! মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ মুহূর্ত্তে স্মরণ হওয়ায় কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্ গে। পারবি?

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যের জন্য তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল্ গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়—পাজি, হতভাগা, নচ্ছার!

কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের উঠোনের গাছ, বাবুমশায়! সে যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ!

হাতে-পোঁতা গাছ! পাঁড়ে ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত!

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্ম্মচারীরাই পারে।

কাঙালী ধুলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন সে যে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ, ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না।

গোমস্তার নির্ব্বিকার চিত্তে দাগ পর্য্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকরি তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখ ত হে, এ ব্যাটার খাজনা বাকী পড়েছে কিনা। থাকে ত জাল-টাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয়—হারামজাদা পালাতে পারে।

* * * *

মুখুয্যেবাড়ীতে শ্রাদ্ধের দিন—মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকী। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, ঠাকুরমশাই, আমার মা ম'রে গেছে।

তুই কে? কি চাস্ তুই?

আমি কাঙালী। মা ব'লে গেছে তেনাকে আগুন দিতে।

তা দিগে' না।

কাছারির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, ও বোধ হয় একটা গাছ চায়। এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, শোন আব্দার। আমারই কত কাঠের দরকার—কাল বাদে পরশু কাজ। যা যা, এখানে কিছু হবে না—এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে—যা, মুখে একটু নুড়ো জেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দিগে'।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ছেলে ব্যস্তসমস্ত ভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখ্ছেন ভটচাজমশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হ'তে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙালী আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘণ্টা-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ানো হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তারপরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত—শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাকাব্য

ইংরাজি এপিক্-শব্দের অনুবাদে মহাকাব্য-শব্দের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ মিলে কি না তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহাকবিগণের চিন্তার কারণ কিছুই রাখেন নাই। কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য এ দেশে চলিত আছে, এবং ঐ সকল মহাকাব্য সম্ভবতঃ অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা চলে কি না, তাহা লইয়া একটা তুমুল সমস্যা গোড়াতেই দাঁড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত এপিক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে সর্ব্বদা সম্মত হন না। প্রথমতঃ, এ দুই গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলী অত্যন্ত উৎকটরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মহাকাব্য বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি আখ্যা দিলে, বোধ করি এই দুই গ্রন্থের মর্যাদা রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উহাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়।

বস্তুতই মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়। কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জ্জুনীয় যে অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য নহে। কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয় যে শ্রেণীর যে পর্য্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর—সে পর্য্যায়ের গ্রন্থ নহে। একের নাম মহাকাব্য দিলে, অন্যকে মহাকাব্য বলা কিছুতেই সংগত হয় না।

রামায়ণ মহাভারতের ঐতিহাসিকত্বে ও ধর্ম্মশাস্ত্রত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ থাকিয়াও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে উহাতে কাব্যরসও যথেষ্ট পরিমাণে

বিদ্যমান। মহর্ষি বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উঁহারা যাহা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব রহিয়া গিয়াছে,—হয়ত উঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু কবিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

রামায়ণ-মহাভারতে কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই, মহর্ষিদ্বয়কে মহাকবি ও তাঁহাদের কাব্যদ্বয়কে মহাকাব্য না বলিলে চলে না; কেন-না, ভাষাতে আর কোন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা এই কাব্যদ্বয়ের সঙ্গত নামকরণ চলিতে পারে। কুমারসম্ভব-কিরাতার্জুনীয়কে আপাততঃ মহাকাব্যের শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দিয়া আমরা রামায়ণ-মহাভারতকেই মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

মনে হইতেছে মেকলে কোথায় বলিয়াছেন, সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে। সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস করে, অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে পায় না। বলা বাহুল্য, মেকলের অনেক উক্তির মত এই উক্তিটিকেও সুধীজনে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার আস্ফালন-সত্ত্বেও ইউরোপ-খণ্ডে কবিত্বের যেরূপ স্ফূর্তি দেখা গিয়াছে, তাহাই তাহার প্রমাণ। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় মেকলের ঐ উক্তির ভিতর একটু প্রচ্ছন্ন সত্য আছে। সভ্যতা কবিত্বের মস্তক চর্ব্বণ না করিতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যকে বোধ করি সশরীরে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার বলা আবশ্যক, মহাকাব্য-শব্দ আমি আলঙ্কারিক-সম্মত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব ও প্যারাডাইস লষ্ট্‌কে আমি এ স্থলে মহাকাব্যের মধ্যে ফেলিতেছি না। রামায়ণ-মহাভারত যে পর্য্যায়ের কাব্য, সেই পর্য্যায়ের কাব্যকেই আমি মহাকাব্য বলিতেছি। পৃথিবীতে কত কবি কত কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য সেই কোন্‌ কালে রচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর একখানাও রচিত হইল না। পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যে লেখকের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই; কিন্তু সন্দেহ হয়, কেবল হোমারের নামে প্রচলিত গ্রন্থ-দুইখানি ব্যতীত আর কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য দেশে সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত কবিত্বের অবনতি হইয়াছে, এ-কথা কেহই বলিতে পারিবে না। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের নাম মনে রাখিয়াও

অকুতোভয়ে বলা যাইতে পারে, ইউরোপ মহাদেশেও একবারের বেশী হোমারের জন্ম হয় নাই।

বস্তুতই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার পর কত হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না। কেন এরূপ হইল, তাহার কারণ চিন্তনীয় ; কিন্তু সেই কারণ আবিষ্কারে লেখকের ক্ষমতা নাই। তবে এক একবার মনে হয়, মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা, বোধ করি, আর সেই শ্রেণীর মহাকাব্য-উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে।

রামায়ণ মহাভারত ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা মনুষ্যসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে সেই সমাজকে আধুনিক হিসাবে সভ্য বলিতে পারা যায় না। মনুষ্যসমাজের সে অবস্থা আবার কখনও ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা জানি না ; কিন্তু তাৎকালিক সমাজে যে সকল ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইত, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। আমরা এমন কল্পনায় আনিতে পারি না যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি কোন ইউরোপের রাজসভায় আতিথ্যস্বীকার করিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মীকে স্টীমারে তুলিয়া প্রস্থান করিতেছেন, ও তাহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ ইউরোপের নরপালবর্গ ওয়াশিংটন অবরুদ্ধ করিয়া দশ বৎসরকাল বসিয়া আছেন। ডিলারী বন্দীকৃত লর্ড মেথুয়েন্কে গাড়ীর চাকায় বাঁধিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার বুয়র উপত্যকায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কোন দিনের টেলিগ্রামে দেখিবার কেহ আশা করেন না। সিডান্-ক্ষেত্রে বিসমার্ক লুই নেপোলিয়ান্কে হস্তগত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বুক চিরিয়া নেপোলিয়ান্-বংশের শোণিতের আস্বাদগ্রহণ আবশ্যক বোধ করেন নাই। ত্রেতাযুগ-অবসানের বহুদিন পরে যবনদেশে লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষাও গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তজ্জন্য লাঙ্গুলের ব্যবহার করিতে হয় নাই।

সেকালের এই অসভ্যতা আমাদের চোখে বড়ই বীভৎস ঠেকে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেকালের সামাজিকতার অন্য একটা দিক্ আছে, একালে সে দিক্টাও তেমন দেখিতে পাই না। বার্ক এক সময়ে আপনার মহাপ্রাণতার ঝোঁকে বলিয়াছিলেন, শিভালরির দিন গত হইয়াছে। শিভালরি-নামক

অনির্ব্বাচ্য বস্তু নগ্ন বর্ব্বরতার সহিত নিরাবরণ মনুষ্যত্বের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সমুৎপন্ন। একালে মানুষ মানুষের রক্তপান করিয়া জিঘাংসার তৃপ্তি করিতে চাহে না বটে, কিন্তু আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কটাক্ষমাত্র শাসনে, পত্নীর অপমান স্বচক্ষে দেখিয়াও, আত্মসংযমে সমর্থ হয় কি না, বলা যায় না। একালের রাজারা মালকোঁচা মারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে অবতীর্ণ হন না সত্য বটে, কিন্তু ভীমরতিগ্রস্ত পিতার একটা কথা রাখিবার জন্য ফিজিদ্বীপে নির্ব্বাসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন কি না, বলিতে পারি না। অশ্বত্থামা ঘোর নিশাকালে সুখসুপ্ত বালকবৃন্দের হত্যাসাধন করিয়া ভীষণ ক্রূরতা দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু সভা ডাকিয়া ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া সেই ক্রূরতার সমর্থন তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ-সহায় পাণ্ডবগণ যখন জয়বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া নিশাকালে শত্রুশিবিরে ভীষ্মের নিকট দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভীষ্মকে তাঁহার জীবনটুকু দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের লৌহবর্ম্মের অন্তরালে কারেন্সি নোটের গোছা লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে মনুষ্যসমাজের বাহিরের মূর্ত্তিটা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। মনুষ্যের বাহিরের পরিচ্ছদটা সম্পূর্ণ বদলাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের ভিতরের গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের রাজারাজড়াও, বোধ করি, সময়মত কৌপিনধারী হইয়া সভামধ্যে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না, কিন্তু এখনকার অন্নহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিরূপতা পোশাকের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্ব্বরতা ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোন আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ্, কোনরূপ রঙ-ফলানো ছিল না। একালেও ক্রূরতা, বর্ব্বরতা ও পাশবিকতা হয়ত ঠিক তেমনি বর্ত্তমান আছে, তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভদ্রতামির আবরণ স্থাপিত হইয়া তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সম্প্রতি চীনদেশে সভ্য ইউরোপের সম্মিলিত সেনা যে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আটিলা ও জঙ্গিস্ খাঁর প্রেতাত্মার আর লজ্জিত হইবার কোন কারণই নাই।

বস্তুতই চারি হাজার বৎসরের ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র অধিক বদলায় নাই; তবে সমাজের মূর্ত্তিটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং মনুষ্যসমাজের অবস্থা যে-কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেই কাব্যের মূর্ত্তিও যে তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। বিস্ময়ের কারণ থাক্ আর নাই থাক্, আধুনিক কালের সাহিত্যে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের আর আবির্ভাব হয় নাই, এবং আর যে কখনও হইবে তাহা আশা করাও দুষ্কর। সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়া গিয়াছে। কালের যখন অবধি নাই ও পৃথ্বী যখন বিপুলা, তখন বড় কবির ও কাব্যের অসদ্ভাব কখন হইবে না; কিন্তু মনুষ্যসমাজের সেই প্রাচীন অবস্থা ফিরিয়া আসিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে মহাকবির ও মহাকাব্যের, বোধ করি, আবির্ভাব আর হইবে না।

বস্তুতই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা, বোধ করি, আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্ম্মিত কৃত্রিম কারুকার্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্তনির্ম্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।

আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতকে এক একবার ভারতবর্ষের হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পাষাণ-কলেবরের অঙ্কদেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত সহস্র বৎসরকাল অঙ্কে রাখিয়া লালন-পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে। হিমাচলের বিশাল বক্ষোদেশ হইতে বিনিঃসৃত সহস্র উৎস হইতে সহস্র স্রোতস্বিনী অমৃতরসপ্রবাহে ভারতভূমিকে আর্দ্র ও সিক্ত করিয়া 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে, সেইরূপ মহাভারতের মধ্য হইতে সহস্র উপাখ্যান, সহস্র কাহিনী, সহস্র কথা সমগ্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্র ধারা প্রবাহিত করিয়া পুণ্যতর ভাবপ্রবাহে জাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ রাখিয়া

বহুকোটী লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্টি ও কান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ যেমন হিমাচলের ক্রমবিন্যস্ত স্তরপরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে কত বিস্ময়কর জীবের অস্থিকঙ্কাল উদ্ধার করিয়া অতীতের লুপ্তস্মৃতি কালের কুক্ষি হইতে উদ্ঘাটন করেন, সেইরূপ প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই বিশাল গ্রন্থের স্তরপরম্পরা হইতে ভারতীয় জনসমাজের অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত নিদর্শনের চিহ্ন ধরিয়া ইতিহাসের অতীত অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অগ্রদূত—আল্-বেরুনী

বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সভ্যতার মধ্যে সংস্কৃতিগত সমন্বয়, মিলন, ঐক্য ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জন্য এক শ্রেণীর সুধীমণ্ডলী যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা যে সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইতে পারিতেছে না, তাহার মূল কারণ সংস্কৃতি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব, এবং ব্যাপারটিকে উদারভাবে দেখিবার ও বুঝিবার মত দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি একই বস্তু। যতগুলি ধর্ম্ম আছে, ততগুলি সংস্কৃতিও আছে। আপন আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাকে লোকে যেমন অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য মনে করে, সংস্কৃতিকেও সেই ভাবে দেখিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে; সংস্কৃতি ধর্ম্ম হইতে আলাদা বস্তু। ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক জগতের বস্তু: কিন্তু সংস্কৃতি পার্থিব জগৎকে লইয়া। মানবীয় আচার পদ্ধতি, শিক্ষাদীক্ষা, মানসিক উন্নতি, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব—এই সবের সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব মনোভাবই হইতেছে সংস্কৃতি। জাতির সর্ব্ববিধ বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির চরমতম পরিণতি হইতেছে তাহার সংস্কৃতি। এ কথা সত্য যে, ধর্ম্মের আদর্শ সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম একই বস্তু নহে। সেই জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন যতই কঠিন বোধ হউক না কেন, বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন কঠিন ত নহেই, বরং যুগে যুগে প্রত্যেক দেশেই তাহা হইয়া আসিতেছে। ইহার জন্য দরকার প্রকৃত জ্ঞান ও উদার মনোভাব।

ভারতবর্ষ ও গ্রীস এই দুইটি অতি প্রাচীন সভ্য দেশ। এই দুইটি দেশের মধ্যে নানা বিষয়ে সংস্কৃতিগত সমন্বয় ও মিলনের চেষ্টা হইয়াছিল, সে প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। পিথাগোরাস হইতে আরম্ভ করিয়া (অথবা তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হইতে) মেগাস্থিনিসের যুগ পর্য্যন্ত কতভাবে আর্য্য ও গ্রীক সভ্যতার মধ্যে আদান-প্রদান হইয়া গিয়াছে। সেই ভাবে প্রাক্ ইসলামের যুগ হইতে আরব ও ভারতের মধ্যে নানা বিষয়ে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল। উত্তর ভারতের সুপ্রসিদ্ধ মৌলানা সৈয়দ সোলায়মান্ নদবীর "আরব ও হিন্দ কি তাআল্লুকাত্" নামক মূল্যবান্ পুস্তকে তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ইস্‌লামের যুগেও বহু মুসলমান ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, রাজ্যবিজয়ের উদ্দেশ্যে নয়, এ দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে। দেশ-বিজয়ের বাসনা তাহার বহু পরে হয়। কিন্তু পৌত্তলিকতার বিরোধী মুসলমানগণ এ দেশের পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখিয়া আর অধিকদূর অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা এ দেশের সংস্কৃতিকে অবহেলা করিতে লাগিলেন। প্রায় তিন শত বৎসর এইরূপ অবহেলার মধ্যে চলিল। তারপর সুলতান মাহ্‌মুদের সময় একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি সেই ছিন্ন তার যোজনা করিয়া আবার মোহন সুরে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইনি মহামনীষী পণ্ডিত আবু রয়হান্ আল্‌-বেরূনী। যে পথ এত দিন বন্ধ ছিল, মনীষী আল্‌-বেরূনী তাহা বিশ্বের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। আরব ও ভারতের মধ্যে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের জন্য তিনি সে যুগে যাহা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট চিরঋণী।

যে সব বিদেশী লেখক প্রাচীন ভারতবর্ষসম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে আল্‌-বেরূনীকে আমরা অতি উচ্চাসন প্রদান করিতে পারি। পৃথিবীর এক প্রান্তে বসিয়া পাঁচ-দশখানা বই পড়িয়া অপর দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া তাহাকে নিজের প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল বলিয়া চালাইয়া দিবার দুঃসাহস অনেক লেখকের আছে। কিন্তু আল্‌-বেরূনী সে ধরণের লেখক ছিলেন না। তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা এ যুগেও দুর্লভ। একাদিক্রমে সাত বৎসর ভারতের ভাষা বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া, এ দেশের জনসাধারণ ও পণ্ডিত শ্রেণীর লোকের সহিত প্রাণখোলাভাবে মিলিয়া-মিশিয়া সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার এই বিরাট্ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ও আরব দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার বিষয় অতি ব্যাপক—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, গণিত, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি। এই সব বিষয় তিনি নিরপেক্ষ দর্শকের মত তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া গ্রন্থ

লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচনার সব চেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত মতামতের আভাস খুবই কম আছে।

আল্-বেরুনীর জীবনবৃত্তান্ত খুব ঘটনাবহুল নহে। অতি সংক্ষেপেই তাহা বর্ণনা করিতেছি। তাঁহার পুরা নাম আবু রয়হান্ মহম্মদ ইব্‌নে আহ্‌মদ্ আল্-বেরুনী। মধ্য এসিয়ার খোওয়ারিজাম্ নামক রাজ্যে ৯৬৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বীয় পল্লীতে তিনি অল্প বয়সে সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও গণিতবিদ্যা শিক্ষা করেন, এবং তথায় কিছু দিন শিক্ষকতা করিতে থাকেন। পরে ১০১৩ খৃঃ অব্দে উক্ত খোওয়ারিজাম্ রাজ্য সুলতান মাহ্‌মুদ অধিকার করেন। সেই সময়ে আল্-বেরুনী স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সুলতান মাহ্‌মুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তাহাতে তিনি সুলতানের কোপে পতিত হন। পরে সুলতান তাঁহাকে বন্দী করিয়া ভারতে প্রেরণ করেন। তিনি বাধ্য হইয়া ভারতে যে ভাবে জীবন-যাপন করিতেছিলেন তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া দুষ্কর। কারণ, তাঁহার লিখিত বিবরণে তিনি অপরের সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছিলেন, নিজের সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই বলেন নাই। ভারতে অবস্থানকালে তাঁহাকে যত্রতত্র যাইতে দেওয়া হইত না। কিন্তু হিন্দু পণ্ডিত ও সাধুদের সহিত মিলিবার ও মিশিবার অনুমতি তিনি পাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর। অবসরসময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখিতে লাগিলেন; এবং কয়েক বৎসর বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তিনি হিন্দু বিজ্ঞান, দর্শন, ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ ও গণিতবিদ্যা শিখিয়া ফেলিলেন; এবং সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দ্বারা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্বন্ধে কয়েকখানা মূল্যবান্ পুস্তক লিখিলেন।

ইতিপূর্ব্বে যে সব মুসলমান লেখক হিন্দুদের ধর্ম্ম, সামাজিক ব্যবস্থা, দর্শন ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, আল্-বেরুনী যে তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁহার রচিত গ্রন্থই সে পরিচয় প্রদান করিবে। তাঁহার "কিতাব আত্ তহকীক আল্ হিন্দ" একখানা বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, উহার সহিত ইস্‌লামিক দর্শন বিশেষতঃ সুফি মতবাদের বিশেষ পার্থক্য নাই; অন্ততঃ মূলগত আদর্শ বিষয়ে। একজন নিরপেক্ষ দর্শকের মত তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখিলেন যে, হিন্দু মানসিকতার অধঃপতনের মূল কারণ উহাদের দর্শন বা

শাস্ত্রের মধ্যে নাই। সাধারণের মধ্যে বিদ্যা-চর্চা কমিয়া আসাতে পৌরোহিত্যের প্রভাব বৃদ্ধি পাইল এবং তাহা হইতে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ও স্ফুরণ আর হইল না। তিনি এই উক্তি কেবল হিন্দুদের বেলায় করেন নাই। তাঁহার মতে মুসলিম মনীষিকতার অধঃপতনের মূল কারণ তুর্ক-প্রাধান্য-বৃদ্ধি।

ভারতবর্ষসম্বন্ধে পক্ষপাতবিহীন সঠিক বিবরণ লিখিবার প্রেরণা তিনি তাঁহার গুরু আবু সোহলের নিকট প্রাপ্ত হন। তিনি আল্-বেরূনীকে বলেন, ভারত-বিষয়ক এমন গ্রন্থ লিখিতে হইবে যাহাতে সত্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। ওই মহাত্মা আল্-বেরূনী গুরুর আদেশ নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার "কিতাবুল হিন্দ"র মুখবন্ধে লিখিতেছেন:— "আমি হিন্দু ধর্ম্ম ও সভ্যতাসম্বন্ধে লিখিতে অগ্রসর হইলাম। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অপ্রামাণিক অভিযোগ দিব না। আমি যদিও মুসলমান, তবুও তাহাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে যেমনভাবে দেখিয়াছি, ঠিক সেই ভাবে বর্ণনা করিতে কাতর হই নাই। তাহাদের ধর্ম্ম-নীতি যদিও ইস্‌লামের অনুরূপ নহে, তবুও তাহা কোনওরূপ রং ফলাইয়া লিখি নাই—ইহা নিরপেক্ষ ব্যক্তির ঘটনা-বর্ণনা মাত্র। ইহাতে আমার অতিরঞ্জন কিছুই থাকিবে না।"

অনেক অহিন্দু প্রাচীন ভারতের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বহু ভ্রমে পতিত হন। কারণ, তাঁহারা অনুবাদের অনুবাদ তস্য অনুবাদ পড়িয়া সাত নকলে আসল খাস্তা করিয়া দেন। দশম ও একাদশ শতাব্দীর ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহারা বলেন যে, ভারতের হিন্দুগণ বিভিন্ন জাতিতে এমন ভাবে বিভক্ত ছিল যে, তাহাদের মধ্যে কোনরূপ ঐক্য ছিল না। কিন্তু শত পার্থক্যের মধ্যেও সমগ্র হিন্দু সমাজে একটা একজাতীয়তার ভাব ছিল, তীক্ষ্ণদর্শী আল্-বেরূনী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন যে, সেই একাদশ শতাব্দীতেও Hindus were a single people, one and undivided—হিন্দুরা একই অবিভক্ত জাতি ছিল। সত্য বটে, দেশে নানাবিধ দেবদেবীর পূজা আরাধনা ছিল, নানাবিধ দল ও উপদল ছিল, এবং দার্শনিক মতও নানা প্রকার ছিল। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? সমস্ত দল ও উপদল তাহাদের বিভিন্ন আদর্শ লইয়া পরস্পরের সহিত শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত পাশাপাশি বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। উচ্চশিক্ষিত হিন্দুগণ দেবদেবীসম্বন্ধে সাধারণ লোক হইতে পৃথক্ ধারণা পোষণ করিতেন। দেবদেবীতে বিশ্বাস সাধারণের জন্য দরকারী মনে করিলেও তাঁহারা নিজেরা উহাতে প্রগাঢ়ভাবে

বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং তাঁহারা প্লেটোর মত বিশ্বাস করিতেন যে, God is in the singular number—"ঈশ্বর একবচনাত্মক আদর্শ।"

আল্-বেরুনীর মতে, হিন্দুদের বিভিন্ন দার্শনিকগণের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তাহা বাহ্যিক, মৌলিক নহে। তিনি সমস্ত মতবাদ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই সব মতবাদের মধ্যে একটা সাধারণ ভিত্তি আছে। রসায়ন, গণিত, বস্তুবিজ্ঞান, বিশ্ববিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা ছিল। ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন দেবদেবীকে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ উদারভাবে দেখিতেন। সেই জন্য এক দল অন্য দলের সহিত মতের জন্য যুদ্ধ করিত না। বিভিন্ন স্থানে সামাজিক আচার-ব্যবহার কিছু কিছু বিভিন্ন ছিল, কিন্তু সমগ্র দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্ব্বত্র একই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও জীবন-সম্বন্ধে একই আদর্শ ছিল।

সে যুগের হিন্দুদের গুণ বর্ণনা করিতে যাইয়া আল্-বেরুনী তাহাদের ত্রুটিবিচ্যুতির কথা লিখিতেও ভুলেন নাই। একপ্রকার দাসমনোভাব ধীরে ধীরে তাহাদিগকে গ্রাস করিতেছিল। পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাহারা কাহারও সহিত জ্ঞানের আদান প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিল না। একটু গর্ব্বিত, একটু গোঁড়া ও নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা তাহাদের বৈশিষ্ট্য হইয়া পড়িয়াছিল। আর কেহ যে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ইহা তাহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না।

হিন্দু সমাজের জাতিভেদ-প্রথাকে আল্-বেরুনী সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। তিনি উহাকে সমর্থন করেন নাই, তবে খুব ধীরভাবেই এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। জাতিভেদ-প্রথার জন্য দশম শতাব্দীর হিন্দু সমাজ দায়ী নহে। তাহারও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে উহার উৎপত্তি। আল্-বেরুনী এ কথাও বলিতে ভুলেন নাই যে, এই প্রকার জাতিভেদ-প্রথা অন্যান্য বহু দেশেও ছিল। পারস্যেও উক্ত প্রকার জাতিভেদ প্রথা ছিল। হিন্দু ধর্ম্মের চরমতম বিকাশে জাতিভেদ-প্রথার স্থান নাই। কারণ, তখন ব্রাহ্মণ হিন্দুও শূদ্রের নিকট মাথা নত করে।

আল্ বেরুনী গীতোক্ত একটা শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, গীতার এক স্থানে আছে:—ঈশ্বর জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দয়া বিতরণ করেন। যদি মানুষ সৎকর্ম্ম করিতে গিয়ে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়, তবে তিনি সেই সৎকর্ম্মকে মন্দ বলিয়া ধরেন। এখানে একটা কথা লক্ষ্য করিতে

হইবে যে, হিন্দু ধর্ম্মের এই প্রকার উদার ব্যাখ্যা বর্ত্তমান যুগের সংস্কারবাদী হিন্দু পণ্ডিতের কথা নয়। সেই দশম শতাব্দীতে যুক্তিবাদী ভিন্নদেশীয় মুসলমান দার্শনিক হিন্দু ধর্ম্মকে যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা তাঁহারই অপক্ষপাতপূর্ণ গবেষণার ফল।

আল্-বেরুনী সে যুগের হিন্দুদের আর একটা প্রধান দোষ লক্ষ্য করিয়াছেন। সেটা হইতেছে তাহাদের তীব্র আগ্রহের অভাব। হয়ত ইহা সাহসের অভাবে নয়, কিন্তু ইহা তাহাদের ছিল। আর এই জন্য তাহারা খুব বড় বড় কাজ করিতে অশক্ত হইয়া পড়িতেছিল। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, বহু বিজ্ঞ হিন্দু ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করিতেন; এবং মূর্ত্তিপূজার প্রতি তাহাদের অনুরাগ ছিল না। আবার তিনি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, একদল গোঁড়া ও সংস্কারাপন্ন লোক ঈশ্বরসম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব সব রকম কথাই বিশ্বাস করিতেন। ইহার কারণ কি? আল্-বেরুনী বলিতেছেন, ইহার প্রধান কারণ দার্শনিক পণ্ডিতগণের সাধারণের মধ্যে সত্যপ্রচারের আগ্রহের অভাব। ঈশ্বরসম্বন্ধে যখন সাধারণ লোকের বিশ্বাস ও দার্শনিকের বিশ্বাসের মধ্যে বিরোধ বাধিত, তখন দার্শনিক পণ্ডিতগণ হয় দার্শনিক মত পরিত্যাগ করিতেন, অথবা জনসাধারণকে তাহাদের জ্ঞানানুসারে ঈশ্বরসম্বন্ধে জ্ঞান দান করিতেন।

হিন্দু দর্শন ছিল মূলতঃ esoteric (আভ্যন্তরীণ)। ইহা কুসংস্কার ও আচার মূলক বিশ্বাস হইতে মুক্ত। কিন্তু হিন্দু দার্শনিক ও সুধীগণ সাধারণের মধ্যে এই সব উচ্চ ভাব ও দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিবার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য গ্রহণ করেন নাই। হিন্দু দার্শনিকদের এই আচরণকে আল্-বেরুনী সমর্থন করেন নাই।

জ্ঞানবিজ্ঞানের কতকগুলি শাখায় হিন্দুরা যে খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আল্-বেরুনী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের সাহিত্য তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রীত ও মুগ্ধ করিয়াছিল। হিন্দু-সাহিত্যের মধ্যে বেদকে তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, সমগ্র বেদটা একখানি গ্রন্থ, যদিও ইহা চারিভাগে বিভক্ত। তাঁহার যুগের ব্রাহ্মণগণ ইহা পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহার অর্থ বুঝিতেন না। বেদকে তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পুরাণ তাঁহার মতে ঋষিদের রচিত গ্রন্থ। পুরাণ অষ্টাদশ খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে

অনেক গাল-গল্প থাকিলেও বহু নীতি ও উপদেশে ইহা পরিপূর্ণ; এবং ইহার অনেক গল্প রূপক। স্মৃতিশাস্ত্র বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে আইন, কার্য্যবিধি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিষয় আছে।

বিজ্ঞানালোচনার জন্য যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি আর্য্যদের জানা ছিল, এবং তাহাদের বিজ্ঞান বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল, যথা, বস্তুবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, মাপবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় তাঁহারা প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। আল্-বেরুনী আর্য্যদের জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষসম্বন্ধে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, জ্যোতির্ব্বিদ্যাসম্বন্ধে আর্য্যদের জ্ঞান গ্রীক হইতেও স্পষ্ট ছিল। কিন্তু ফলিত জ্যোতিষকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই; এবং এ-কথাও বলিয়াছেন যে, সে যুগের অনেক দার্শনিক হিন্দু তাহাতে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। রসায়ন ও ঔষধতত্ত্বে আর্য্যদের যে বিশেষ জ্ঞান ছিল, তাহা আল্-বেরুনী বার বার বলিয়াছেন। চরকের গ্রন্থ ঔষধ-বিজ্ঞানের মূল ও প্রামাণিক গ্রন্থ।

পঞ্চতন্ত্রখানি অনুবাদ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু গল্প অপেক্ষা বিদ্যার্জ্জনের দিকে তাঁহার বেশী ঝোঁক ছিল বলিয়া তিনি তাহাতে হাত দেন নাই।

আল্-বেরুনী অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন, কতকগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন, শ্রেণী বিভাগ করেন। আবার কতকগুলির লিপি উদ্ধারও করিয়াছিলেন, এবং তিনি অনেক গ্রন্থকে অবজ্ঞা ও বিস্মৃতির গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়া লোকলোচনের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। বহু দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ যে অমর কীর্ত্তি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দশম শতাব্দীর ভারতের এক উজ্জ্বল ইতিহাস। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথায় বলিতে হয়, "যথার্থবাদী ঐতিহাসিক বলিয়া, ভারতের প্রাচীন বিদ্যার একাগ্রচিত্ত অনুশীলনকারী বলিয়া সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে আল্-বেরুনীর নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হয়, এবং তাঁহার বই সযত্নে পঠিত ও আলোচিত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে সত্য পরিচয়-স্থাপনের চেষ্টায় জ্ঞানকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন বলিয়া আল্-বেরুনী সমস্ত সভ্য মানবের সাধুবাদের যোগ্য।"

আজ আমরা জাতিসমন্বয়, ধর্ম্মসমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক মিলন ও সম্প্রীতির

কথা আলোচনা করি; অথচ যাহাদের সহিত সমন্বয় ও মিলন করিতে যাইব, তাহাদের ভিতরের খবর একেবারেই রাখি না। আর যাহা রাখি, তাহা মিস্ মেয়ো, অথবা স্যার উইলিয়াম মুইরের পক্ষপাতপূর্ণ একদেশদর্শী গ্রন্থ পাঠ করিয়া। আমাদিগকে এই পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং আল্-বেরূনীর পন্থা অবলম্বন করিয়া অপরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।

আল্-বেরূনীর বহু পরে ভারত সম্রাট্ শাহ্‌জাহান-পুত্র মহাত্মা সাধক দারা শিকোহ্ এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং তিনি সেই উদ্দেশ্যে কতিপয় পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। "মাজমাউল বাহ্‌রায়েন"—অর্থাৎ "দুই সাগরের মিলন" নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি আমাদিগকে এই পথের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। মহাত্মার নির্দ্দেশিত সেই সব পথ ধরিয়া যদি আমরা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পরস্পরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বিষয় আলোচনা করি এবং পূর্ব্ব হইতে বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব পরিত্যাগ করি, তবে আশা করা যায়—মহামনীষী আল্-বেরূনীর সাধনা সার্থক হইবে, মহাপ্রাণ সাধক দারা শিকোহের আন্তর্মিলন সফল হইবে, এবং ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতিগত সমন্বয়, মিলন ও সদ্ভাব সম্ভব হইবে।

—রেজাউল করীম

স্বদেশমন্ত্র

বাহ্য জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে প্রত্যক্ষ শক্তি-সংগ্রহ-রূপ, প্রমাণ-বাহন, শতসূর্য্য-জ্যোতিঃ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি-প্রতিঘাতী প্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষীর উদ্ঘাটিত, যুগ যুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্ব্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ব্বপুরুষদিগের অপূর্ব্ব বীর্য্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্ব-কাহিনী।

একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী স্বরে, পূর্ব্ব-দেবদিগের আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্রিত পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গীতে অপূর্ব্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান ইত্যাদির দৃশ্য উপস্থিত হইয়াছে। একদিকে পাশ্চাত্ত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্য্যসমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্ত্য দেশে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায় রাজনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ। বর্ত্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্ম কল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্ব্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছি—

"ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ।
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।।"

একদিকে, নব্য ভারত-ভারতী বলিতেছেন, পতি-পত্নী-নির্ব্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত; কারণ, যে বিবাহ আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্ব্বাচন করিব; অপরদিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলা-মঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

একদিকে, নব্য ভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্ত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্ত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন হইব; অপরদিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহ-চর্ম্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?

একদিকে, নব্য ভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্ত্য জাতিরা যাহা করে, তাহাই ভাল; ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপরদিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান!

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টাযত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই?

আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ কি সর্ব্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।" যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্ব্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। কিন্তু একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, "বুঝি কোনও ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল।"

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা পাশ্চাত্ত্য অনুকরণমোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি বিচার শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গেরা যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই

ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?

পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল; পাশ্চাত্য নারী স্বয়ংবরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান; পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ, ভূষা, অশন, বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ; পাশ্চাত্যেরা মূর্ত্তিপূজা দোষাবহ বলে,—অতএব মূর্ত্তিপূজা অতি দূষিত, সন্দেহ কি?

পাশ্চাত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দাও। পাশ্চাত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে, অতএব সর্ব্ববর্ণ একাকার হও। পাশ্চাত্যেরা বাল্যবিবাহ সর্ব্বদোষের আকর বলে, অতএব তাহা অতি মন্দ নিশ্চিত।

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য—ইহাই বিচার করিতেছি না; তবে যদি পাশ্চাত্যদিগের অবজ্ঞা দৃষ্টিমাত্রেই আমাদের রীতি নীতির জঘন্যতার কারণ হয়, তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্ত্তব্য।

বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গায়ে কোনওপ্রকারে একটু লাগে, দুর্ব্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশ-ভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!! চতুর্দ্দশ শত বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্শীরা এক্ষণে আর "নেটিভ" নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রহ্মণ্যগৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্য্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি উহারা অনার্য্যজাতি!! উহারা আর আমাদের কেহ নহে!!!

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা-সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের বা নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই

"মায়ের" জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামানবের ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারত-বাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সুন্দর

যারা ভারি পণ্ডিত তারা সুন্দরকে প্রদীপ ধ'রে দেখতে চলে আর যারা কবি ও রূপদক্ষ তারা সুন্দরের নিজেরই প্রভায় সুন্দরকে দেখে' নেয়, অন্ধকারের মধ্যেও অভিসার করে তাদের মন। আলোর বেলাতেই কেবল সুন্দর আসেন দেখা দিতে, কালোর দিক থেকে তিনি দূরে থাকেন—একথা একেবারেই বলা চলে না, বিষম অন্ধকার না ব'লে বলতে হ'ল বিশদ অন্ধকার—যদিও ভাষাতত্ত্ববিদ্ এরূপ কথায় দোষ দেখবেন। কালো দিয়ে যে আলো এবং রঙ সবই ব্যক্ত করা যায় সুন্দরভাবে তা রূপদক্ষ মাত্রেই জানেন। এই যে সুন্দর কালো এর সাধনা বড় কঠিন। সেইজন্য জাপানে ও চীনদেশে একটা বয়স না পার হ'লে কালি দিয়ে ছবি আঁকতে হুকুম পায় না গুরুর কাছ থেকে শিল্পশিক্ষার্থীরা। যে রচনায় রস রইলো সেই রচনাই সুন্দর হ'ল এটা স্থির, কিন্তু রস পাবার মত মনটি সকল মানুষেই সমানভাবে বিদ্যমান নেই, কাজেই এটা ভাল ওটা ভাল নয় এই রকম কথা ওঠে। মেঘের সঙ্গে ময়ূরের মিত্রতা, তাই কোন্ একদিন নিজের গলা থেকে গন্ধর্ব্বনগরের বিচিত্র রঙের তারা-ফুলে গাঁথা রঙীন মালা ময়ূরের গলায় পরিয়ে দিয়ে মেঘ তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলে। মানুষ প্রথম ভাবলে, এমন সুন্দর সাজ কারো নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সে দেখলে বকের পাঁতি পদ্মফুলের মালার ছলে সুন্দর হয়ে মেঘের বুক থেকে মাটির বুকে নেমে এল,—মানুষ বল্লে, ময়ূর ও বক এরা দুইটিই সুন্দর। আবার এল একদিন জলের ধারে সারস পাখী—মেঘ যাকে নিজের গায়ের রঙে সাজিয়ে পাঠালে। এমনি একের পর এক সুন্দর দেখতে দেখতে মানুষ বর্ষাকাল কাটালে, তারপর শরতে দেখা দিলে আকাশে নীলপদ্মমালার দুটি পাপড়িতে সেজে নীলকণ্ঠ পাখী। এমনি ঋতুর পর ঋতুতে সুন্দরের সন্দেশ-বহ আসতে লাগলো একটির পর একটি মানুষের কাছে—সবশেষে এলো রাতের কালো পাখী আকাশপটের আলো নিভিয়ে অন্ধকার দুখানি পাখনা মেলে—পৃথিবীর কোন ফুল, আকাশের কোন তারার সঙ্গে মানুষ তার তুলনা খুঁজে না পেয়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো।

এই যে একটি মানুষের কথা বল্লেম, এমন মানুষ জগতে একটি দুটি পাই যার কাছে সুন্দর ধরা দিচ্ছেন সকল দিকে নানা সাজে নানা রূপে বর্ণে সুরে ছন্দে! ময়ূরই সুন্দর, কলবিঙ্ক নয়, কাক নয় এই কথা যারা বলছে এমন মানুষই পৃথিবী ছেয়ে রয়েছে দেখতে পাই।

যার চোখ সুন্দরকে দেখতে পেলে না আজন্ম তার চোখের উপরে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা ঘষে ঘষে ক্ষইয়ে ফেল্লেও ফল পাওয়া যায় না, আবার যে সুন্দরকে দেখতে পেলে সে অতি সহজেই দেখে নিতে পারলে সুন্দরকে, কোনো গুরুর উপদেশ পরামর্শ এবং ডাক্তারি দরকার হ'ল না তার, বিনা অঞ্জনেই সে নয়নরঞ্জনকে চিনে নিলে।

মাটি থেকে আরম্ভ করে সোনা পর্যন্ত, যে ভাষায় কথা চলে সেটি থেকে ছন্দোময় ভাষা পর্যন্ত, তারের সুর থেকে গলার সুর পর্যন্ত বহুতর উপকরণ দিয়ে রূপদক্ষেরা রচনা ক'রে চলেছেন সুন্দরের জন্য বিচিত্র আসন, মানুষের কাজে কতটা লাগবে কি না লাগবে এ ভাবনা তাঁদের নেই। কাদায় যে গড়ে সে কাদাছানা থেকেই সুন্দরের ধ্যান ক'রে চলে, না হ'লে গড়ার উপযুক্ত ক'রে মাটি কিছুতে প্রস্তুত করতে পারে না সে—একথাটা কারিগরের কাছে হেঁয়ালী নয়। চাষের আরম্ভ থেকেই সোনার ধানের স্বপ্ন জমীতে বিছিয়ে দেয় চাষা, কিন্তু যার সুন্দরের ধ্যান মনে নেই সে যখন ভাল মাটি নিয়ে ব'সে যায় এবং দেখে মাটি বাগ মানছে না তার হাতে, তখন সে হয়তো বোঝে হয়তো বোঝেও না কথাটার মর্ম্ম।

ছন্দ, সুর-সাধা এবং রঙ প্রস্তুত ও তুলি টানার প্রকরণ সহজে মানুষ আয়ত্ত করতে পারে, কিন্তু তুলি টানা হাতুড়ি-পেটা কলম চালানোর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দরের ধ্যানে মনকে স্থির রাখতে সবাই পারে না, এমন কি যারা রূপদক্ষ তারাও সময়ে সময়ে লক্ষ্য হারিয়ে ফেলছে তাও দেখা যায়।

যে রচনাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তার মধ্যে রচনার কল-কৌশল ধরা যায় না—কথা সে যেন ভারি সহজে বলা হয়ে যায় সেখানে। এই যে সহজ গতি এ থাকে না যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয় তাতে কৌশল নৈপুণ্য সবই চোখে পড়ে। কবিতা থেকে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, ছবি মূর্ত্তি সব থেকে এটা প্রমাণ করা চলে। কর্ম্ম কোনো রকমে নিষ্পন্ন হ'ল এবং কর্ম্ম খুব হাঁকডাক ধুমধামে নিষ্পন্ন হয়ে গেল, কিন্তু কার্য্যের জঞ্জালগুলো চোখে পড়লো না।

আমি একবার একটা ছাপার কল অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। যন্ত্রটা একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষের কাজ একা করছে, মানুষের চেয়ে সুচারু ও দ্রুতভাবে। এতে ক'রে ভারি একটা আনন্দ হ'ল, কিন্তু একটি পাখীকে উড়তে দেখে যে আনন্দ তার সঙ্গে সেদিনের আনন্দের তফাৎ ছিল। পাখীর ডানার মধ্যে নানা কল-বল কি ভাবে কাজ করছে তার খোঁজই নেই, ওড়ার সুন্দর ছন্দই সেখানে দেখা দিয়ে মনকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কোন্ দেশে তার ঠিক নেই। সৃষ্টির নিয়মে সমস্ত সুন্দর জিনিষ আপনার নির্ম্মাণের কৌশল লুকিয়ে চল্লো দর্শকের কাছ থেকে এবং এই নিয়মই মেনে চল্লো সমস্ত সুন্দর জিনিষ যা মানুষে রচনা ক'রলে—যেখানে নির্ম্মাণের নানা প্রকরণ ও কৌশল ধরা প'ড়ে গেল সেখানেই রচনার সৌন্দর্য্য হানি হ'ল, কলের দিক্ ধুটলো কিন্তু রসের দিক্ সৌন্দর্য্যের দিক্ চাপা প'ড়ে গেল। ঘুড়ি যখন আকাশে ওড়ে তখন যে কলটি তাতে বেঁধে দেয় কারিগর, সেটি বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে যায় তবেই সুন্দর ঠেকে ঘুড়িখানির ওড়ার ছন্দ। জাহাজ এমন কি উড়ো কল তারাও দেখায় সুন্দর এই কারণে এবং সবচেয়ে দেখায় সুন্দর গঙ্গার উপরে নৌকাগুলি যার চলার হিসেব ও কল-বল প্রত্যক্ষ হয়েও চক্ষুশূল হচ্ছে না।

সুন্দর জিনিষের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা—যেমন রূপ, তেমনি ভাব। বহিরঙ্গ যা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়ে সুন্দর বর্ত্তমান হ'ল। চোখের বাইরে যে পরকলা তার সঙ্গে চোখের ভিতরে যে মণিদর্পণ তার যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য হ'ল; তখনই সুন্দর-ভাবে দেখতে পাওয়া গেল বিশ্বের জিনিষ, চশমার কাঁচে আঁচড় প'ড়লো চোখ রইলো পরিষ্কার, কিংবা চোখের মণিতে ছানি প'ড়লো চশমা রইলো ঠিকঠাক, এ হ'লে সুন্দর দেখা একেবারেই সম্ভব হ'ল না।

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভদ্রতা

ভদ্রতা আত্মীয়তার চেয়ে কিছু কম এবং সামাজিকতার চেয়ে কিছু বেশী। আত্মীয়তা আন্তরিক, সামাজিকতা আনুষ্ঠানিক। ভদ্রতা উভয়ের মধ্যে সেতু-স্বরূপ, এবং উভচর।

এই বাঁধনের গুণেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা সম্ভবপর হয়, নচেৎ বাকি শুধু উচ্ছৃঙ্খল একাকার পশুত্ব,—কিংবা মুক্ত নিরাকার দেবত্ব।

অবশ্য যেখানে ভালবাসা, ভক্তি, ভয় বা অন্য কোন অ-পূর্ব্ব ভাবাত্মক সম্বন্ধ বিদ্যমান, সেখানে ভদ্রতার কথা ওঠেই না,—কারণ, খণ্ড ত সমগ্রের অন্তর্গত। সেখানে সন্তুষ্ট করবার ইচ্ছে স্বাভাবিক, সেখানে ব্যবহার ত আপনা হইতেই শুধু শিষ্ট কেন, মিষ্টই হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে অপরিচয় বা অতি পরিচয় বা ঔদাসীন্যবশতঃ মন সহজে অনুকূল নয়, সেইখানেই ভদ্রতার শিক্ষা ও চর্চ্চার প্রয়োজন। অর্থাৎ মনোভাব যেমনই থাকুক না কেন, লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নাম ভদ্রতা। এবং যে সমাজ যত সভ্য, তার লোক-ব্যবহার তত সদ্ভাবমূলক ও সুরুচিব্যঞ্জক।

সকলের মত এক না হলেও যেমন কার্যক্ষেত্রে অধিকাংশের মতে মত দিতে হয়, নইলে কাজ চলে না; তেমনি সকলের মন সমান না হলেও, সামাজিক অনুষ্ঠানে সৌভ্রাত্র ও সৌষ্ঠব রক্ষার্থে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয় তাকে বলে রীতি। ভদ্রতা রীতিমাত্র নয়, তার চেয়ে কিছু বেশী উদার। কারণ, রীতি ক্রিয়া-কর্ম্মক্ষেত্রে ও স্বশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ; কিন্তু ভদ্রতা সমাজবিশেষ ও স্থানবিশেষ ছাড়িয়ে সকল সমাজ এবং সকল অবস্থায় পরিব্যাপ্ত। মানুষমাত্রেই পরস্পরের কাছে তা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা দাবি করতে পারে।

অপরপক্ষে নীতির তুলনায় ভদ্রতার ক্ষেত্র অনেক সঙ্কীর্ণ। কোমর বেঁধে পৃথিবীর দুঃখ দূর বা পরের উপকার করতে যাওয়া, কিংবা ন্যায়ান্যায়ের বিচারপূর্ব্বক চলা, অথবা মহৎ কর্ত্তব্য পালন করা ভদ্রতার এলাকা নয়। যারা কাছাকাছি আছে, কিংবা ঘটনাচক্রে এসে পড়েছে, তাদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করাই তার মূল উদ্দেশ্য। সাময়িক এবং উপস্থিত নিয়ে তার কারবার,—কিন্তু অভাবপক্ষে তারই মধ্যে খণ্ডপ্রলয় বেধে যেতে পারে।

কিন্তু রীতির সঙ্গে ভদ্রতার এইটুকু সাদৃশ্য আছে যে, সব সময় সকলের প্রতি সকলের মনে সমান সদ্ভাব থাকা যখন সম্ভব নয়, তখন অন্ততঃ বাইরের প্রকাশের সুষমাবিধানার্থে অনুষ্ঠানের ন্যায়-ব্যবহারকেও কতকগুলি নিয়মাধীন করা সমাজ আবশ্যক মনে করে। আর নীতির সঙ্গে তার এইটুকু সাদৃশ্য আছে যে, মানুষের অন্তরতম প্রদেশে যদি মানুষের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি না থাকত ও পরস্পরের মনে আঘাত দেবার সহজ অপ্রবৃত্তি না হ'ত, তাহ'লে দীর্ঘকাল ধরে বহু লোকের পক্ষে সে নিয়ম রক্ষা করে চলা প্রায় অসম্ভব হ'ত। সুতরাং ভদ্রতাকে সংক্ষেপে লোকব্যবহারের ক্ষুদ্র রীতিনীতি বলা যেতে পারে। কিংবা মনুষ্য সম্বন্ধের 'ল সা গু', -অর্থাৎ প্রত্যেকের পরস্পরের প্রতি সেই পরিমাণ সদ্ভাব-প্রকাশ, যেটুকু নইলে জীবন-যান তৈলাভাবে অচল হয়ে পড়ত। কি ঘরে, কি বাইরে, এই সামান্য স্নেহলাভেও যে অনেক সময় মানুষকে বঞ্চিত হ'তে হয়, সেটি বড়ই দুঃখের বিষয়। অবশ্য সভাসমাজে অধিকাংশ লোকই স্পষ্টতঃ অভদ্র নয়, কিন্তু যে মার্জ্জিত ও মোলায়েম, সদাশয় ও সুশ্রী, চৌকোষ ও চোস্ত ব্যবহারকে যথার্থ ভদ্রতা বলা যেতে পারে, তাও সুলভ নয়।

অনেকে আজকাল আক্ষেপ করেন যে, একালের ছেলেদের ভদ্রতা কমে গিয়েছে। যেহেতু অল্প লোকেরই ত্রিকালজ্ঞ হবার সুযোগ ঘটে, সে কারণ আমি এ কথার সমর্থন বা প্রতিবাদ করতে অক্ষম। তবে এইটুকু স্বীকার্য্য যে, আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার দিন এদেশে গেছে বা যেতে বসেছে।

তার কারণ হয়ত এই যে, একালের লোকের সময়-সংক্ষেপ। প্রত্যেক চিঠির লাইন যোড়া ভিন্ন ভিন্ন পাঠ শিখতে ও লিখতে হ'লে বোধ হয় ইস্কুলের পাঠ বন্ধ করতে হয়। আর উঠতে বসতে যদি প্রত্যেক গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়, কিংবা সকলের কুশল প্রশ্ন অন্তে অন্য কথা পাড়তে হয়, তাহ'লেও আধুনিক জীবনযাত্রা চালানো দায় হয়ে পড়ে।

আর এক কারণ এই হ'তে পারে যে, একালে গুরু-লঘু সম্পর্কের দূরতাকে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত করবার দিকে আমাদের ঝোঁক হয়েছে। যাকে 'আপনি' বলা, বাপ খুড়োর সামনে তটস্থ হয়ে থাকা, শাশুড়ী-ননদের কাছে এক হাত ঘোমটা টেনে ইসারায় কথা কওয়ার আমলের তুলনায় আজকাল আমরা হয়ত অপেক্ষাকৃত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি।

কিন্তু এমন যে ব্রাহ্মণ জাতি,—যার তুল্য গুরু সেকালে ছিল না, তারাও যখন কালকালে পূর্বপ্রাপ্য পদমর্য্যাদা থেকে চ্যুত হ'তে বাধ্য হয়েছেন, তখন অন্যান্য গুরুজনকেও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণে নিজ নিজ বাকি খাজনা এবং উপরি পাওনার লোভ সংবরণপূর্ব্বক সমতল সমকক্ষতার শ্রীক্ষেত্রে হাসিমুখে নামতে হবে, এবং কালের সঙ্গে সমপদবিক্ষেপে চল্‌তে হবে। সুতরাং উপরি-উক্ত অনুষ্ঠানের ধূলাটি মার্জ্জনা ক'রে দেখতে হবে যে, সারভূত ভদ্রতার লক্ষণ কি,—যে ভদ্রতা সব দেশের, সব কালের এবং সব পাত্রের।

প্রতীক বা স্মরণচিহ্ন রচনার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মজ্জাগত। অসীমকে সসীমে বাঁধবার, নিরাকারকে সাকারে ধরবার প্রয়াস তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা সকলেই পৌত্তলিক ; তবে প্রকাশের তারতম্য আছে, সাকারীকরণের মাত্রাভেদ আছে। মূর্ত্তিও সাকার, মন্ত্রও সাকার,—কিন্তু কম বেশী। বড়কে ছোটর দ্বারা, ব্যষ্টিকে সমষ্টি দ্বারা, অরূপকে রূপ দ্বারা প্রকাশ করবার এই চেষ্টার উদ্দেশ্য অস্পষ্টকে পরিস্ফুট এবং অলক্ষ্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা। তোমার মনে অনেকখানি ভক্তি থাকতে পারে, কিন্তু বাইরে তার কোন চিহ্ন না দেখালে আমিই বা জানব কি ক'রে, তুমিই বা জানাবে কি ক'রে?—অতএব প্রণাম কর। অতএব দাম্পত্য-জীবনের বন্ধন লোহ দ্বারা স্মরণ করাও, তার আনন্দ সিন্দুর-অলক্তক-তাম্বুলের লোহিত রাগে ব্যক্ত কর ; এবং বৈধব্যের শূন্যতা বরণাভরণ-হীন বেশে সূচিত হোক্। খৃষ্টের পরার্থপর অমানুষিক যন্ত্রণা একটি ক্রুশের চতুঃসীমায় আবদ্ধ, বিশ্বলক্ষ্মীর অপরিসীম, অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য একটি পদ্মে বিকশিত, ভক্তির চক্ষে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি একটি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত।

এই চিহ্নতন্ত্রে লাভও আছে, যেহেতু মানুষের সহজ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংযত ক'রে আনবার সাহায্য করে; আবার ক্ষতিও আছে, যেহেতু জড়বস্তু দ্বারা চেতনকে, অনুষ্ঠান দ্বারা অনুভূতিকে চাপা দেবারও সাহায্য করে। প্রণাম আন্তরিক ভক্তিজ্ঞাপনও করতে পারে, আবার তার অভাব গোপনও করতে পারে।

সেইজন্য সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যের সেই সকল প্রমাণের প্রতি বোধ হয় মানুষের বেশী ঝোঁক হয়েছে, যা অত সুলভ ও ক্ষণস্থায়ী নয়; যা একটিমাত্র নির্দিষ্ট আচরণে পর্যবসিত নয়, কিন্তু সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত।

এইজন্যই বলছিলুম যে, আনুষ্ঠানিক বা স্থূল ভদ্রতা অপেক্ষা আজকাল সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর মূল ভদ্রতার মূল্য বেশী হতে চলেছে। দেশকাল-ভেদে প্রথমোক্তের নানা ভিন্ন প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু শেষোক্ত-সম্বন্ধে মতভেদের অবসর কম। ভদ্রতার এই বাহ্য আকৃতিবৈষম্য ভুলে গিয়ে তার অন্তঃপ্রকৃতি-বিশ্লেষণের প্রতি মন দিলে দেখতে পাব যে, তার কতকগুলি লক্ষণ সর্বজনীন ও সর্ববাদিসম্মত।

প্রথমতঃ—ভদ্রতার মূল পরহিতৈষণা, এবং তার ফল সংযম। উপস্থিতমত পরের যাতে কষ্ট না হয়, আমার বাড়ী এসে বা আমার সম্পর্কে থেকে ক্ষণকাল যাতে অন্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, ভদ্রলোকের স্বভাবতই এই ইচ্ছা হয়। এবং সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করতে হলে অনেক সময় নিজের তৎকালীন প্রতিকূল ইচ্ছা দমন করতে হয়, নিজের আপাত সুবিধা বিসর্জন দিতে হয়। আমার যে সময় জরুরী কাজ আছে, সে সময় হয়ত একজন দেখা করতে এলেন; ভদ্রতার নিয়মানুসারে আমার সব কাজ ফেলে রেখে তার আতিথ্যে মনোনিবেশ করতে হবে। কিংবা হয়ত কোন মাননীয় ব্যক্তি আমার মুখের সামনে হাঁসকে বক, শালিককে কাক বলছেন, আমার কণ্ঠাগ্রে এলেও মুখে বলবার সাধ্য নেই যে, "ওগো, তুমি মিথ্যা কথা বলছ; কিংবা আর একজনকে—"তোমার নিজেরই সম্পূর্ণ দোষ ত্রুটি ঘটেছে", কিংবা অপর একজনকে—"অন্যের নিন্দা করবার আগে একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখলে ভাল হয় না?"

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে সম্প্রতি যে অভদ্রতার প্রাদুর্ভাব হয়েছে এই প্রসঙ্গে সেজন্য দুঃখপ্রকাশ না করে থাকা যায় না। সরস্বতীর মন্দিরে প্রবেশ করবার সময়ও কি জুতাজোড়াটার সঙ্গে আমরা বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ দলাদলির ভাবটা বাইরে রেখে আসতে পারিনে? অবশ্য সাহিত্যচর্চার যদি কোন উচ্চ লক্ষ্য থাকে ত সে কেবল লীলা-কমলের ব্যজন অবলীলাক্রমে সাধিত হবে না, তা জানি,—অকল্যাণকে তাড়াতে হলে মধ্যে মধ্যে কুলোর বাতাসও দেওয়া চাই। কিন্তু তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম মারাত্মক অস্ত্র যে কোন প্রকার শ্লেষের অস্ত্র সাহিত্যরথী ব্যবহার করুন না কেন, ইতরতা বা দুষ্টতার অস্ত্রপ্রয়োগ এস্থলে নিষিদ্ধ হওয়া

উচিত। যিনি বাণীর সেবক হবার স্পর্দ্ধা রাখেন, অশুদ্ধ বাণী ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে বিশেষরূপে বিসদৃশ নয় কি?

স্পষ্টবাদীর দল উল্লিখিত সংযমাত্মক ভদ্রতাকে কপটতার নামান্তর মনে করেন। "আমার বাপু স্পষ্ট কথা" ব'লে আরম্ভ ক'রে তাঁরা মুখে যা আসে তাই বল্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না, বরং গর্ব্বই অনুভব করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মন এবং মুখের মধ্যে একটা পাকা বাঁধ বেঁধে না রাখলে দু'দিনও কি সমাজ টিকতে পারে?—আমার ত মনে হয় কতকগুলি কথা বা বিষয়কে একঘরে করা ভালই হয়েছে। স্পষ্টবাদিতার দোহাই দিয়ে ভদ্রসমাজে সে বাঁধ ভাঙ্গায় আমি ত কোন বাহাদুরি বা সুবিধা দেখতে পাইনে। সামান্য একটি খিল খুলে দিলে অতি বড় বন্ধনও সহজে শিথিল হয়ে পড়ে, একটি পরদা তুলে ফেল্লেও অনেকটা আব্রু নষ্ট হ'তে পারে। কথার সংযম কিছু কম গুরুতর জিনিস নয়। যদি তা কপটতাই হয় ত সে-পরিমাণ কপটতা সমাজরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। আমাদের কান যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূক্ষ্ম শব্দের বেশী শুনতে পায় না; চোখ যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বের বেশী দেখতে পায় না, তেমনি বোধ হয় অখণ্ড সম্পূর্ণ সত্য আমাদের মন গ্রাহ্য বা সহ্য করতে পারবে না ব'লেই ভগবান্ দয়া ক'রে অন্তরের আড়ালে রেখে দিয়েছেন। ঐখানেই ত তাঁর ভদ্রতা!—বেশী তলিয়ে বুঝে লাভ কি? অনেক সময় কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোয়, কিংবা ঐ কথাই একটু ঘুরিয়ে ভাব দিয়ে বলা যেতে পারে যে, অনেক সময় সত্য খুঁজতে খুঁজতে শুধু "নিখিল অশ্রুসাগরকূলে" গিয়ে পৌঁছতে হয়।

কিন্তু অল্প মাত্রায় যা উপকারী, বেশী মাত্রায় তাতেই হিতে বিপরীত হ'তে পারে,—যথা হোমিওপ্যাথি ওষুধ। পরের মনে লাগানো কথা বল্‌বে না ব'লেই যে পরের মন-যোগানো কথা বল্‌তে হবে, তার কোন মানে নেই। কেউ কেউ ভদ্রতার সঙ্গে খোসামুদির তফাৎ করতে পারেন না ব'লে নিজের মানরক্ষার জন্য পরকে অপমান করা আবশ্যক এবং কর্ত্তব্য বোধ করেন। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে ব'লে ত আমার বিশ্বাস।—ভদ্রতার সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি, খোসামুদির দৃষ্টি কেবল নিজের প্রতি, ভদ্রতা নিজের অসুবিধা ক'রেও পরের সুবিধা ক'রে দিতে উৎসুক, খোসামুদি নিজের সুবিধাটুকুই বোঝে ও খোঁজে; ভদ্রতা চৌকোষ, সবল ও সুন্দর,—খোসামুদি একপেশে, কুটিল ও কুৎসিত। একটু সংসারজ্ঞানের চর্চ্চাই খোসামুদি এড়াবার প্রকৃষ্ট উপায়। যে

পৃথিবীতে এসেছি, সেটা কি রকম জায়গা জানতে না পারলে উন্নতিচেষ্টা করব কি ক'রে?—যেখানে শক্ত, সেইখানেই ভক্ত বা অতি ভক্ত!—যেখানে অক্ষমতা সেইখানেই পরমুখাপেক্ষিতা। ছোট ছেলে কি কম খোসামুদে? তবে তাদের সবই সুন্দর।

আর একটি জিনিস আছে, যা ভদ্রতার বেনামিতে চলে, অথচ বেশী পরিমাণে যা ক্ষতিকর;—সেটি হচ্ছে চক্ষুলজ্জা। এটি আমাদের দেশের ও জাতের একটি রোগবিশেষ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, এবং খুব কম লোকই সে রোগ হ'তে মুক্ত। মনে মনে আমার কোন একটি অনুরোধ রক্ষা করবার মোটেই ইচ্ছা নেই, এমন কি অভিপ্রায় নেই,—অথচ চক্ষুলজ্জায় পড়ে আমি অনুরোধকর্ত্তার সামনে বেশ একটু উৎসাহসহকারেই তার প্রস্তাবে সম্মত হলুম। এ স্থলে যদি বিরক্তভাবে কাজটা ক'রে দিই ত মন্দের ভাল; কিন্তু একবার একজনের জন্য করলেই ত অব্যাহতি পাওয়া যায় না, আর ক্রমাগত অনিচ্ছাসত্ত্বে ঢোঁক গিলেও নিজের হজমশক্তির উপর একটু অত্যাচার করা হয়! আবার যদি করব ব'লে না করি, তাহ'লে নিজের কথারও খেলাপী হয়, নিজের মনও খুঁৎখুঁৎ করে, আর অনর্থক পরের আশাভঙ্গও করা হয়। মতামত সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ভদ্রতার সঙ্গে একটু দৃঢ়তা মেশানোই উক্ত রোগের একমাত্র চিকিৎসা। অমায়িক অথচ আত্মপ্রতিষ্ঠ, লোকপ্রিয় অথচ সত্যনিষ্ঠ,—এমন সংমিশ্রণ এদেশে এত দুর্লভ কেন? কেন খাঁটি লোক যেন রুক্ষ হ'তেই বাধ্য, এবং শিষ্ট শান্ত ব্যক্তির উপর জুলুম হওয়াটাই নিয়ম?—তাও বলি যে, দাতা ও গ্রহীতা না হ'লে যেমন দান সম্পূর্ণ হয় না, তেমনি অনুরোধকারীও মাত্রা বুঝে পীড়াপীড়ি করলে তবেই ভদ্রতা রক্ষা করা সম্ভব,—নইলে অযথা টান পড়লে ছিঁড়তে কতক্ষণ!

সংযম যেমন ভদ্রতার প্রধান নিবৃত্তিমূলক লক্ষণ, তেমনি সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি বা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা তার প্রধান প্রবৃত্তিমূলক লক্ষণ। অর্থ-সামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি, রূপগুণ, মানমর্য্যাদা যার যেমনই থাকুক না কেন কম হ'লেও তাকে পায়ের তলায় ঠেসবার দরকার নেই, বেশী হ'লেও তার পায়ের তলায় পড়ে থাকবার দরকার নেই। যাকে ভাল লাগে তার সঙ্গে গলাগলিও ক'র না, যাকে মন্দ লাগে তাকে গালাগালিও দিও না, সকলের প্রতি সহজ সদয় ব্যবহার ক'র,—এই হচ্ছে ভদ্রতার বিধান। ভদ্রতা ব্যবহার-নীতি মাত্র, মনের নিয়ন্তা নয়। তবে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে, বাইরে যে ভাব দেখানো যায়, সেটা ক্রমে

মনের ভিতর পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়, যেমন রাগের প্রকাশ দমন করতে করতে রাগ কমে আসা সম্ভব। পূর্ব্বে ভদ্রতাকে বাঁধ বলেছি; আবশ্যক-স্থলে এই বাঁধই যে প্রাচীরের কাজ করতে পারে, তার আর আশ্চর্য্য কি?—যেখানে এই প্রাণের এই আড়ালটুকু রাখতে চাইনে, অর্থাৎ যেখানে প্রকাশই উদ্দেশ্য—সেখানে অবশ্য ভদ্রতার কাজ ফুরায় এবং উচ্চতর নেতার হাতে রাজদণ্ড দিয়ে সে স'রে পড়ে।

সেইজন্যই আত্মীয়তা যেখানে শুধু রক্ত নয়, অনুরক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ভদ্রতার ব্যবধান সেখানে অনাবশ্যক,—এমন কি অপ্রীতিকর। অতি দুঃখের বিষয়, নিকট এবং স্থায়ী সম্পর্ক স্থলেও যখন সব সময়ে আশানুরূপ মনের মিল থাকে না, তখন আত্মীয়ের মধ্যেও সাধারণতঃ ভদ্রতার নিয়ম উপেক্ষা না করাই ভাল। একসঙ্গে থাকতে গেলে অষ্টপ্রহর মেজাজে মেজাজে স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ হয়ে যে উত্তাপ সঞ্চিত হয়, দৈনিক কর্ম্মজীবনযাত্রায় অনিবার্য ভাবে যে ধূলিজাল উত্থিত হ'তে থাকে, ভদ্রতার স্নিগ্ধ শান্তিবারিসিঞ্চনই তা কথঞ্চিৎ নিবারণের অন্যতম উপায়। নিজ নিজ পারিবারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই অধিকাংশ লোক বুঝতে পারবেন যে, সময়মত একটু সহৃদয় ব্যবহার, অবস্থা বুঝে একটু সংযম, একটি মিষ্টি কথা, একটি হাসির আলোর অভাবে শেষে পরস্পরের মনে এমন দাগ লেগে যায় যে, হাজার চেষ্টাতেও তা মুছে ফেলা যায় না; ভাঙ্গা জোড়া লাগলেও জোড়ের চিহ্ন চিরকাল থেকে যায়। হাঁড়ি কলসী একসঙ্গে থাকলেই ঠোকাঠুকি হয়, সে কথা সত্য, কিন্তু একটু ঘন ক'রে প্রলেপ দিলে আওয়াজটা কম হয়, এবং টেকেও বেশীদিন! বাঙালীরাও পরিবারগতপ্রাণ। সেই পারিবারিক জীবনের উপর প্রায় তার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ নির্ভর করে। তাই সুখের সংসার গ'ড়ে তোলবার কোন উপচারই আমাদের অবহেলা করা উচিত নয়। বাইরে যতই মানসম্ভ্রম নামডাক থাকুক না কেন, বাড়ীর ভিতরে শান্তি না থাকলে কোন সংসারী লোকের মনই তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। বরং শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ গৃহে এসে বাইরের বিতণ্ডা ও বিরক্তি ভুলতে পারা যায়।

আত্মীয়তা-ক্ষেত্র এত জটিল ও গভীর, এত রকম বাধ্যবাধকতাপূর্ণ ও দেনাপাওনাজড়িত যে, সেখানে ভদ্রতার চেহারা ভাল ফোটানো যায় না, ও বেশী নীতির কাছঘেঁষা হয়ে পড়ে। ঘরের বাইরে অনাত্মীয় যে বিস্তৃত সমাজ প'ড়ে আছে, সেইখানেই ভদ্রতার যথার্থ রূপ ও কদর বোঝা যায়, সেইটেই তার প্রকৃত

কর্ম্মক্ষেত্র। কারণ, এই ভদ্রতা-সেতু পার হয়ে তবে ত ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গতায় পৌঁছানো যায় যদি কপালে থাকে!

ভদ্রতা বিস্তৃত নীতিক্ষেত্রের সামান্য একটি অংশমাত্র হলেও তার গৌরব ও প্রয়োজনীয়তা কিছু কম নয়। কথা ও কার্য্য—এই দুই ক্ষেত্রে তাকে বিভক্ত করা যেতে পারে, এবং দুইয়েরই বিধিনিষেধ আছে। সেগুলি এত লোকবিশ্রুত, বাপমায়েরা এত করে সেগুলি ছেলেদের মনে বসাবার চেষ্টা করেন যে, পুনরাবৃত্তি বাহুল্য। জানে শোনে সবাই সব, কিন্তু সব সময় কাজে পেরে ওঠে না, সেইটিই দুঃখের বিষয়। "পাঞ্চ" নামক বিলাতী হাসির কাগজে মজার কথাগুলি প্রায়ই এই দুই শিরোনামাঙ্কিত থাকে: এক, "Things that had better been left unsaid," আর এক, "Things that ought to have been expressed otherwise" অর্থাৎ যা না বললে ভাল হ'ত, এবং যা অন্য রকমে বলা উচিত ছিল। ভদ্রতা সম্বন্ধে বাচনিক নিষেধ অধিকাংশ এই দুই শ্রেণীভুক্ত। এ বিষয়ে "সত্যং ব্রূয়াৎ" শ্লোকে যে লাখ কথার এক কথা বলা হয়েছে, তার উপর আর কিছু বলবার নেই। কার্যক্ষেত্রে ভদ্রতার এই রকম কোন মূলমন্ত্র আমাদের শাস্ত্রে আছে কিনা জানি না, তবে ইংরাজিতে যাকে ব্যবহারের "Golden rule" (বা সোনার কাঠি।) বলে, সেটা এস্থলেও খাটে। ছেলেবেলায় তার যে অনুবাদ শুনে হাসি পেত, সেটি এই:—"নিজে ব্যবহৃত হতে চাহিবে যেমন, কর কর ব্যবহার অপরে তেমন!" এর ভাষা যেমনই হোক, ভাব ঠিক আছে, এবং তার এই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, ছোটখাটো বিষয়ে রীতিরক্ষা, এবং অন্যের যাতে সুবিধা, সাহায্য বা তুষ্টিসাধন হয়, তাই করাই ভদ্রতা, ও তদ্বিপরীত করাই অভদ্রতা।

আমাদের রাজদরবার ছিল না বলে কিংবা যে কারণেই হোক,—ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালাদেশে সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের একটু অভাব লক্ষিত হয়। উক্ত নীচ সম্বন্ধ ব্যতীত সমকক্ষ মেলামেশার সকল অবয়ব যেন এখানে সম্পূর্ণ নয়। অপর জাতের সঙ্গে ব্রাহ্মণের দেখা হলে সাধারণ অভিবাদনের কোন নির্দ্দিষ্ট রীতি; আত্মীয়া ভিন্ন অপর স্ত্রীলোককে সম্বোধন করবার কোন শিষ্ট প্রথা নেই। কিংবা আগে থাকলেও, এখন লোপ পেয়েছে। অন্যান্য বিষয়ে যেমন, এ সব বিষয়েও তেমনি, আমরা দায়ে প'ড়ে ইংরাজী সভ্যতার শরণাপন্ন হয়েছি। কিন্তু প্রত্যেক

খুঁটিনাটি বিষয়ে ইংরেজদের নকল করাটা বিশেষতঃ সামাজিক ক্ষেত্রে, মোটেই শোভন বা বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য এতদূর এগিয়ে এসে হঠাৎ বেশী পিছিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। আমি একলা ঘরে ব'সে একটা মনগড়া নিয়ম মানলেই চ'লে যেতে হ'ল না। দশজনকে যদি সঙ্গে নিতে চাই ত, সমাজের অবস্থা বুঝে যা সয় সয় এমন নিয়মই চালাবার চেষ্টা করতে হবে। যা' কালের অতল বিস্মৃতিসাগরে চিরবিলুপ্ত, তীরে ব'সে ব'সে তাকে পুনরুদ্ধার করবার বৃথা চেষ্টায় সময় নষ্ট না ক'রে, [illegible] যেটুকু দেশীয় শিষ্টতা প্রচলিত আছে, সেটুকু যাতে নবভাবের সঙ্গে জড়িত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত।

আত্মীয়তার বাইরেই ভদ্রতার পূর্ণ প্রকাশ ও প্রয়োজনীয়তা যেমন, তেমনি সেই বাইরের সমাজে, আবার কথোপকথনের ক্ষেত্রেই তার চরম বিকাশ লক্ষিত হয়, কারণ, ক্ষণিক মেলামেশার সঙ্কীর্ণ অবকাশে পরস্পরের জন্য হাতে কলমে [illegible] কিন্তু [illegible] সুযোগ কমই পাওয়া যায়। [illegible] যে [illegible] সাহচর্যগুলি [illegible] ও [illegible] ভাল দেখায়, পুরুষসমাজে পরস্পরের মধ্যে তারও বিশেষ আবশ্যক হয় না,—অবশ্য বয়সের বেশী তফাৎ না থাকলে। কিন্তু সমবয়সী ও সমকক্ষ পুরুষসমাজের কথোপকথন স্থলেও আমাদের কতকগুলি জাতীয় দোষ প্রকাশ পায়, যা সংশোধন করতে পারলেই ভাল। মেয়েরাও সে-দোষবর্জ্জিত নয়। প্রথমতঃ আমরা প্রায় সকলেই বেশী চেঁচিয়ে কথা কই, দ্বিতীয়তঃ তর্কস্থলে আমরা অধিকাংশ লোকই চটে গিয়ে কূটতর্ক, জিদ বা ব্যক্তিগত খোঁটার আশ্রয় নিই; তৃতীয়তঃ আমরা অন্যের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে অধীরভাবে মাঝে বাধা দিয়ে কথা বলি (হিত অথচ মনোহারী বাক্যের চেয়ে কি মনোযোগী অথচ সমজদার শ্রোতা বেশী দুর্লভ নয়?)। চতুর্থতঃ আমরা নিজের উপস্থিত ইচ্ছামত কথা ব'লে যাই, শ্রোতা বুঝে কথার বিষয় এবং মাত্রা নির্দ্ধারণ করিনে। আমার শরীরের অসুখ বা আমার মনের ভাবনার বিস্তারিত বিবরণ যে সকলের রুচিকর না বোধ হ'তে পারে সে কথা ভুলে যাই, এবং অন্যকে কথা বলবার বা মতামত ব্যক্ত করবার অবসর দিইনে।

ফলে দাঁড়ায় এই যে, সকলে একসঙ্গে বলে কিন্তু কেউ শুনে না'—কিংবা ইংরাজিতে যাকে বলে 'oneman-show' তাই হয়, অর্থাৎ একজন-মাত্র বক্তা, আর সকলে শ্রোতা। অথচ আসল সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা বা

সমালোচনাই সামাজিক মেলামেশার প্রধান সুখ ও সার্থকতা। পঞ্চমতঃ আমরা জেনে শুনে এমন প্রসংগ উত্থাপন করি যা উপস্থিত লোকের পক্ষে অপ্রীতিকর। অথবা এমন ক'রে কথা বলি যাতে তাদের কারো মনে লাগতে পারে—ভাষায় যাকে বলে "ঠেস দিয়ে কথা বলা"।—দরকার কি? ভদ্রতা যদি নীতি না হয় ত ভদ্রসমাজও নীতি উপদেশ বা শাসনদণ্ডের স্থান নয়। বেশী শাসন করতে চাও সমাজ থেকে তাড়াও; কিন্তু যে যতক্ষণ সমাজে আছে তার সংগে ভদ্র ব্যবহার কর। অভদ্রতা না ক'রেও বোধ হয় একজনকে বোঝানো যায় যে তাকে আমার বড় পছন্দ নয়, এবং সময়ে সময়ে তা বোঝানো আবশ্যকও হয়ে পড়ে; কিন্তু এগুলি ভদ্রতার ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়ম নয়। আত্মীয়তার স্থলে ভালবাসার অভাব ভদ্রতায় পূর্ণ করা শক্ত বটে; কিন্তু অনাত্মীয়কেও ভদ্রতা, বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ক্ষণকালের জন্যও ভূষিত হওয়া ত সহজ বলেই বোধ হয়। পর যখন এত অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়, তখন সেটুকু তার জন্য না করাটাই আশ্চর্য, করায় কিছু বাহাদুরী নেই। অর্থ বা মানের দম্ভে যাঁরা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন ও মানুষকে মানুষ জ্ঞান করেন না, তাঁরা ভুলে যান যে, মানুষ নইলে মানুষের একদিনও চলে না এবং চিরদিন কারো সমান যায় না।

পরিশেষে আবার বলি যে, ভদ্রতা সর্বরোগের মহৌষধ না হ'লেও, এবং তার প্রসার বা গভীরতা বেশী না থাকলেও, তা ঘরে বাইরে অতি আবশ্যকীয় উপাদেয় জিনিস, এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্যকর্তব্য,—শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। এক দিনের জন্যও যদি ভদ্রতা সমাজ থেকে হুটি নেয়, তাহ'লে কি ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হয়, তা মনে করতেও কি হৃৎকম্প হয় না? এক হিসেবে ভদ্রসমাজের সকলেই যেন একটি পাৎলা বরফখণ্ডের উপর নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে,—পায়ের তলায় একটু ভাঙ্গলেই অতল জলে মজ্জমান হবার সম্ভাবনা;—কিন্তু ভাগ্যক্রমে সহজে ভাঙ্গে না। এই ধূলিম্লান পৃথিবীর রুক্ষতাকে মোলায়েম ক'রে এনে দৈনিক জীবনধারার যাতে একটু শ্রী সম্পাদন করতে পারি, সকলেরই কি সেই চেষ্টা করা উচিত নয়? যদি কেউ এর আনুষ্ঠানিক কর্তব্য থেকে রেহাই পেতে পারে ত সে কেবল সেই সকল অসাধারণ লোক, যাঁরা এমন কোন বৃহৎ কাজ বা মহৎ চিন্তায় লিপ্ত আছেন যাতে সমাজের ছোটোখাটো আদেশ পালন করবার সময় পাওয়া অসম্ভব এবং সর্বদাই অন্যমনস্ক থাকতে হয়;—যাঁরা সংসারে থেকেও সংসার ও সমাজকে অতিক্রম করেছেন। শুধু ভদ্রতার দ্বারা বড় কাজ কিছু হবে না সত্য, কিন্তু

ছোট নিয়েই ত আমাদের অধিকাংশের অধিকাংশ জীবনের কারবার,—ছোট কাজ ছোট কর্তব্য, ছোট সুখ, ছোট দুঃখ। আমাদের বড় বড় ঋষিরাও ত প্রার্থনা করেছিলেন—"যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।" যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ, তাহাই আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।

—ইন্দিরা দেবী

UNIVERSITY
BENGALI SELECTIONS

ABRIDGED EDITION

UNIVERSITY OF CALCUTTA
1972

Rs. 2'50

UNIVERSITY BENGALI SELECTIONS

ABRIDGED EDITION

UNIVERSITY OF CALCUTTA
1972

ভূমিকা

এই পুস্তকে সংকলিত রচনাগুলি প্রকাশের জন্য যে সকল স্বত্বাধিকারী আমাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সূচী

পদ্যাংশ

রচয়িতা ও বিষয়	যে পুস্তক হইতে গৃহীত		পত্রাঙ্ক

গদ্যাংশ

UNIVERSITY BENGALI SELECTIONS

পদ্যাংশ

ফুল্লরার বারমাস্য

বসে ধীরে কহে রামা, যত দুঃখবাণী।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর, তালপাতার ছাউনি।।
ভেরেণ্ডার খাম ওই আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।।
বৈশাখে অনল সম বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা।।
পা পোড়ায় খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন।।
বৈশাখ হৈল বিষ গো, বৈশাখ হৈল বিষ।
মাংস নাহি খায়—সর্ব্বলোক নিরামিষ।।

পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন।
রবিকর করে সর্ব্ব শরীর দহন।।
পসরা এড়িয়া জল খাইতে যাইতে নারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে লয় আধা-সারি।।
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস, পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস।
বঁইচির ফল খেয়ে করি উপবাস।।

আষাঢ়ে পূরিল মহী নব-মেঘে জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল।।
মাংসের পসরা লইয়া ফিরি ঘরে ঘরে।
কিছু খুদ কুঁড়া পাই, উদর না ভরে।।
কি কহিব দুঃখ মোর কহনে না যায়।
কাহারে বলিব বল দোষী বাপ মায়।।

শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবসরজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।।
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী।।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়েতে আইসে বান।।

ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
নদনদী একাকার আট দিকে জল।।
কিরাতনগরে বসি না মিলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি যেবা সহে ভার।।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
বৃষ্টি হইলে কুঁড়ার ভাসিয়া যায় বান।।

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে।
ছাগ মেষ মহিষ দিয়া বলিদানে।।
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।।
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ-মাংস সবাকার ঘরে।।

কার্ত্তিক মাসেতে হইল হিমের জনম।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।।
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।।
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।
পিরাণ দোপাটা দিতে করে টানাটানি।।

মাসমধ্যে মার্গশীর্ষ আপনি ভগবান্।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান।।
উদর ভরিয়া ভক্ষ্য দিল বিধি যদি।
যম-সম শীত তাহে নিরমিল বিধি।।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।।

পৌষে প্রবল শীত, সুখী জগজনে।
তৈল তুলা তনুনপাৎ তাম্বুল তপনে।।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।
অভাগী ফুল্লরা-মাত্র শীতের ভাজন।।
হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা।
পরিতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা।।
বৃথা বনিতাজনম, বৃথা বনিতাজনম।
ধূলিভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন।।

মাঘ মাসে অনিবার সদাই কুজ্ঝটী।
আঁধারে লুকায় মৃগ, না পায় আখেটী।।
ফুল্লরার আছে যত কর্ম্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক।।

নিদারুণ মাঘ মাস, নিদারুণ মাঘ মাস।
সর্ব্বজন নিরামিষ কিংবা উপবাস॥

সহজে শীতল ঋতু ফাল্গুন মাসে।
পোড়য়ে যুবতীগণ বসন্ত বাতাসে॥
কত না ভুগিব আমি নিজ কর্ম্মফল।
মাটিয়া পাথর বিনা না আছে সম্বল॥
শুন মোর বাণী রামা, শুন মোর বাণী।
কোন সুখে মোর সনে হইবে ব্যাধিনী॥

মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥
অনলসমান পোড়ে চইতের খরা।
চালু সেরে বাঁধা দিনু মাটিয়া পাথরা॥
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান॥

ফুল্লরার কথা শুনি কহেন পার্ব্বতী।
আজি হৈতে দূর হৈল সকল দুর্গতি॥
আজি হৈতে মোর ধনে আছে তোর অংশ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গাহে গান ভৃগুবংশ॥

—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

বীরবাহুর পতনে

সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি, অমৃতভাষিণি!
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলা-বিলাসী নাশি ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি। যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন-কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি।
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। ঊর তবে ঊর, দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত: ঊরি দাসে দেহ পদচ্ছায়া।

তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ, নতভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত,
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস সরসে
সরস কমলকুল বিকসিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা, যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা ঝলসি নয়নে।
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়, মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা,
হর-কোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধররূপে।
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ-মুরতি,
পাণ্ডব-শিবিরদ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধ বহি,

অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী লহরী, মরি! মনোহর, যথা
বাঁশরী-স্বরলহরী গোকুল-বিপিনে!
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা,
স্বহস্তে গড়িলা তুমি, তুষিতে পৌরবে?

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে। ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। করযোড় করি
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্বকলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
একমাত্র বাঁচে বীর; যে কাল-তরঙ্গ,
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।

এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগৎ, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে। কতক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ:
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা
রে দূত! অমর-বৃন্দ যার ভুজবলে

কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল-সমরে!
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলিশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায় শূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল-পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে তোর দুঃখে দুঃখী
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায়, ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুম-দাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;

তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?
কার রে করিতে বাস বাসনা আঁধারে ?"

এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ, হায় রে, মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয় পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।

তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে ;—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে।
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে ;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"

উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি ;—
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ ! জানি হে আমি, এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল বিকল-হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,

যবে কুসুমধন লয় কেহ হরি।
এতেক কহিয়া রাজা দূত পানে চাহি,
আদেশিলা, — কহ দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?"

প্রণমি রাজেন্দ্র-পদে করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত;—"হায়, লঙ্কাপতি!
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীর-কুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে।
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে,
সিংহনাদে, জলধির কল্লোলে; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে!
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর।
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহুসহ
রণে, যূথনাথসহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে; বিদ্যুৎঝলাসম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে
শনশনে! ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কতক্ষণ পরে

প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব;
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,—" এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্ব্বদুঃখ। সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরী-মনোহর ;—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ ?"

"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত ;—"কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি!
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি ?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীমদন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে, চৌদিকে এবে সমরতরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ুসহ
নির্ঘোষে। ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশিরবে!—
আর কি কহিব, দেব ? পূর্ব্বজন্ম-দোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি। হায়, রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে ?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈম লঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহুসহ
রণভূমে, কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ নৃপমণি,
রিপু প্রহরণে, পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"

এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা;—"সাবাসি দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী
কভু কি অলসভাবে নিবসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী! চল, সবে,
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্‌জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চল দেখি জুড়াই নয়নে।"

—মধুসূদন দত্ত

ঐকতান

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—
এই সুরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক
রয়ে গেছে ফাঁক।
কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা-একতান
কত না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।
দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়,
আমার অন্তরে বারবার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।
দক্ষিণ মেরুর ঊর্দ্ধে যে অজ্ঞাত তারা
মহাজনশূন্যতায় রাত্রি তার করিতেছে সারা,
সে আমার অর্দ্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব্ব আলোকে।
সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর
মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্বর।
প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানাদিক হতে—
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ;
গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ—
নিখিলের সংগীতের স্বাদ।।

সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্ব্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,

বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল ;—
বহুদূর-প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্ম্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্ব্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হ'লে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্ব্বত্রগামী।।

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্ম্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা ক'রেছে অর্জ্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি' কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারিনি দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।।
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজদুরি।
এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্ব্বাক মনের
মর্ম্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।

প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাওতো উদ্ধারি'।

সাহিত্যের ঐকতান-সংগীত-সভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি ;—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বারাণসী

যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল—'দেখা যায় বারাণসী!'
চমকি চাহিনু, স্বর্গ-সুষমা মর্ত্যে প'ড়েছে খসি'।
এ পারে সবুজ বজরার ক্ষেত, ও পারে পুণ্য-পুরী,
দেবের চৌপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ-ঝুরি;
শারদ দিনের কনক আলোকে কিবা ছবি ঝলমল,—
অদ্ভুত যুগের পূজা-উপচার,—হেম চম্পকদল।

আধ-চাঁদখানি রচনা করিয়া গঙ্গা রয়েছে মাঝে,
স্নেহ-সুশীতল হাওয়াটি লাগায় তপ্ত-দিনের কাজে।
জয়! জয়! বারাণসী!
হিন্দুর হৃদি-গগনের তুমি চির-উজ্জ্বল শশী।

অগ্নিহোত্রী মিলেছে হেথায় ব্রহ্মবিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে।
এই সেই কাশী ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিল এইখানে,
খ্যাত যাঁর নাম শাক্যমুনির জাতকে, গাথায়, গানে,—
যাঁর রাজত্ব সময়ে বুদ্ধ জন্মিলা বার বার;
ন্যায়-ধর্ম্মের মর্যাদা প্রেমে করিতে সম্প্রচার।
এই সেই কাশী—ভারতবাসীর হৃদয়ের রাজধানী,
এই বারাণসী জাগ্রত চোখে স্বপন মিলায় আনি'!

এই পথ দিয়া ভীষ্ম গেছেন ভারত-ধুরন্ধর—
কাশী-নরেশের কন্যারা যবে হইল স্বয়ংবর।
সত্য পালিতে হরিশ্চন্দ্র এই কাশীধামে, হায়,
পুত্র-জায়ায় বিক্রয় করি' বিকাইলা আপনায়।
দুর্দ্ধর্ষ মহর্ষি বিশ্বামিত্র সাধনায় করি' জয়
হেথা লভিলেন তিনটি বিদ্যা—সৃষ্টি, পালন, লয়,
বিদ্যায় যিনি জ্যোতির পন্থ করিলেন সমাহার;—
নূতন স্বর্গ করিলেন যিনি আপনি আবিষ্কার।

শুদ্ধোদনের স্নেহের দুলাল তাজিয়া সিংহাসন
করুণা-ধর্ম্ম হেথায় প্রথম করিলা প্রবর্ত্তন।
এই বারাণসী কোশল-দেবীর বিবাহের যৌতুক,—
দেখিতেছি যেন বিম্বিসারের বিস্মিত স্মিত-মুখ!

নৃপতি অশোকে দেখিতেছি চোখে বিহারের পৈঠায়,
শ্রমণগণের আশীর্বচনে প্রাণ মন উথলায়।
সমুখে হাজার স্থপতি মিলিয়া গড়িছে বিরাট স্তূপ,
শত ভাস্কর রচে বুদ্ধের শত জনমের রূপ।
চিক্কণ চারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী
ধর্ম্মাশোকের মৈত্রী-করুণ অনুশাসনের লিপি!
মহাচীন হ'তে ভক্ত এসেছে মৃগদাব-সারনাথে,
স্তূপের গাত্র চিত্র করিছে সূক্ষ্ম সোণার পাতে।
জয়! জয়! জয় কাশী!
তুমি এসিয়ার হৃদয়-কেন্দ্র,—মর্ত্তে ভকতিরাশি!

এই কাশীধামে ভক্ত তুলসী লিখেছেন রামকথা,—
ভকতি যাঁহার অপ্রমত্ত প্রভুপদে সংযতা।
এই কাশীধামে জোলাদের ছেলে কবীর রচিল গান,
যাঁহার দোঁহায় মিলেছিল দুহু হিন্দু মুসলমান।
এই কাশীধামে বাঙ্গালীর রাজা মরেছে প্রতাপ রায়,
যাঁর সাধনায় নবীন জীবন জেগেছিল বাংলায়।
মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই—শুধু শিব!
মনে লয় মোর হেথা একদিন মিলিবে নিখিল জীব,
আত্মার সাথে হ'বে আত্মার নবীন আত্মীয়তা,
মিলনধর্ম্মী মানুষ মিলিবে; নহে এ স্বপ্নকথা।
জয় কাশী! জয়! জয়!
সারা জগতের ভকতি-কেন্দ্র হবে তুমি নিশ্চয়!

স্ফটিক-শিলার বিপুল-বিলাস-মাত্র নহ তো তুমি
আমি জানি তুমি আনন্দধাম হ'য়ে আছ মরুভূমি;
আমি জানি তুমি ঢাকিয়াছ হাসি ভ্রূকুটির মসীলেপে,
অমৃত-পাত্র লুকায়ে রেখেছ সময় হয়নি ভেবে:
তৃষিত জগৎ খুঁজিতেছে পথ, ডেকে লও, বারাণসি!
পথিকের প্রীতে প্রদীপ জ্বালিয়া কেন আছ দূরে বসি,

মধু-বিদ্যায় বিশ্ব-মানব দীক্ষিত কর আজ,
ঘুচাও বিরোধ, দম্ভ ও ক্রোধ, ক্ষতি, ক্ষোভ, ভয়, লাজ।
সার্থক হ'ক সকল মানব, জয়ী হ'ক ভালবাসা,
সংস্কারের পাষাণ-গুহার পড়ুক কর্মনাশা।

ব্যাসের প্রয়াস ব্যর্থ সে কভু হবেনাকো একেবারে,
সবারেই দিতে হবে গো মুকতি এ বিপুল সংসারে।
তুমি কি কখনো করিতে পার গো শুচি-অশুচির ভেদ?
তুমি যে জেনেছ চরাচর-ব্যাপী চিরন্তনের বেদ।
স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম অবধি অভেদ বলেছ তুমি,—
ভেদের গণ্ডী তুমি রাখিয়ো না, অয়ি বারাণসী-ভূমি!
ঘোষণা করেছ আশ্রয়ে তব ক্ষুধিত রবে না কেহ,—
প্রাণের অন্ন দিবে না কি হায়? কেবলি পুষিবে দেহ?

দাও সুধা দাও, পরাণের ক্ষুধা চিরনিবৃত্ত হোক্,
বিশ্বনাথের আকাশের তলে মিলুক সকল লোক।
অখিল জনের হৃদয়ে রাজ্য কর তুমি বিস্তার,
সকল নদীর সকল হৃদির হও তুমি পারাবার।
পর যে মন্ত্রে আপনার হয় সে মন্ত্র তুমি জানো,
বিমুখ বিরূপ জগত-জনেরে মুগ্ধ করিয়া আনো।
বিচিত্র মালা কর বিরচন নানা বরণের ফুলে,
অবিরোধে লোক সার্থক হোক্ পাশাপাশি মিলেজুলে
দূর ভবিষ্য নিখিল বিশ্ব যে ধনের আশা করে—
তুমি বিতরিয়া দাও সে অমৃত জগত-জনের করে।
জয়! বারাণসী জয়!
অভেদ-মন্ত্রে জয় কর তুমি জগতের সংশয়।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ইন্দ্রপতন

তখনো অস্ত যায়নি সূর্য্য, সহসা হইল শুরু
অম্বরে ঘন ডম্বরু-ধ্বনি গুরু গুরু গুরু গুরু!
আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন্ ইন্দ্রের আগমনী?
শুনি, অম্বুদ-কম্বু-নিনাদে ঘন বৃংহিত ধ্বনি।
বাজে চিক্কুর-হ্রেষা-হর্ষণ মেঘ-মন্দুরা-মাঝে,
সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলয়ঙ্কর সাজে!

ঘনায় অশ্রু-বাষ্প-কুহেলি ঈশান-দিগঙ্গনে
স্তব্ধ বেদনা দিগ্-বালিকারা কি যেন কাঁদনি শোনে!
কাঁদিছে ধরায় তরু, লতা, পাতা, কাঁদিতেছে পশু-পাখী,
ধরার ইন্দ্র স্বর্গে চ'লেছে ধূলির মহিমা মাখি'!

বাজে আনন্দ-মৃদং গগনে, তড়িৎ-কুমারী নাচে,
মর্ত্ত্য-ইন্দ্র বসিবে গো আজ স্বর্গ-ইন্দ্র-কাছে!
সপ্ত-আকাশ সপ্তস্বরা হানে ঘন করতালি,
কাঁদিছে ধরায় তাহারি প্রতিধ্বনি—খালি, সব খালি।

হায় অসহায় সর্ব্বংসহা মৌনা ধরণী মাতা,
শুধু দেব-পূজা তরে কি মা তোর পুষ্প, হরিৎ-পাতা?
তোর বুকে কি মা চির-অতৃপ্ত র'বে সন্তান-ক্ষুধা?
তোমার মাটির পাত্রে কি গো মা ধরে না অমৃত-সুধা?

জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে-কেহ আনিবে অমৃত-বারি
অমৃত-অধিপ দেবতার রোষ পড়িবে কি শিরে তারি?
হয়ত তাহাই, হয়ত নহে ত—এটুকু জেনেছি খাঁটি,
তারে স্বর্গের আছে প্রয়োজন যারে ভালোবাসে মাটি!

কাঁটার মৃণালে উঠেছিল ফুটে যে চিত্ত-শতদল,
শোভেছিল যাহে বাণী-কমলার রক্ত-চরণ-তল,
সম্ভ্রমে নত পূজারী মৃত্যু ছিঁড়িল সে শতদলে—
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অর্পিবে বলি' নারায়ণ-পদতলে!

জানি জানি মোরা, শঙ্খ চক্র-গদা যার হাতে শোভে—
পায়ের পদ্ম হাতে উঠে তাঁর অমর হইয়া র'বে।
কত সান্ত্বনা আশা-মরীচিকা কত বিশ্বাস-দিশা
শোক-সাহারায় দেখা দেয় আসি', মেটে না প্রাণের তৃষা!

আজ শুধু জাগে তব অপরূপ সৃষ্টি-কাহিনী মনে,
তুমি দেখা দিলে অমিয়-কণ্ঠ বাণী'র কমল-বনে!
কখন্ তোমার বীণা ছেয়ে গেল সোনার পদ্ম-দলে,
হেরিনু সহসা ত্যাগের তপন তোমার ললাট-তলে!

লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বাণী,
শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি কণ্ঠে গরল দানি',
বিষ্ণু দিলেন ভাঙ্গনের গদা, যশোদা-দুলাল বাঁশী,
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর, মৃগাঙ্ক দিল হাসি।

চীর গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারত-জননী কাঁদি'
প্রতাপ শিবাজী দানিল মন্ত্র, দিল উষ্ণীষ বাঁধি'!
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারা দিল মন্দার-মালা, মানব মাখা'ল ধূলি।

নিখিল-চিত্তরঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি'—
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী'
হিমালয় হ'তে বিপুল বিরাট, উদার আকাশ হ'তে,
বাধা-কুঞ্জর তৃণসম ভেসে গেল তব প্রাণস্রোতে!

ছন্দোগানের অতীত হে ঋষি, জীবনে পারিনি তাই
বন্দিতে তোমা', আজ আনিয়াছি চিত্ত-চিতার ছাই—
বিভূতিতিলক! কৈলাস হ'তে ফিরেছ গরল পিয়া,
এনেছি অর্ঘ্য শ্মশানের কবি ভস্মবিভূতি নিয়া!

নাও অঞ্জলি, অঞ্জলি নাও, আজ আনিয়াছি গীতি
সারা জীবনের না-কওয়া-কথার ক্রন্দন-নীরে তিতি'!
এত ভালো মোরে বেসেছিলে তুমি, দাওনিক অবসর
তোমারেও ভালোবাসিবার, আজ তাই কাঁদে অন্তর!

তোমারে দেখিয়া কাহারও হৃদয়ে জাগেনিক সন্দেহ—
হিন্দু কিংবা মুসলিম তুমি অথবা অন্য কেহ।
তুমি আর্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি,
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি!

হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজিব,
যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শিব!
নিন্দা গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া, পাগল, মিলন-হেতু
হিন্দু-মুসলমানের পরাণে তুমিই বাঁধিলে সেতু!

জানি না আজিকে কি অর্ঘ্য দেবে হিন্দু মুসলমান,
ঈর্ষা-পঙ্কে পঙ্কজ হ'য়ে ফুটুক এদের প্রাণ!
হে অরিন্দম, মৃত্যুর তীরে ক'রেছ শত্রু জয়,
প্রেমিক! তোমার মৃত্যুশ্মশান আজিকে মিত্রময়।

তাই দেখি, যারা জীবনে তোমায় দিল কণ্টক-হুল,
আজ তাহারাই এনেছে অর্ঘ্য নয়ন-পাতার ফুল!
কে যে ছিলে তুমি জানিনাক কেহ দেবতা কি আউলিয়া,
শুধু এই জানি, হেরে আর কারে ভরেনি এমন হিয়া।

* * *

অসুর-নাশিনী জগন্মাতার অকাল উদ্বোধনে
আঁখি উপাড়িতে গেছিলেন রাম, আজিকে পড়িছে মনে,
রাজর্ষি! আজ জীবন উপাড়ি দিলে অঞ্জলি তুমি,
দনুজ-দলনী জাগে কিনা আছে চাহিয়া ভারতভূমি।

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

গৌরচন্দ্রিকা

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব।।
কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম- কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর।।
চঞ্চল চরণ- কমল-তলে ঝংকরু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত অগোর।।
অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরণে
অখিল-মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর।।

গোবিন্দদাস

দীপ-শিখা

তপন যখন অস্ত-মগন ভুবন-ভ্রমণ-শেষে,
আমি তপনের স্বপন দেখি গো, পান্থক-বধূর বেশে।
সারা দেহে মোর জ্বালিয়া অনল,
এলাইয়া দিই ধূম-কুন্তল,
কালো-অঞ্চল ছায়া হ'য়ে লোটে চরণের তলদেশে,
মোর দেহময় দাহনের জয় তপনের উদ্দেশে।

মাটির বাটিতে স্নেহরস শুষি', বৃন্ত সে বর্ত্তিকা
ফুটায় হরষে তিমির-তোষিণী চম্পা-রূপিণী শিখা;
বৃন্ত বাহিয়া যত স্নেহরস
যোগায় আমার জ্বালার হরষ—
আমি তৃষিতের প্রাণের নিশীথে বাসনা-বাসন্তিকা!
ধূম নয়, সে যে অলি-লাঞ্ছন কাঞ্চন-মল্লিকা!

আলোকের লাগি' আঁধার প্রাচীরে নিশা মরে মাথা কুটে
আমি সে ললাটে রক্তের ফোঁটা দিকে দিকে উঠি ফুটে।
কালোর অঙ্গে আলোকের ক্ষত—
সারারাত জাগি নিমেষ-নিহত,
জাগর-রক্ত আঁখির কাজল অশ্রুতে নাহি টুটে,
যত সে জ্বলুক, কালিটুকু থাকে লাগিয়া অক্ষিপুটে!

* * *

দিক্-অঙ্গনা গগনাঙ্গনে ফুল্কির ফুল গাঁথে—
অবোধ বনানী তাই হেরি' পরে জোনাকির হার মাথে!
মিছা মায়া সেই আলোর কণিকা,
মিছা হাসি হাসে আঁধার-গণিকা—
রক্ত-বিহীন পাণ্ডুর ভাতি, তাপ নাই তার সাথে,
বিদ্রূপ করে সখের দীপালি সুপ্ত দিবস-নাথে!

আমি যামিনীর নীল অঞ্চলে আগুনের ফুল বুনি,
আমি আঁধারের বুকের বাখারে হৃৎ-স্পন্দন শুনি!
দিবা পুড়ে' মরে স্বামীর চিতায়—
আমি ছিনু তার সিঁদুর সিঁথায়,
জ্বলে' উঠে শুনি ভর সন্ধ্যার ঝিল্লির ঝুনঝুনি,
আমি সারারাত কাল-রাত্রির আয়ুর প্রহর গুণি!

আমি দীপ-শিখা—আলোক-বালিকা—বসি যবে বাতায়নে,
দূর প্রান্তরে আলেয়া-ডাকিনী মিলায় আঁধার সনে;
নিশার দুলাল প্রেত-কবন্ধ
নৃত্য অর্গল করে যে বন্ধ।
উন্মত্ত-পাখা পিপীলিকা মরে রূপশিখা চুম্বনে!
আমি বহ্নির তন্বী কুমারী তপনেরে জপি মনে।

আমি নিয়ে যাই অধীরা বধূরে অচেনার অভিসারে,
দেব-আয়তনে আরতি করি গো প্রেমহীন দেবতারে।
আমি কালো চোখে পরাই কাজল,
বাসর-নিশাটি করি যে উজল,
আমি চেয়ে থাকি অনিমিখ আঁখি মরণ শয়নাগারে;
প্রলয় ঘটাই, তবু নিবে যাই মলয়ের ফুৎকারে।

—মোহিতলাল মজুমদার

নব নিদাঘ

অঙ্গে আমার লেগেছে রে আজ নব নিদাঘের ঘোর।
ওরে মন, আর সাঙ্গ করিয়া সকল কর্ম্ম তোর!
বিছায়ে নে মোর শিথিল শরীর শুধু আঁচলের প্রায়:
চেয়ে থাক্ দূরে, অর্দ্ধ শয়নে আধখোলা জানলায়।

দুপুর বেলায় রূপালি রৌদ্রে ফুলদল পড়ে নুয়ে,
মৌমাছিগুলি গুঞ্জন তুলি' উড়ে যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে:
ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘেরিয়া গুমট করিয়া আছে,
অমনি গান কি গন্ধের মতো ঘুরে বেড়া মোর কাছে!

দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র ঝিঁঝির পাখার মত,
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি' কে হাপরে ফুঁ দিতেছে অবিরত?
দিকে দিকে দিকে, জানি না কি পাখী হাতুড়ি ঠুকিছে ডালে,
কোন্ রূপসীর স্বপ্ন-মেখলা গড়িছে বিশ্বশালে?

কালো দীঘিজলে গাহন করিতে নেমেছে গাছের ছায়া,
নিদ্রিত মাঠে নির্জ্জন ঘাটে জাগিছে এ কার মায়া?
মরীচিকা চাহি' শ্রান্ত পথিক ফুকারে ফটিক জল,
অঙ্গে আলস আসে জড়াইয়া ছাড়ে না অশথতল।

আজিকে বিশ্ব কি মধুমধুর মদির নেশায় ভোর!
মাথায় তাহার ঘুরিছে হাজার ঘূর্ণি হাওয়ার ঘোর।
বাসনা তাহার মরীচিকা হয়ে আঁকা পড়ে দূর পটে:
কল্পনা তার গুন গুন ক'রে অলিগুঞ্জনে রটে।

শীতল শিলায় শ্রান্তি বিছায়ে শিথিল অঙ্গ রেখে,
নিমীল নয়নে মলিন বিরহ মিলনস্বপন দেখে।
সুদূর অতীত কাছে আসে আজ গোপন সেতু বাহি'।
অদেখা অগম দাঁড়ায়েছে যেন মোর মুখপানে চাহি'!

এসেছে তাহারা দিগন্ত-হারা সাহারা-প্রান্ত হ'তে,
এসেছে রে কারা কোন্ বসোরার খর্জ্জুরবীথিপথে,
কত বেদুয়ীন্ পার ক'রে মরু দীপ্ত অগ্নিঢালা,
নামায় আমার হৃদয়ের হাটে তরুণী ইরাণী বালা!

মর্ম্মরে গাঁথা মর্ম্মবেদীতে, কে পাতি' পদ্মপাতা,
পয়গেখার লিখিতে অঙ্গ ঘুমে ঢুলে' পড়ে মাথা!
আঁখি মুদে একা প'ড়ে আছি এই সুখস্মৃতিঘেরা নীড়ে,
প্রাণ ভ'রে যায় চেনা অচেনার মিলনমধুর ভিড়ে'

বেলা প'ড়ে আসে, বধূ চলে ঘাটে ভরিতে সাঁজের জল,
পথপাশে তরু গায়ে তুলে নিল চ্যুত ছায়া-অঞ্চল'
স্বপ্নান্তরে নিয়ে চলে মোরে নিদাঘনিশীথ ঘোর
ওরে মন আয়, ছিঁড়ে ফেলে আয় সকল কর্ম্ম-ডোর।

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বিড়াল

(শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর উক্তি)

আমি শয়নগৃহে চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা-হাতে ঝিমাইতে ছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে দেওয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এ জন্য হুঁকা-হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না? এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল 'মেও'।

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট আফিঙ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে পাষাণবৎ কঠিন হইয়া বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, 'মেও'।

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে, একটি ক্ষুদ্র মার্জ্জার। প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই; এক্ষণে মার্জ্জার-সুন্দরী নির্জ্জল দুগ্ধ-পানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, 'মেও'। বলিতে পারি না, বুঝি তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল সেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে 'মেও' শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায়

করিয়াছিল! বুঝি বিড়ালের মনের ভাব—'তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি, এখন বল কি?' বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না, দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই, সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে বিড়াল দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গারস্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতর চিত্তে হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত। সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না, কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া একটু সরিয়া বসিল। বলিল, 'মেও'। প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারীর বক্তব্য সকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি মৎস্য মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে, আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটা বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহৃত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভাগী—আমি চুরিই করি আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্ম-সঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ।

অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ-ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী।

"দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত নর্দ্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে? হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখনও অন্ধকে মুষ্টিভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না। সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোট-লোকের দুঃখে কাতর? ছি! কে হইবে?

"দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড় হাত করিয়া বলিতে, 'আর একটু কি আনিয়া দিব?' তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি বড় পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তাহাতো নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর ছি! ছি!

"দেখ, আমাদের দশা দেখ। দেখ, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদের মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের

সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহ মার্জার হইয়া মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি।

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, মেও! মেও! খাইতে পাই না। আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস্য-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি লইল, তবে সে তাহার খাওয়ার পর যাহা বাঁচিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম! মার্জার-পণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক, সমাজ-বিশৃঙ্খলার মূল। যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধন সঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধন-সঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজে ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জারী বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের ক্ষতি কি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।

বিড়াল রাগ করিয়া বলিল, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বিড়ালকে বুঝানো দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্‌কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব

ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন; অতএব চোরের দণ্ড-বিধান কর্ত্তব্য।"

মার্জ্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে কাহারও ভাণ্ডার-ঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারীকে বলিলাম, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। মন হইতে এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর। প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে। জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষাভর আফিঙ দিব।"

মার্জ্জার বলিল, "আফিঙের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জ্জার বিদায় হইল।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র

যেকালে বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলাদেশের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।

সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল। এবং ক্ষুদ্র যে-লেখক-সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত, তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

আবার এখনকার যে নূতন পাঠক- ও লেখক-সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্যভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু বর্তমান লেখকের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় তখন সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোরূপ পূর্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই এবং বর্তমান কালের নূতন ভাবপ্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত ও অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গসাহিত্যেরও যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।

পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা একমুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা— কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম

ধীর মন্দ্রে। 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।' এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাতকলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম; সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিয়াছিলাম সেই জন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। মনে হয় সেদিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল তদনুরূপ ফললাভ করিতে পারি নাই। সে জীবনের বেগ আর নাই। কিন্তু এ নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কখনো স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব আনন্দে নবীন আশার স্মৃতির সহিত বর্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে-রাগিণীতে বংশীধ্বনি হয় সে রাগিণী চিরদিনের নহে। সেদিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্তব্য, মিশ্রিত দুঃখসুখ, ক্ষুদ্র বাধাবিঘ্ন, আবর্তিত বিরহমিলন—তাহার পর হইতে গভীর গম্ভীরভাবে নানাপথ বাহিয়া নানা শোকতাপ অতিক্রম করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিদিন আর সে নহবত থাকিবে না। তথাপি সেই একদিনের উৎসবের স্মৃতি কঠোর কর্তব্যপথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যেদিন নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন সেইদিনের সর্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ উৎসব আমাদের মনে আছে। সেদিন আর নাই। আজ নানা লেখা নানা মত নানা আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ কোনোদিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে, কোনোদিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এইরূপই হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল সে কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণকর্তা বলিয়া আমরা জানি না। কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা,

কী সমাজ, কী ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক। যখন নব্যশিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃতপ্রায় বেদপুরাণতন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ অদ্য এই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না।

রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে, এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।

মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙালীর যে কী মহৎ কী চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে-কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা আর দুর্ভাগ্য কিছুই নাই। তৎপূর্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরেজি পণ্ডিতেরা বর্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলাভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা যাইতে পারে সে-কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এইজন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকের জন্য অনুগ্রহপূর্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠ্যযোগ্যতা সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এন্ট্রেন্স-পাঠ্য বাংলাগ্রন্থ দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সংকুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তখনকার কালে কী যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরাজিতে দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরাজি সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালির মতো বালির বাঁধ নির্মাণ করিতেছিলেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কী হইতে পারে? সম্পূর্ণ ক্ষমতা সত্ত্বেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাঁহাদের নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া একটি অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা উদ্যম ক্ষমতাকে প্রেরণ করা কত বিশ্বাস এবং কত সাহসের বলে হয় তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির সব কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্বে সেই অনাদর মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

তখন, পূর্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন তাঁহারা বঙ্গভাষার যৌবনসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমতঃ, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা হইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোন আদর্শ নাই, সেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, সেখানে আপন

ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তর্বাসী উন্নত আদর্শকে সর্বদা সম্মুখে বর্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতি-লাভের প্রলোভন সংবরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম। চতুর্দিক্‌ব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মতো এমন গুরুভার আর কিছু নাই; তাহার নিয়তপ্রবল ভারাকর্ষণশক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম তাহা এখনকার সাহিত্যব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন। তখন যে আরো কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভাবলে যে-কার্য করিলেন তাহা অত্যাশ্চর্য। বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদবর্গের কত ঊর্ধ্বে সমুত্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে। একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব অভ্যাসবশতঃ সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরো কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোকে যে একলম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখনো দাঁড়াইয়া

যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিমচন্দ্র একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানের যে ফল তাহাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচকপদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। এবং কল্পনাপ্রবণ লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোটো ছোটো দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন বর্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এইজন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোনোদিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব করিতে হয় নাই।

নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। এই প্রগল্ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক কখনো সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীর ভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্বপ্রথম হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য

এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল সুসংগতি নহে, সুরুচি এবং শিষ্টতার সীমা নির্ণয় করিতেও একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তির আবশ্যক। মাঝে মাঝে অনেক বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে সেই বোধশক্তির অভাব দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভায় বল এবং সৌকুমার্যের একটি সুন্দর সংমিশ্রণ ছিল। নারীজাতির প্রতি যথার্থ বীর-পুরুষের মনে যেরূপ একটি সসম্ভ্রম সম্মানের ভাব থাকে তেমনই সুরুচি এবং শীলতার প্রতি বঙ্কিমের বলিষ্ঠ বুদ্ধির একটি ভদ্রোচিত বীরোচিত প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্কিমের রচনা তাহার সাক্ষ্য। বর্তমান লেখক যেদিন প্রথম বঙ্কিমকে দেখিয়াছিল, সেদিন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচিপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়ুনিয়ন নামক মিলনসভা বসিয়াছিল। ঠিক কতদিনের কথা ভালো স্মরণ নাই কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারও পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনোরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেকবার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমলহাস্যে

অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম দর্শনে সেই যে তাঁহার মুখে উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগমূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সংকুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন।

বঙ্কিমের সেই সসংকোচ পলায়নদৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রিত হইয়া আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে-সময়কার সাহিত্য অন্য যে-কোনোপ্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক, ঠিক সুরুচিশিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে-সময়কার অসংযত বাক্‌-যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা যে কী আশ্চর্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতার প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোনোকালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম-সংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়সঙ্গিনী

বঙ্গভাষা আজ বঙ্কিমের জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এই শোকোচ্ছ্বাসের অতীত শান্তিধামে দুষ্কর জীবনযজ্ঞের অবসানে নির্বিকার নিরাময় বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে একটি কোমল প্রসন্নতা, একটি সর্বদুঃখতাপহীন গভীর প্রশান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—যেন জীবনের মধ্যাহ্নরৌদ্রদগ্ধ কঠিন সংসারতল হইতে মৃত্যু তাঁহাকে স্নেহসুশীতল জননীক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছে। আজ আমাদের বিলাপ পরিতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমাদের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিবার জন্য সেই প্রতিভাজ্যোতির্ময় সৌম্য প্রসন্নমূর্তি এখানে উপস্থিত নাই। আমাদের এই শোক এই ভক্তি কেবল আমাদেরই কল্যাণের জন্য। বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এই শোকে এই ভক্তিতে সেই আদর্শ-প্রতিমা আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল এবং স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রস্তরের মূর্তিস্থাপনের অর্থ এবং সামর্থ্য আমাদের যদি না থাকে, তবে একবার তাঁহার মহত্ত্ব সর্বতোভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমাদের বঙ্গহৃদয়ের স্মরণস্তম্ভে স্থায়ী করিয়া রাখি। রাজনৈতিক সমাজনৈতিক মতামত সহস্রবার পরিবর্তিত হইতে পারে, যে-সকল ঘটনা যে-সকল অনুষ্ঠান আজ সর্বপ্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার উন্মাদনার কোলাহলে সমাজের খ্যাতিহীন শব্দহীন কর্তব্যগুলিকে নগণ্য বলিয়া ধারণা হইতেছে, কাল তাহার স্মৃতিমাত্র চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে না পারে কিন্তু যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদিগের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের মধ্যে চিরসৌন্দর্যের অক্ষয় আকর উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যাহা কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা-কিছু অমর করিবে, সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার পোষণ করিবার প্রকাশ করিবার এবং সর্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।

রচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে আজ আমাদিগের নিকট যাহা প্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা রুচি এবং অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের উত্তর-পুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম

বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতঃস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন,—ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ-কথা কোনো বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাংলা লেখকদিগের গুরু, বাংলা পাঠকদিগের সুহৃদ্, এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিমদিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

অভাগীর স্বর্গ

১

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলে মেয়েদের ছেলে-পুলে হইয়াছে, জামাইরা, প্রতিবেশীর দল, চাকর-বাকর—সে যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধুমধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দুর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার—এ যেন বড় বাড়ীর গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামিগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া অলক্ষ্যে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সাথে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল, সে কাঙালীর মা। সে তাহার কুটীর প্রাঙ্গণের গোটা-কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার আঁচলে বেগুন বাঁধা—সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্রামের একান্তে গরুড় নদীর তীরে শ্মশান। সেখানে পূর্ব্বাহ্ণেই কাঠের ভার, চন্দনের টুকরা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল, কাঙালীর মা ছোটজাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না,

তফাতে একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্য্যাপ্ত চিতার 'পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাঁহার রাঙা পা দুখানি দেখিয়া তাহার দুচক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহু কণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, ভাগ্যমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্ছো—আমাকেও আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও আমিও যেন এম্‌নি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন! সে ত সোজা কথা নয়! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতিনী, দাস, দাসী, পরিজন—সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ—দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্যঃপ্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতা-পাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছেন, মুখ তাঁহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিঁদুরের রেখা, পদতল দুটি আলতায় রাঙানো। ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চোদ্দ-পনেরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস্ মা, ভাত রাঁধবি নে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধবো'খন রে! হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, দ্যাখ্ দ্যাখ্ বাবা বামুনমা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্ছে!

ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, কই? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই ক্ষেপেছিস্! ও ত ধুঁয়া! রাগ করিয়া কহিল, বেলা দুপুর বাজে, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি? এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল লক্ষ্য করিয়া বলিল, বামুনদের গিন্নী মরেছে তুই কেন কেঁদে মরিস্ মা?

কাঙালীর মার এতক্ষণে হুঁস হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এই ভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমন কি, ছেলের অকল্যাণের

আশঙ্কায় মুহূর্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাঁদব কিসের জন্যে রে—চোখে ধোঁ লেগেছে বই ত নয়!

হাঁঃ, ধোঁ লেগেছে বই ত না! তুই কাঁদ্‌তেছিলি।

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালীকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল—শ্মশান-সৎকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।

২

সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলোকেই যেন আমরণ ভ্যাঙচাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট, কিন্তু সেই ছোট্ট কাঙালীজীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর মা হইতে বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ও শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

তাহার সেই কাঙালী বড় হইয়া আজ পনরয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি, যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলি নে মা?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল, না, ক্ষিদে নেই বই কি! কই দেখি তোর হাঁড়ি?

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর একজনের মত ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্নমুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়সের ছেলে সচরাচর এরূপ করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্ন ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গী সাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলা-ধূলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে। এক হাতে গলা জড়াইয়া মুখের উপর মুখ রাখিতেই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া পোড়ানো কি তুই—

মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, ছি বাবা, মড়া পোড়ানো বল্‌তে নেই, পাপ হয়। সতীলক্ষ্মী মাঠাকরুণ রথে ক'রে সগ্যে গেলেন।

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা। রথে চড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যে যায়?

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখনু কাঙালী, বামুনমা রথের ওপরে ব'সে। তেনার রাঙা পা দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখ্‌লে রে!

সবাই দেখ্‌লে?

সব্বাই দেখ্‌লে।

কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই সে শিশুকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই মা যখন বলিতেছে সবাই চোখ মেলিয়া এতবড় ব্যাপার দেখিয়াছে, তখন অবিশ্বাস করিবার আর কিছু নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তা হলে তুইও ত মা সগ্যে যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসিকে বল্‌তেছিল কাঙ্‌লার মা'র মত সতীলক্ষ্মী আর দুলেপাড়ায় কেউ নেই।

কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, ক্যাঁতাটা পেতে দেব মা, শুবি?

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে বালিশটী পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, কাঙালী, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভাল লাগিল, কিন্তু কহিল, জলপানির পয়সা দুটো ত তা হলে দেবে না মা!

না দিক্ গে—আয় তোকে রূপকথা বলি।

আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না, কাঙালী তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল্ তা হলে। রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুর আর সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া—

অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ সকল তাহার পরের কাছে কত দিনের শোনা এবং কত দিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত্ত-কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র—সে এমন উপকথা সুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়—নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—কাঙালীর স্বল্প দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকারে কেবল রুগ্ন মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশানযাত্রার কাহিনী। সেই রথ, সেই রাঙা পা দুটি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া। কেমন করিয়া শোকার্ত্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তারপরে সন্তানের হাতের আগুন! সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালী, সেই ত হরি! তার আকাশজোড়া ধুঁয়ো ত ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই ত সগ্যের রথ! কাঙালীচরণ, বাবা আমার!

কেন মা?

তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুনমার মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো।

কাঙালী অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ—বল্‌তে নেই।

মা সে কথা বোধ করি শুনিতেও পাইল না, তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোটজাত ব'লে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না ক'রতে পারবে না—দুঃখী ব'লে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস্! ছেলের হাতের আগুন—রথকে যে আসতেই হবে।

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস্ নে মা, বলিস্ নে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ্ কাঙালী, তোর বাবাকে একবার ধ'রে আন্‌বি, অম্‌নি যেন পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে আমাকে বিদায় দেন। অম্‌নি পায়ে আল্‌তা, মাথায় সিঁদুর দিয়ে—কিন্তু কে বা দেবে? তুই দিবি, না রে কাঙালী? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব! বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

৩

অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অংক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্তৃতি বেশি নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেম্‌নি সামান্যভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালী গিয়া কাঁদাকাটি করিল, হাতে-পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে একটাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটা চারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত কি আয়োজন; খল, মধু, আদার সত্ত্ব, তুলসীপাতার রস—কাঙালীর মা ছেলের উপর রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না ব'লে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি, বাবা! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভাল হই ত এতেই হব, বাগ্দী-দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না!

দিন দুই-তিন এম্‌নি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে যাহা মুষ্টি-যোগ জানিত, হরিণের শিঙ্‌ঘষা জল, গেঁটে-কড়ি পুড়াইয়া

মধুতে মাড়িয়া চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোব্‌রেজের বড়িতে কিছু হল না বাবা, আর ওদের ওষুধে কাজ হবে? আমি এম্‌নিই ভাল হব।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি ত খেলি নে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এম্‌নি কি কেউ সারে?

আমি এম্‌নি সেরে যাবো। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।

কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফেন ঝাড়িতে, না পারিল ভাল করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না—ভিতরে জল পড়িয়া ধুঁয়া হয়; ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; মায়ের চোখ্ ছল ছল করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণকণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরল-ধারে জল পড়িতে লাগিল।

গ্রামের ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সম্মুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না। সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আন্‌তে পারিস্ বাবা?

কাকে মা?

ওই যে রে—ও গাঁয়ে যে উঠে গেছে—

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল।

কাঙালী বলিল, সে আসবে কেন মা?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বল্‌বি, মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধুলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদা-কাটা করিস্ বাবা, বলিস্, মা যাচ্ছে।

একটু থামিয়া কহিল, ফের্‌বার পথে অম্‌নি নাপ্‌তে বৌদির কাছ থেকে একটু আল্‌তা চেয়ে আনিস ক্যাঙালী, আমার নাম করলেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালবাসে।

ভাল তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিষের কথা এতবার এতরকম করিয়া শুনিয়াছে যে সে সেইখান হইতেই কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিল।

৪

পরদিন রসিক দুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ সংসারের কাজ সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে। কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেছে—পায়ের ধুলো নেবে যে!

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথ-যাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া দিয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধুলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দির পিসি দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধুলো।

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশনবসন দেয় নাই, কোন খোঁজ খবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধুলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রাখালের মা বলিল, এমন সতীলক্ষ্মী বামুন কায়েতের ঘরে না জন্মে' ও আমাদের দুলের ঘরে জন্মালো কেন! এইবার ওর একটু গতি ক'রে দাও বাবা—কাঙ্‌লার হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।

অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া এ কথা যেন তীরের মত বিঁধিল।

সেদিন দিনের-বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটাও কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। কি জানি, এত ছোট-

জাতের জন্যও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়—কিন্তু এটা বুঝা গেল রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

কুটীর প্রাঙ্গণে একটা বেল গাছ ছিল, একটা কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দরওয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কসাইয়া দিল; কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা, একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাট্‌তে লেগেছিস্‌?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ, এ যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ দরওয়ানজী। বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানী দরওয়ান তাহাকেও একটা অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়া ছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকা-হাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভাল হয় নাই, তাহারাই আবার দরওয়ানজীর হাতে পায়ে ধরিতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন। কারণ, অসুখের সময় যে কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালীর মা তাহারই হাতে ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছে।

দরওয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাতমুখ নাড়িয়া জানাইল, এ সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন; গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্তা। লোকগুলা যখন হিন্দুস্থানীটার কাছে ব্যর্থ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারি বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল অতবড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যদি কর্ত্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না। হায় রে অনভিজ্ঞ! বাঙলা দেশের জমিদার ও তাহার কর্ম্মচারীকে সে চিনিত না। সদ্যোমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, অধর রায় সেইমাত্র

সন্ধ্যাহ্নিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কে রে?

আমি কাঙালী। দরওয়ানজী আমার বাবাকে মেরেছে।

বেশ করেচে। হারামজাদা খাজনা দেয় নি বুঝি?

কাঙালী কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাটতেছিল—আমার মা মরেচে—, বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।

সকাল-বেলা এই কান্না-কাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল না কি। ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস্ রে, এখানে একটু গোবরজল ছড়িয়ে দে! কি জাতের ছেলে তুই?

কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।

অধর কহিলেন, দুলে! দুলের মড়ায় কাঠ কি হবে শুনি?

কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে! তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে, সক্কলে শুনেছে যে। মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ মুহূর্ত্তে স্মরণ হওয়ায় কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্ গে। পারবি?

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যের জন্য তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়—পাজি, হতভাগা, নচ্ছার!

কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের উঠনের গাছ, বাবুমশায়! সে যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ!

হাতে-পোঁতা গাছ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দে ত!

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্ম্মচারীরাই পারে।

কাঙালী ধুলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন সে যে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ, ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না।

গোমস্তার নির্ব্বিকার চিত্তে দাগ পর্য্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকরি তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখ ত হে, এ ব্যাটার খাজনা বাকী পড়েছে কিনা। থাকে ত জাল-টাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয়—হারামজাদা পালাতে পারে।

* * * *

মুখুয্যেবাড়ীতে শ্রাদ্ধের দিন মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকী। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, ঠাকুরমশাই, আমার মা ম'রে গেছে।

তুই কে? কি চাস্ তুই?

আমি কাঙালী। মা ব'লে গেছে তেনাকে আগুন দিতে।

তা দিগে' না।

কাছারির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, ও বোধ হয় একটা গাছ চায়। এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, শোন আবদার। আমারই কত কাঠের দরকার কাল বাদে পরশু কাজ। যা যা, এখানে কিছু হবে না—এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে—যা, মুখে একটু নুড়ো জেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দিগে'।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ছেলে ব্যস্তসমস্ত ভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখ্‌ছেন ভটচাজমশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হ'তে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙালী আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘণ্টা-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ানো হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তারপরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত—শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইংরাজি এপিক্‌শব্দের অনুবাদে মহাকাব্য-শব্দের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ মিলে কি না তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে আমার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে আলংকারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহাকবিগণের চিন্তার কারণ কিছুই রাখেন নাই। কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য এ দেশে চলিত আছে, এবং ঐ সকল মহাকাব্য সম্ভবতঃ অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা চলে কি না, তাহা লইয়া একটা তুমুল সমস্যা গোড়াতেই দাঁড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত এপিক্‌ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে সর্ব্বদা সম্মত হন না। প্রথমতঃ, এ দুই গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলী অত্যন্ত উৎকটরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মহাকাব্য বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি আখ্যা দিলে, বোধ করি, এই দুই গ্রন্থের মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উহাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়।

বস্তুতই মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়। কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জ্জুনীয় যে অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য নহে। কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয় যে শ্রেণীর যে পর্য্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর—সে পর্য্যায়ের গ্রন্থ নহে। একের নাম মহাকাব্য দিলে, অন্যকে মহাকাব্য বলা কিছুতেই সঙ্গত হয় না।

রামায়ণ মহাভারতের ঐতিহাসিকত্বে ও ধর্ম্মশাস্ত্রত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান্‌ থাকিয়াও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে উহাতে কাব্যরসও যথেষ্ট পরিমাণে

বিদ্যমান। মহর্ষি বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উঁহারা যাহা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব রহিয়া গিয়াছে, -হয়ত উঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু কবিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

রামায়ণ-মহাভারতে কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই, মহর্ষিদ্বয়কে মহাকবি ও তাঁহাদের কাব্যদ্বয়কে মহাকাব্য না বলিলে চলে না; কেন-না, ভাষাতে আর কোন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা এই কাব্যদ্বয়ের সঙ্গত নামকরণ চলিতে পারে। কুমারসম্ভব-কিরাতার্জ্জুনীয়কে আপাততঃ মহাকাব্যের শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দিয়া আমরা রামায়ণ-মহাভারতকেই মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

মনে হইতেছে মেকলে কোথায় বলিয়াছেন, সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে। সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস করে, অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে পায় না। বলা বাহুল্য, মেকলের অনেক উক্তির মত এই উক্তিটিকেও সুধীজনে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার আস্ফালন-সত্ত্বেও ইউরোপ-খণ্ডে কবিত্বের যেরূপ স্ফূর্ত্তি দেখা গিয়াছে, তাহাই তাহার প্রমাণ। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় মেকলের ঐ উক্তির ভিতর একটু প্রচ্ছন্ন সত্য আছে। সভ্যতা কবিত্বের মস্তক চর্ব্বণ না করিতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যকে বোধ করি সশরীরে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার বলা আবশ্যক, মহাকাব্য-শব্দ আমি আলঙ্কারিক-সম্মত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব ও প্যারাডাইস লষ্টকে আমি এ স্থলে মহাকাব্যের মধ্যে ফেলিতেছি না। রামায়ণ-মহাভারত যে পর্য্যায়ের কাব্য, সেই পর্য্যায়ের কাব্যকেই আমি মহাকাব্য বলিতেছি। পৃথিবীতে কত কবি কত কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য সেই কোন্ কালে রচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর একখানাও রচিত হইল না। পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যে লেখকের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই; কিন্তু সন্দেহ হয়, কেবল হোমারের নামে প্রচলিত গ্রন্থ-দুইখানি ব্যতীত আর কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য দেশে সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত কবিত্বের অবনতি হইয়াছে, এ-কথা কেহই বলিতে পারিবে না। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের নাম মনে রাখিয়াও

অকুতোভয়ে বলা যাইতে পারে, ইউরোপ-মহাদেশেও একবারের বেশী হোমারের জন্ম হয় নাই।

বস্তুতই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার পর কত হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না। কেন এরূপ হইল, তাহার কারণ চিন্তনীয়; কিন্তু সেই কারণ-আবিষ্কারে লেখকের ক্ষমতা নাই। তবে এক একবার মনে হয়, মনুষ্যসমাজের বর্তমান অবস্থা, বোধ করি, আর সেই শ্রেণীর মহাকাব্য-উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে।

রামায়ণ-মহাভারত ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা মনুষ্যসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে সেই সমাজকে আধুনিক হিসাবে সভ্য বলিতে পারা যায় না। মনুষ্যসমাজের সে অবস্থা আবার কখনও ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা জানি না; কিন্তু তাৎকালিক সমাজে যে সকল ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইত, সমাজের বর্তমান অবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। আমরা এমন কল্পনায় আনিতে পারি না যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি কোন ইউরোপের রাজসভায় আতিথ্যস্বীকার করিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মীকে ষ্টীমারে তুলিয়া প্রস্থান করিতেছেন, ও তাহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ ইউরোপের নরপালবর্গ ওয়াশিংটন অবরুদ্ধ করিয়া দশ বৎসরকাল বসিয়া আছেন। ডিলারী বন্দীকৃত লর্ড মেথুয়েন্‌কে গাড়ীর চাকায় বাঁধিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার ধূম্র উপত্যকায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কোন দিনের টেলিগ্রামে দেখিবার কেহ আশা করেন না। সিডান্-ক্ষেত্রে বিস্মার্ক লুই নেপোলিয়ান্‌কে হস্তগত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বুক চিরিয়া নেপোলিয়ান্-বংশের শোণিতের আস্বাদগ্রহণ আবশ্যক বোধ করেন নাই। ত্রেতাযুগ-অবসানের বহুদিন পরে বঙ্গদেশে লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষাও তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তজ্জন্য লাঙ্গুলের ব্যবহার করিতে হয় নাই।

সেকালের এই অসভ্যতা আমাদের চোখে বড়ই বীভৎস ঠেকে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেকালের সামাজিকতার আর একটা দিক্ আছে, একালে সে দিক্‌টাও তেমন দেখিতে পাই না। বার্ক এক সময়ে আপনার মহাপ্রাণতার ঝোঁকে বলিয়াছিলেন, শিভাল্‌রির দিন গত হইয়াছে। শিভালরি-নামক

অনির্ব্বাচ্য বস্তু নগ্ন বর্ব্বরতার সহিত নিরাবরণ মনুষ্যত্বের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সমুৎপন্ন। একালে মানুষ মানুষের রক্তপান করিয়া জিঘাংসার তৃপ্তি করিতে চাহে না বটে, কিন্তু আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কটাক্ষমাত্র শাসনে, পত্নীর অপমান স্বচক্ষে দেখিয়াও, আত্মসংযমে সমর্থ হয় কি না, বলা যায় না। একালের রাজারা মালকোঁচা মারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে অবতীর্ণ হন না সত্য বটে, কিন্তু ভীমরতিগ্রস্ত পিতার একটা কথা রাখিবার জন্য ফিজিদ্বীপে নির্ব্বাসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন কি না, বলিতে পারি না। অশ্বত্থামা ঘোর নিশাকালে সুখসুপ্ত বালকবৃন্দের হত্যাসাধন করিয়া ভীষণ ক্রূরতা দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সভা ডাকিয়া ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া সেই ক্রূরতার সমর্থন তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ-সহায় পাণ্ডবগণ যখন জয়বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া নিশাকালে শত্রুশিবিরে ভীষ্মের নিকট দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভীষ্মকে তাঁহার জীবনটুকু দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের লৌহবর্ম্মের অন্তরালে কারেন্সি নোটের গোছা লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে মনুষ্যসমাজের বাহিরের মূর্ত্তিটা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। মনুষ্যের বাহিরের পরিচ্ছদটা সম্পূর্ণ বদলাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের ভিতরের গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের রাজারাজড়াও, বোধ করি, সময়মত কৌপিনধারী হইয়া সভামধ্যে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না, কিন্তু এখনকার অন্নহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিরূপতা পোশাকের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্ব্বরতা ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোন আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ, কোনরূপ রঙ-ফলানো ছিল না। একালেও ক্রূরতা, বর্ব্বরতা ও পাশবিকতা হয়ত ঠিক তেমনি বর্ত্তমান আছে, তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ স্থাপিত হইয়া তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সম্প্রতি চীনদেশে সভ্য ইউরোপের সম্মিলিত সেনা যে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আটিলা ও জঙ্গিস্ খাঁর প্রেতাত্মার আর লজ্জিত হইবার কোন কারণই নাই।

বস্তুতই চারি হাজার বৎসরের ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র অধিক বদলায় নাই; তবে সমাজের মূর্ত্তিটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং মনুষ্যসমাজের অবস্থা যে-কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেই কাব্যের মূর্ত্তিও যে তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। বিস্ময়ের কারণ থাক্ আর নাই থাক্, আধুনিক কালের সাহিত্যে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের আর আবির্ভাব হয় নাই, এবং আর যে কখনও হইবে তাহা আশা করাও দুষ্কর। সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়া গিয়াছে। কালের যখন অবধি নাই ও পৃথ্বী যখন বিপুলা, তখন বড় কবির ও কাব্যের অসদ্ভাব কখন হইবে না; কিন্তু মনুষ্যসমাজের সেই প্রাচীন অবস্থা ফিরিয়া আসিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে মহাকবির ও মহাকাব্যের, বোধ করি, আবির্ভাব আর হইবে না।

বস্তুতই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা, বোধ করি, আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্ম্মিত কৃত্রিম কারুকার্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্তনির্ম্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।

আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতকে এক একবার ভারতবর্ষের হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পাষাণ-কলেবরের অঙ্কদেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত সহস্র বৎসরকাল অঙ্কে রাখিয়া লালন-পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে। হিমাচলের বিশাল বক্ষোদেশ হইতে বিনিঃসৃত সহস্র উৎস হইতে সহস্র স্রোতস্বিনী অমৃতরসপ্রবাহে ভারতভূমিকে আর্দ্র ও সিক্ত করিয়া 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে, সেইরূপ মহাভারতের মধ্য হইতে সহস্র উপাখ্যান, সহস্র কাহিনী, সহস্র কথা সমগ্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্র ধারা প্রবাহিত করিয়া পুণ্যতর ভাবপ্রবাহে জাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ রাখিয়া

বহুকোটী লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্টি ও কান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ যেমন হিমাচলের ক্রমবিন্যস্ত স্তরপরম্পরা পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে কত বিস্ময়কর জীবের অস্থিকঙ্কাল উদ্ধার করিয়া অতীতের লুপ্তস্মৃতি কালের কুক্ষি হইতে উদ্ঘাটন করেন, সেইরূপ পুরাতত্ত্ববিৎ এই বিশাল গ্রন্থের স্তরপরম্পরা হইতে ভারতীয় জনসমাজের অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত নিদর্শনের চিহ্ন ধরিয়া ইতিহাসের অতীত অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অগ্রদূত—আল্-বেরুনী

বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সভ্যতার মধ্যে সংস্কৃতিগত সমন্বয় মিলন, ঐক্য ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জন্য এক শ্রেণীর সুধীমন্ডলী যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা যে সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইতে পারিতেছে না, তাহার মূলে কারণ সংস্কৃতি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব, এবং ব্যাপারটিকে উদারভাবে দেখিবার ও বুঝিবার মত দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি একই বস্তু। যতগুলি ধর্ম্ম আছে, ততগুলি সংস্কৃতিও আছে। আপন আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাকে লোকে যেমন অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য মনে করে, সংস্কৃতিকেও সেই ভাবে দেখিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে, সংস্কৃতি ধর্ম্ম হইতে আলাদা বস্তু। ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক জগতের বস্তু; কিন্তু সংস্কৃতি পার্থিব জগৎকে লইয়া। মানবীয় আচরণ-পদ্ধতি, শিক্ষাদীক্ষা, মানসিক উন্নতি, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব—এই সবের সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব মনোভঙ্গীই হইতেছে সংস্কৃতি। জাতির সর্ব্ববিধ বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির চরমতম পরিণতি হইতেছে তাহার সংস্কৃতি। এ কথা সত্য যে, ধর্ম্মের আদর্শ সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম একই বস্তু নহে। সেই জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয়-সাধন যতই কঠিন বোধ হউক না কেন, বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়-সাধন কঠিন ত নহেই, বরং যুগে যুগে প্রত্যেক দেশেই তাহা হইয়া আসিতেছে। ইহার জন্য দরকার প্রকৃত জ্ঞান ও উদার মনোভাব।

ভারতবর্ষ ও গ্রীস এই দুইটি অতি প্রাচীন সভ্য দেশ। এই দুইটি দেশের মধ্যে নানা বিষয়ে সংস্কৃতিগত সমন্বয় ও মিলনের চেষ্টা হইয়াছিল, সে প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। পিথাগোরাস হইতে আরম্ভ করিয়া (অথবা তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে) মেগাস্থিনিসের যুগ পর্য্যন্ত কতভাবে আর্য্য ও গ্রীক সভ্যতার মধ্যে আদান প্রদান হইয়া গিয়াছে। সেই ভাবে প্রাক্-ইসলামের যুগ হইতে আরব ও ভারতের মধ্যে নানা বিষয়ে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল। উত্তর ভারতের সুপ্রসিদ্ধ মৌলানা সৈয়দ সোলায়মান্ নদ্‌বীর "আরব ও হিন্দ কি তায়াল্লুকাত্" নামক মূল্যবান্ পুস্তকে তাহার ছুরি ছুরি প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ইস্‌লামের যুগেও বহু মুসলমান ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, রাজ্যবিজয়ের উদ্দেশ্যে নয়, এ দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে। দেশ-বিজয়ের বাসনা তাহার বহু পরে হয়। কিন্তু পৌত্তলিকতার বিরোধী মুসলমানগণ এ দেশের পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখিয়া আর অধিকদূর অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা এ দেশের সংস্কৃতিকে অবহেলা করিতে লাগিলেন। প্রায় তিন শত বৎসর এইরূপ অবহেলার মধ্যে চলিল। তারপর সুলতান মাহ্‌মুদের সময় একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি সেই ছিন্ন তার যোজনা করিয়া আবার মোহন সুরে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইনি মহামনীষী পণ্ডিত আবু রয়হান্ আল্-বেরুনী। যে পথ এত দিন বন্ধ ছিল, মনীষী আল্-বেরুনী তাহা বিশ্বের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। আরব ও ভারতের মধ্যে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের জন্য তিনি সে যুগে যাহা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট চিরঋণী।

যে সব বিদেশী লেখক প্রাচীন ভারতবর্ষসম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে আল্-বেরুনীকে আমরা অতি উচ্চাসন প্রদান করিতে পারি। পৃথিবীর এক প্রান্তে বসিয়া পাঁচ দশখানা বই পড়িয়া অপর দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া তাহাকে নিজের প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল বলিয়া চালাইয়া দিবার দুঃসাহস অনেক লেখকের আছে। কিন্তু আল্-বেরুনী সে ধরণের লেখক ছিলেন না। তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা এ যুগেও দুর্লভ। একাদিক্রমে সাত বৎসর ভারতের ভাষা বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া, এ দেশের জনসাধারণ ও পণ্ডিত শ্রেণীর লোকের সহিত প্রাণখোলাভাবে মিলিয়া-মিশিয়া সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার এই বিরাট্ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ও আরব দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার বিষয় অতি ব্যাপক—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, গণিত, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি। এই সব বিষয় তিনি নিরপেক্ষ দর্শকের মত তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া গ্রন্থ

লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচনার সব চেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত মতামতের আভাস খুবই কম আছে।

আল্-বেরুনীর জীবনবৃত্তান্ত খুব ঘটনাবহুল নহে। অতি সংক্ষেপেই তাহা বর্ণনা করিতেছি। তাঁহার পুরা নাম আবু রয়হান্ মহম্মদ ইব্‌নে আহ্‌মদ্ আল্-বেরুনী। মধ্য এসিয়ার খোওয়ারিজাম্ নামক রাজ্যে ৯৬৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বীয় পল্লীতে তিনি অল্প বয়সে সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও গণিতবিদ্যা শিক্ষা করেন, এবং তথায় কিছু দিন শিক্ষকতা করিতে থাকেন। পরে ১০১৩ খৃঃ অব্দে উক্ত খোওয়ারিজাম্ রাজ্য সুলতান মাহ্‌মুদ অধিকার করেন। সেই সময়ে আল্-বেরুনী স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সুলতান মাহ্‌মুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তাহাতে তিনি সুলতানের কোপে পতিত হন। পরে সুলতান তাঁহাকে বন্দী করিয়া ভারতে প্রেরণ করেন। তিনি বাধ্য হইয়া ভারতে যে ভাবে জীবন-যাপন করিতেছিলেন তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া দুষ্কর। কারণ, তাঁহার লিখিত বিবরণে তিনি অপরের সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছিলেন, নিজের সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই বলেন নাই। ভারতে অবস্থানকালে তাঁহাকে যত্রতত্র যাইতে দেওয়া হইত না। কিন্তু হিন্দু পণ্ডিত ও সাধুদের সহিত মিলিবার ও মিশিবার অনুমতি তিনি পাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর। অবসরসময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখিতে লাগিলেন; এবং কয়েক বৎসর বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তিনি হিন্দু বিজ্ঞান, দর্শন, ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ ও গণিতবিদ্যা শিখিয়া ফেলিলেন; এবং সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দ্বারা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্বন্ধে কয়েকখানা মূল্যবান্ পুস্তক লিখিলেন।

ইতিপূর্ব্বে যে সব মুসলমান লেখক হিন্দুদের ধর্ম্ম, সামাজিক ব্যবস্থা, দর্শন ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, আল্-বেরুনী যে তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁহার রচিত গ্রন্থই সে পরিচয় প্রদান করিবে। তাঁহার "কিতাব আত্ তহকীক আল্ হিন্দ" একখানা বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, উহার সহিত ইস্‌লামিক দর্শন বিশেষতঃ সুফি মতবাদের বিশেষ পার্থক্য নাই; অন্ততঃ মূলগত আদর্শ বিষয়ে। একজন নিরপেক্ষ দর্শকের মত তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখিলেন যে, হিন্দু মানসিকতার অধঃপতনের মূল কারণ উঁহাদের দর্শন বা

শাস্ত্রের মধ্যে নাই। সাধারণের মধ্যে বিদ্যা-চর্চা কমিয়া আসাতে পৌরোহিত্যের প্রভাব বৃদ্ধি পাইল এবং তাহা হইতে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ও স্ফূরণ আর হইল না। তিনি এই উক্তি কেবল হিন্দুদের বেলায় করেন নাই। তাঁহার মতে মুসলিম মানসিকতার অধঃপতনের মূলে কারণ তুর্ক-প্রাধান্য-বৃদ্ধি।

ভারতবর্ষসম্বন্ধে পক্ষপাতহীন সঠিক বিবরণ লিখিবার প্রেরণা তিনি তাঁহার গুরু আবু সোহলের নিকট প্রাপ্ত হন। তিনি আল্-বেরূনীকে বলেন, ভারত-বিষয়ক এমন গ্রন্থ লিখিতে হইবে যাহাতে সত্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। তাই মহাত্মা আল্-বেরূনী গুরুর আদেশ নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার "কিতাবুল হিন্দ"র মুখবন্ধে লিখিতেছেন:— "আমি হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতাসম্বন্ধে লিখিতে অগ্রসর হইলাম। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অপ্রামাণিক অভিযোগ দিব না। আমি যদিও মুসলমান, তবুও তাহাদের ধর্ম ও সভ্যতাকে যেমনভাবে দেখিয়াছি, ঠিক সেই ভাবে বর্ণনা করিতে কাতর হই নাই। তাহাদের ধর্ম-নীতি যদিও ইস্‌লামের অনুরূপ নহে, তবুও তাহা কোনওরূপ রং ফলাইয়া লিখি নাই ইহা নিরপেক্ষ ব্যক্তির ঘটনা-বর্ণনা মাত্র। ইহাতে আমার অতিরঞ্জন কিছুই থাকিবে না।"

অনেক অহিন্দু প্রাচীন ভারতের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বহু ভ্রমে পতিত হন। কারণ, তাঁহারা অনুবাদের অনুবাদ তস্য অনুবাদ পড়িয়া সাত নকলে আসল খাস্তা করিয়া দেন। দশম ও একাদশ শতাব্দীর ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহারা বলেন যে, ভারতের হিন্দুগণ বিভিন্ন জাতিতে এমন ভাবে বিভক্ত ছিল যে, তাহাদের মধ্যে কোনরূপ ঐক্য ছিল না। কিন্তু শত পার্থক্যের মধ্যেও সমগ্র হিন্দু সমাজে এমনি একজাতীয়ত্বের ভাব ছিল, তীক্ষ্ণদর্শী আল্-বেরূনী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন যে, সেই একাদশ শতাব্দীতেও Hindus were a single people, one and undivided—হিন্দুরা একই অবিভক্ত জাতি ছিল। সত্য বটে, দেশে নানাবিধ দেবদেবীর পূজা আরাধনা ছিল, নানাবিধ দল ও উপদল ছিল, এবং দার্শনিক মতও নানা প্রকার ছিল। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? সমস্ত দল ও উপদল তাহাদের বিভিন্ন আদর্শ লইয়া পরস্পরের সহিত শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত পাশাপাশি বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। উচ্চশিক্ষিত হিন্দুগণ দেবদেবীসম্বন্ধে সাধারণ লোক হইতে পৃথক্ ধারণা পোষণ করিতেন। দেবদেবীতে বিশ্বাস সাধারণের জন্য দরকারী মনে করিলেও তাঁহারা নিজেরা উহাতে প্রগাঢ়ভাবে

বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং তাঁহারা প্লেটোর মত বিশ্বাস করিতেন যে, God is in the singular number—"ঈশ্বর একবচনাত্মক আদর্শ।"

আল্-বেরুনীর মতে, হিন্দুদের বিভিন্ন দার্শনিকগণের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তাহা বাহ্যিক, মৌলিক নহে। তিনি সমস্ত মতবাদ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই সব মতবাদের মধ্যে একটা সাধারণ ভিত্তি আছে। রসায়ন, গণিত, বস্তুবিজ্ঞান, বিশ্ববিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা ছিল। ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন দেবদেবীকে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ উদারভাবে দেখিতেন। সেই জন্য এক দল অন্য দলের সহিত মতের জন্য যুদ্ধ করিত না। বিভিন্ন স্থানে সামাজিক আচার-ব্যবহার কিছু কিছু বিভিন্ন ছিল, কিন্তু সমগ্র দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র একই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও জীবন-সম্বন্ধে একই আদর্শ ছিল।

সে যুগের হিন্দুদের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া আল্-বেরুনী তাহাদের ত্রুটিবিচ্যুতির কথা লিখিতেও ভুলেন নাই। একপ্রকার দাসমনোভাব ধীরে ধীরে তাহাদিগকে গ্রাস করিতেছিল। পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাহারা কাহারও সহিত জ্ঞানের আদান প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিল না। একটু গর্বিত, একটু গোঁড়া ও নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা তাহাদের বৈশিষ্ট্য হইয়া পড়িয়াছিল। আর কেহ যে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ইহা তাহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না।

হিন্দু সমাজের জাতিভেদ-প্রথাকে আল্-বেরুনী সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। তিনি উহাকে সমর্থন করেন নাই, তবে খুব ধীরভাবেই এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। জাতিভেদ প্রথার জন্য দশম শতাব্দীর হিন্দু সমাজ দায়ী নহে। তাহারও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে উহার উৎপত্তি। আল্-বেরুনী এ কথাও বলিতে ভুলেন নাই যে, এই প্রকার জাতিভেদ-প্রথা অন্যান্য বহু দেশেও ছিল। পারস্যেও উক্ত প্রকার জাতিভেদ-প্রথা ছিল। হিন্দু ধর্ম্মের চরমতম বিকাশে জাতিভেদ প্রথার স্থান নাই। কারণ, তখন ব্রাহ্মণ হিন্দুও শূদ্রের নিকট মাথা নত করে।

আল-বেরুনী গীতোর একটা শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, গীতার এক স্থানে আছে:—ঈশ্বর জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দয়া বিতরণ করেন। যদি মানুষ সৎকর্ম্ম করিতে গিয়ে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়, তবে তিনি সেই সৎকর্ম্মকে মন্দ বলিয়া ধরেন। এখানে একটা কথা লক্ষ্য করিতে

হইবে যে, হিন্দু ধর্ম্মের এই প্রকার উদার ব্যাখ্যা বর্তমান যুগের সংস্কারবাদী হিন্দু পণ্ডিতের কথা নয়। সেই দশম শতাব্দীতে যুক্তিবাদী ভিন্নদেশীয় মুসলমান দার্শনিক হিন্দু ধর্মকে যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা তাঁহারই অপক্ষপাতপূর্ণ গবেষণার ফল।

আল্-বেরূনী সে যুগের হিন্দুদের আর একটা প্রধান দোষ লক্ষ্য করিয়াছেন। সেটা হইতেছে তাহাদের তীব্র আগ্রহের অভাব। হয়ত ইহা সাহসের অভাবে নয়, কিন্তু ইহা তাহাদের ছিল। আর এই জন্য তাহারা খুব বড় বড় কাজ করিতে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, বহু বিজ্ঞ হিন্দু ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করিতেন; এবং মূর্ত্তিপূজার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ ছিল না। আবার তিনি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, একদল গোঁড়া ও সংস্কারাপন্ন লোক ঈশ্বরসম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব সব রকম কথাই বিশ্বাস করিতেন। ইহার কারণ কি? আল্-বেরূনী বলিতেছেন, ইহার প্রধান কারণ দার্শনিক পণ্ডিতগণের সাধারণের মধ্যে সত্যপ্রচারের আগ্রহের অভাব। ঈশ্বরসম্বন্ধে যখন সাধারণ লোকের বিশ্বাস ও দার্শনিকের বিশ্বাসের মধ্যে বিরোধ বাধিত, তখন দার্শনিক পণ্ডিতগণ হয় দার্শনিক মত পরিত্যাগ করিতেন, অথবা জনসাধারণকে তাহাদের জ্ঞানানুসারে ঈশ্বরসম্বন্ধে জ্ঞান দান করিতেন।

হিন্দু দর্শন ছিল মূলতঃ esoteric (আভ্যন্তরীণ)। ইহা কুসংস্কার ও আচার মূলক বিশ্বাস হইতে মুক্ত। কিন্তু হিন্দু দার্শনিক ও সুধীগণ সাধারণের মধ্যে এই সব উচ্চ ভাব ও দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিবার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য গ্রহণ করেন নাই। হিন্দু দার্শনিকদের এই আচরণকে আল্-বেরূনী সমর্থন করেন নাই।

জ্ঞানবিজ্ঞানের কতকগুলি শাখায় হিন্দুরা যে খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আল্-বেরূনী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের সাহিত্য তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রীত ও মুগ্ধ করিয়াছিল। হিন্দু-সাহিত্যের মধ্যে বেদকে তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, সমগ্র বেদটা একখানি গ্রন্থ, যদিও ইহা চারিভাগে বিভক্ত। তাঁহার যুগের ব্রাহ্মণগণ ইহা পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহার অর্থ বুঝিতেন না। বেদকে তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পুরাণ তাঁহার মতে ঋষিদের রচিত গ্রন্থ। পুরাণ অষ্টাদশ খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে

অনেক গাল-গল্প থাকিলেও বহু নীতি ও উপদেশে ইহা পরিপূর্ণ; এবং ইহার অনেক গল্প রূপক। স্মৃতিশাস্ত্র বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে আইন, কার্য্যবিধি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিষয় আছে।

বিজ্ঞানালোচনার জন্য যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি আর্য্যদের জানা ছিল; এবং তাঁহাদের বিজ্ঞান বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল, যথা, বস্তুবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, মার্গবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় তাঁহারা প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। আল্-বেরুনী আর্য্যদের জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষসম্বন্ধে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, জ্যোতির্ব্বিদ্যাসম্বন্ধে আর্য্যদের জ্ঞান গ্রীক হইতেও স্পষ্ট ছিল। কিন্তু ফলিত জ্যোতিষকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই এবং এ কথাও বলিয়াছেন যে, সে যুগের অনেক দার্শনিক হিন্দু তাহাতে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। রসায়ন ও ঔষধতত্ত্বে আর্য্যদের যে বিশেষ জ্ঞান ছিল, তাহা আল্-বেরুনী বার বার বলিয়াছেন। চরকের গ্রন্থ ঔষধ বিজ্ঞানের মূল ও প্রামাণিক গ্রন্থ।

পঞ্চতন্ত্রখানি অনুবাদ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু গল্প অপেক্ষা বিদ্যার্জ্জনের দিকে তাঁহার বেশী ঝোঁক ছিল বলিয়া তিনি তাহাতে হাত দেন নাই।

আল্-বেরুনী অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন, কতকগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন, শ্রেণী বিভাগ করেন। আবার কতকগুলির লিপি উদ্ধারও করিয়াছিলেন; এবং তিনি অনেক গ্রন্থকে অবজ্ঞা ও বিস্মৃতির গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়া লোকলোচনের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। বহু দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ যে অমর কীর্ত্তি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দশম শতাব্দীর ভারতের এক উজ্জ্বল ইতিহাস। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথায় বলিতে হয়, "যথার্থবাদী ঐতিহাসিক বলিয়া, ভারতের প্রাচীন বিদ্যার একাগ্রচিত্ত অনুশীলনকারী বলিয়া সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে আল্-বেরুনীর নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হয়, এবং তাঁহার বই সযত্নে পঠিত ও আলোচিত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে সত্য পরিচয়-স্থাপনের চেষ্টায় জ্ঞানকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন বলিয়া আল্-বেরুনী সমস্ত সভ্য মানবের সাধুবাদের যোগ্য।"

আজ আমরা জাতিসমন্বয়, ধর্ম্মসমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক মিলন ও সম্প্রীতির

কথা আলোচনা করি; অথচ যাহাদের সহিত সমন্বয় ও মিলন করিতে যাইব, তাহাদের ভিতরের খবর একেবারেই রাখি না। আর যাহা রাখি, তাহা মিস্‌ মেয়ো, অথবা স্যার উইলিয়াম মূইরের পক্ষপাতপূর্ণ একদেশদর্শী গ্রন্থ পাঠ করিয়া। আমাদিগকে এই পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং আল্‌-বেরূনীর পন্থা অবলম্বন করিয়া অপরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।

আল্‌-বেরূনীর বহু পরে ভারত-সম্রাট্‌ শাহ্‌জহান-পুত্র মহাত্মা সাধক দারা শিকোহ্‌ এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং তিনি সেই উদ্দেশ্যে কতিপয় পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। "মজ্‌মাউল বহ্‌রায়েন"—অর্থাৎ "দুই সাগরের মিলন" নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি আমাদিগকে এই পথের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। মহাজন-নির্দ্দেশিত সেই সব পথ ধরিয়া যদি আমরা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পরস্পরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বিষয় আলোচনা করি এবং পূর্ব্ব হইতে বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব পরিত্যাগ করি, তবে আশা করা যায়—মহামনীষী আল্‌-বেরূনীর সাধনা সার্থক হইবে—মহাপ্রাণ সাধক দারা শিকোহের আত্মবলিদান সফল হইবে, এবং ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতিগত সমন্বয়, মিলন ও সদ্ভাব সম্ভব হইবে।

—রেজাউল করীম

স্বদেশমন্ত্র

বাহ্য জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে প্রত্যক্ষ শক্তি-সংগ্রহ-রূপ, প্রমাণ-বাহন, শতসূর্য্য জ্যোতিঃ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি-প্রতিঘাতী প্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষীর উদ্ঘাটিত, যুগ-যুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্ব্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ব্বপুরুষদিগের অপূর্ব্ব বীর্য্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্ব-কাহিনী।

একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী স্বরে, পূর্ব্ব-দেবদিগের আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্রিত পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গীতে অপূর্ব্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান ইত্যাদির দৃশ্য উপস্থিত হইয়াছে। একদিকে পাশ্চাত্ত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্য্যসমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্ত্য দেশে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাজনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য -মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায় -ত্যাগ। বর্ত্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে—বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্ম কল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্ব্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছি—

"ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ।
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।।"

একদিকে, নব্য ভারত-ভারতী বলিতেছেন, পতি-পত্নী-নির্ব্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত, কারণ, যে বিবাহ আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্ব্বাচন করিব; অপরদিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

একদিকে, নব্য ভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্ত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্ত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন হইব; অপরদিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহ-চর্ম্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?

একদিকে, নব্য ভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্ত্য জাতিরা যাহা করে, তাহাই ভাল; ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপরদিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান!

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টাযত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই?

আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ কি সর্ব্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।" যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্ব্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। কিন্তু একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, "বুঝি কোনও ইংরেজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল।"

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা; পাশ্চাত্ত্য অনুকরণমোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি বিচার শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গেরা যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই

ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?

পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল, পাশ্চাত্য নারী স্বয়ংবরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান; পাশ্চাত্য পুরুষে আমাদের বেশ, ভূষা, অশন, বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ; পাশ্চাত্যেরা মূর্ত্তিপূজা দোষাবহ বলে,—অতএব মূর্ত্তিপূজা অতি দূষিত, সন্দেহ কি?

পাশ্চাত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দাও। পাশ্চাত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে, অতএব সর্ব্ববর্ণ একাকার হও। পাশ্চাত্যেরা বাল্যবিবাহ সর্ব্বদোষের আকর বলে, অতএব তাহা অতি মন্দ নিশ্চিত।

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য—ইহাই বিচার করিতেছি না; তবে যদি পাশ্চাত্যদিগের অবজ্ঞা-দৃষ্টিমাত্রই আমাদের রীতি-নীতির জঘন্যতার কারণ হয়, তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্ত্তব্য।

বলবানের দিকে সকলে যায়, গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গায়ে কোনওপ্রকারে একটু লাগে, দুর্ব্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশ-ভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!! চতুর্দ্দশ শত বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্শীরা এক্ষণে আর "নেটিভ" নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রাহ্মণ্যগৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্য্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি উহারা অনার্য্যজাতি!! উহারা আর আমাদের কেহ নহে!!!

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা-সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের বা নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই

"মায়ের" জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামানবের ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারত-বাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সুন্দর

যারা ভাষার পণ্ডিত তারা সুন্দরকে প্রদীপ ধরে দেখতে চলে আর যারা কবি ও রূপদক্ষ তারা সুন্দরের নিজেরই প্রভায় সুন্দরকে দেখে নেয়, অন্ধকারের মধ্যেও অভিসার করে তাদের মন। আলোর বেলাতেই কেবল সুন্দর আসেন দেখা দিতে, কালোর দিক থেকে তিনি দূরে থাকেন—একথা একেবারেই বলা চলে না, বিষম অন্ধকার না বলে বলতে হল বিশদ অন্ধকার—যদিও ভাষাতত্ত্ববিদ্ এরূপ কথায় দোষ দেখবেন। কালো দিয়ে যে আলো এবং রঙ সবই ব্যক্ত করা যায় সুন্দরভাবে তা রূপদক্ষ মাত্রেই জানেন। এই যে সুন্দর কালো এর সাধনা বড় কঠিন, সেজন্য জাপানে ও চীনদেশে একটা বয়স না পার হলে কালি দিয়ে ছবি আঁকতে হুকুম পায় না গুরুর কাছ থেকে শিল্পশিক্ষার্থীরা। যে রচনায় রস রইলো সেই রচনাই সুন্দর হল এটা স্থির, কিন্তু রস পাবার মত মনটি সকল মানুষেরই সমানভাবে বিদ্যমান নেই, কাজেই এটা ভাল ওটা ভাল নয় এই রকম কথা ওঠে। মেঘের সঙ্গে ময়ূরের মিত্রতা, তাই কোন্ একদিন নিজের গলা থেকে গন্ধর্বনগরের বিচিত্র রঙের তারা-ফুলে গাঁথা রঙীন মালা ময়ূরের গলায় পরিয়ে দিয়ে মেঘ তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলে। মানুষ প্রথম ভাবলে, এমন সুন্দর সাজ কারো নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সে দেখলে বকের পাঁতি পদ্মফুলের মালার ছলে সুন্দর হয়ে মেঘের বুক থেকে মাটির বুকে নেমে এল,—মানুষ বল্লে, ময়ূর ও বক এরা দুইটিই সুন্দর। আবার এল একদিন জলের ধারে সারস পাখী—মেঘ যাকে নিজের গায়ের রঙে সাজিয়ে পাঠালে। এমনি একের পর এক সুন্দর দেখতে দেখতে মানুষ বর্ষাকাল কাটালে, তারপর শরতে দেখা দিলে আকাশে নীলপদ্মমালার দুটি পাপড়িতে সেজে নীলকণ্ঠ পাখী। এমনি ঋতুর পর ঋতুতে সুন্দরের সন্দেশ-বহ আসতে লাগলো একটির পর একটি মানুষের কাছে—সবশেষে এলো রাতের কালো পাখী আকাশপটের আলো নিভিয়ে অন্ধকার দুখানি পাখনা মেলে—পৃথিবীর কোন ফুল, আকাশের কোন তারার সঙ্গে মানুষে তার তুলনা খুঁজে না পেয়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো।

এই যে একটি মানুষের কথা বল্লেম, এমন মানুষ জগতে একটি দুটি পাই যার কাছে সুন্দর ধরা দিচ্ছেন সকল দিকে নানা সাজে নানা রূপে বর্ণে সুরে ছন্দে। ময়ূরই সুন্দর, কলবিঙ্ক নয়, কাক নয় এই কথা যারা বলছে এমন মানুষই পৃথিবী ছেয়ে রয়েছে দেখতে পাই।

যার চোখ সুন্দরকে দেখতে পেলে না আজন্ম তার চোখের উপরে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা ঘ'ষে ঘ'ষে ক্ষইয়ে ফেল্লেও ফল পাওয়া যায় না, আবার যে সুন্দরকে দেখতে পেলে সে অতি-সহজেই দেখে নিতে পারলে সুন্দরকে, কোনো গুরুর উপদেশ পরামর্শ এবং ডাক্তারি দরকার হ'ল না তার, বিনা অঞ্জনেই সে নয়নরঞ্জনকে চিনে নিলে।

মাটি থেকে আরম্ভ ক'রে সোনা পর্যন্ত, যে ভাষায় কথা চলে সেটি থেকে ছন্দোময় ভাষা পর্যন্ত, তারের সুর থেকে গলার সুর পর্যন্ত বহুতর উপকরণ দিয়ে রূপদক্ষেরা রচনা ক'রে চলেছেন সুন্দরের জন্য বিচিত্র আসন, মানুষের কাজে কতটা লাগবে কি না লাগবে এ ভাবনা তাঁদের নেই। কাদায় যে গড়ে সে কাদাছানা থেকেই সুন্দরের ধ্যান ক'রে চলে, না হ'লে গড়ার উপযুক্ত ক'রে মাটি কিছুতে প্রস্তুত করতে পারে না সে—একথাটা কারিগরের কাছে হেঁয়ালী নয়। চাষের আরম্ভ থেকেই সোনার ধানের স্বপ্ন জমীতে বিছিয়ে দেয় চাষা, কিন্তু যার সুন্দরের ধ্যান মনে নেই সে যখন ভাল মাটি নিয়ে বসে যায় এবং দেখে মাটি বাগ মানছে না তার হাতে, তখন সে হয়তো বোঝে হয়তো বোঝেও না কথাটার মর্ম্ম।

ছন্দ, সুর-সাধা এবং রঙ-প্রস্তুত ও তুলি-টানার প্রকরণ সহজে মানুষ আয়ত্ত করতে পারে, কিন্তু তুলি-টানা হাতুড়ি-পেটা কলম-চালানোর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দরের ধ্যানে মনকে স্থির রাখতে সবাই পারে না, এমন কি যারা রূপদক্ষ তারাও সময়ে সময়ে লক্ষ্য হারিয়ে ফেলছে তাও দেখা যায়।

যে রচনাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তার মধ্যে রচনার কল-কৌশল ধরা যায় না—কথা সে যেন ভারি সহজে বলা হয়ে যায় সেখানে। এই যে সহজ গতি এ থাকে না যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয় তাতে—কৌশল নৈপুণ্য সবই চোখে পড়ে। কবিতা থেকে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, ছবি মূর্ত্তি সব থেকে এটা প্রমাণ করা চলে। কর্ম্ম কোনো রকমে নিষ্পন্ন হ'ল এবং কর্ম্ম খুব হাঁকডাক ধুমধামে নিষ্পন্ন হয়ে গেল, কিন্তু কর্ম্মের কঙ্কালগুলো চোখে পড়লো না।

আমি একবার একটা ছাপার কল অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। যন্ত্রটা একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষের কাজ একা করছে, মানুষের চেয়ে সুচারু ও দ্রুতভাবে। এতে ক'রে ভারি একটা আনন্দ হ'ল, কিন্তু একটি পাখীকে উড়তে দেখে যে আনন্দ তার সঙ্গে সেদিনের আনন্দের তফাৎ ছিল। পাখীর ডানার মধ্যে নানা কল-বল কি ভাবে কাজ করছে তার খোঁজই নেই, ওড়ার সুন্দর ছন্দই সেখানে দেখা দিয়ে মনকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কোন্ দেশে তার ঠিক নেই। সৃষ্টির নিয়মে সমস্ত সুন্দর জিনিষ আপনার নির্ম্মাণের কৌশল লুকিয়ে চল্লো দর্শকের কাছ থেকে এবং এই নিয়মই মেনে চল্লো সমস্ত সুন্দর জিনিষ যা মানুষে রচনা ক'রলে—যেখানে নির্ম্মাণের নানা প্রকরণ ও কৌশল ধরা প'ড়ে গেল সেখানেই রচনার সৌন্দর্য্য হানি হ'ল, কলের দিক, ফুটলো কিন্তু রসের দিক্ সৌন্দর্য্যের দিক্ চাপা প'ড়ে গেল। ঘুড়ি যখন আকাশে ওড়ে তখন যে কলটি তাতে বেঁধে দেয় কারিগর, সেটি বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে যায় তবেই সুন্দর ঠেকে ঘুড়িখানির ওড়ার ছন্দ। জাহাজ এমন কি উড়ো কল তারাও দেখায় সুন্দর এই কারণে এবং সবচেয়ে দেখায় সুন্দর গঙ্গার উপরে নৌকাগুলি যার চলার হিসেব ও কল-বল প্রত্যক্ষ হয়েও চক্ষুশূল হচ্ছে না।

সুন্দর জিনিষের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা—যেমন রূপ, তেমনি ভাব। বহিরঙ্গ যা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়ে সুন্দর বর্ত্তমান হ'ল। চোখের বাইরে যে পরকলা তার সঙ্গে চোখের ভিতরে যে মণিদর্পণ তার যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য হ'ল; তখনই সুন্দর-ভাবে দেখতে পাওয়া গেল বিশ্বের জিনিষ, চশমার কাঁচে আঁচড় প'ড়লো চোখ রইলো পরিষ্কার, কিংবা চোখের মণিতে ছানি প'ড়লো চশমা রইলো ঠিকঠাক, এ হ'লে সুন্দর দেখা একেবারেই সম্ভব হ'ল না।

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভদ্রতা

ভদ্রতা আত্মীয়তার চেয়ে কিছু কম এবং সামাজিকতার চেয়ে কিছু বেশী। আত্মীয়তা আন্তরিক, সামাজিকতা আনুষ্ঠানিক। ভদ্রতা উভয়ের মধ্যে সেতু-স্বরূপ, এবং উভচর।

এই বন্ধনের গুণেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা সম্ভবপর হয়, নচেৎ বাকি শুধু উচ্ছৃঙ্খল একাকার পশুত্ব, -কিংবা মুক্ত নিরাকার দেবত্ব!

অবশ্য যেখানে ভালবাসা, ভক্তি, ভয় বা অন্য কোন ভ-পূর্ব্বক ভাবাত্মক সম্বন্ধ বিদ্যমান, সেখানে ভদ্রতার কথা ওঠেই না, কারণ, খণ্ড ত সমগ্রের অন্তর্গত। যেখানে সন্তুষ্ট করবার ইচ্ছে স্বাভাবিক, সেখানে ব্যবহার ত আপনা হইতেই শুধু শিষ্ট কেন মিষ্টই হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে অপরিচয় বা অতি পরিচয় বা ঔদাসীন্যবশতঃ মন সহজে অনুকূল নয়, সেইখানেই ভদ্রতার শিক্ষা ও চর্চ্চার প্রয়োজন। অর্থাৎ মনোভাব যেমনই থাকুক না কেন, লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নাম ভদ্রতা। এবং যে সমাজ যত সভ্য, তার লোক-ব্যবহার তত সদ্ভাবমূলক ও সুরুচিবাচক।

সকলের মত এক না হলেও যেমন কার্য্যক্ষেত্রে অধিকাংশের মতে মত দিতে হয়, নইলে কাজ চলে না; তেমনি সকলের মন সমান না হলেও, সামাজিক অনুষ্ঠানে সৌভ্রাত্র ও সৌষ্ঠব রক্ষার্থে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়, তাকে বলে রীতি। ভদ্রতা রীতিমাত্র নয়, তার চেয়ে কিছু বেশী উদার। কারণ, রীতি ক্রিয়া-কর্ম্মক্ষেত্রে ও স্বশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ; কিন্তু ভদ্রতা সমাজবিশেষ ও স্থানবিশেষ ছাড়িয়ে সকল সমাজ এবং সকল অবস্থায় পরিব্যাপ্ত। মানুষমাত্রেই পরস্পরের কাছে তা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা দাবি করতে পারে।

অপরপক্ষে নীতির তুলনায় ভদ্রতার ক্ষেত্র অনেক সংকীর্ণ। কোমর বেঁধে পৃথিবীর দুঃখ দূর বা পরের উপকার করতে যাওয়া, কিংবা ন্যায়ান্যায়ের বিচারপূর্বক চলা, অথবা মহৎ কর্তব্য পালন করা ভদ্রতার এলাকা নয়। যারা কাছাকাছি আছে, কিংবা ঘটনাচক্রে এসে পড়েছে, তাদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করাই তার মূল উদ্দেশ্য। সাময়িক এবং উপস্থিত নিয়ে তার কারবার,—কিন্তু অভাবপক্ষে তারই মধ্যে খণ্ডপ্রলয় বেধে যেতে পারে।

কিন্তু রীতির সঙ্গে ভদ্রতার এইটুকু সাদৃশ্য আছে যে, সব সময় সকলের প্রতি সকলের মনে সমান সদ্ভাব থাকা যখন সম্ভব নয়, তখন অন্ততঃ বাইরের প্রকাশের সুষমাবিধানার্থে সদনুষ্ঠানের ন্যায়-ব্যবহারকেও কতকগুলি নিয়মাধীন করা সমাজ আবশ্যক মনে করে। আর নীতির সঙ্গে তার এইটুকু সাদৃশ্য আছে যে, মানুষের অন্তরতম প্রদেশে যদি মানুষের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি না থাকত ও পরস্পরের মনে আঘাত দেবার সহজ প্রবৃত্তি না হ'ত, তাহলে দীর্ঘকাল ধরে বহু লোকের পক্ষে সে নিয়ম রক্ষা করে চলা প্রায় অসম্ভব হ'ত। সুতরাং ভদ্রতাকে সংক্ষেপে লোকব্যবহারের ক্ষুদ্র রীতিনীতি বলা যেতে পারে। কিংবা মনুষ্য সম্বন্ধের 'স মা গু', -অর্থাৎ প্রত্যেকের পরস্পরের প্রতি সেই পরিমাণ সদ্ভাব-প্রকাশ, যেটুকু নইলে জীবন-যান তৈলাভাবে অচল হয়ে পড়ত। কি ঘরে, কি বাইরে, এই সামান্য স্নেহলাভেও যে অনেক সময় মানুষকে বঞ্চিত হ'তে হয়, সেটি বড়ই দুঃখের বিষয়। অবশ্য সভ্যসমাজে অধিকাংশ লোকই স্পষ্টতঃ অভদ্র নয়; কিন্তু যে মার্জিত ও মোলায়েম, সদাশয় ও সুশ্রী, চৌকোষ ও চোস্ত ব্যবহারকে যথার্থ ভদ্রতা বলা যেতে পারে, তাও সুলভ নয়।

অনেকে আজকাল আক্ষেপ করেন যে একালের ছেলেদের ভদ্রতা কমে গিয়েছে। যেহেতু অল্প লোকেরই ত্রিকালজ্ঞ হবার সুযোগ ঘটে, সে কারণ আমি এ কথার সমর্থন বা প্রতিবাদ করতে অক্ষম। তবে এইটুকু স্বীকার্য যে, আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার দিন এদেশে গেছে বা যেতে বসেছে।

তার কারণ হয়ত এই যে, একালের লোকের সময়-সংক্ষেপ। প্রত্যেক চিঠির লাইন যোড়া ভিন্ন ভিন্ন পাঠ শিখতে ও লিখতে হলে বোধ হয় ইস্কুলের পাঠ বন্ধ করতে হয়। আর উঠতে বসতে যদি প্রত্যেক গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়, কিংবা সকলের কুশল প্রশ্ন অন্তে অন্য কথা পাড়তে হয়, তাহলেও আধুনিক জীবনযাত্রা চালানো দায় হয়ে পড়ে।

আর এক কারণ এই হ'তে পারে যে, একালে গুরু-লঘু সম্পর্কের দূরত্বকে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত করবার দিকে আমাদের ঝোঁক হয়েছে। মাকে 'আপনি' বলা, বাপ-খুড়োর সামনে তটস্থ হয়ে থাকা, শাশুড়ী-ননদের কাছে এক হাত ঘোমটা টেনে ইসারায় কথা কওয়ার আমলের তুলনায় আজকাল আমরা হয়ত অপেক্ষাকৃত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি।

কিন্তু এমন যে ব্রাহ্মণ জাতি,—যার তুল্য গুরু সেকালে ছিল না, তারাও যখন কালকালে পূর্বপ্রাপ্য পদমর্যাদা থেকে চ্যুত হ'তে বাধ্য হয়েছেন, তখন অন্যান্য গুরুজনকেও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণে নিজ নিজ বাকি খাজনা এবং উপরি পাওনার লোভ সংবরণপূর্বক সমতল সমকক্ষতার শ্রীক্ষেত্রে হাসিমুখে নামতে হবে, এবং কালের সঙ্গে সমপদবিক্ষেপে চল্‌তে হবে। সুতরাং উপরি-উক্ত অনুষ্ঠানের ত্রুটি মার্জনা ক'রে দেখতে হবে যে, সারভূত ভদ্রতার লক্ষণ কি,—যে ভদ্রতা সব দেশের, সব কালের এবং সব পাত্রের।

প্রতীক বা স্মরণচিহ্ন রচনার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মজ্জাগত। অসীমকে সসীমে বাঁধবার, নিরাকারকে সাকারে ধরবার প্রয়াস তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা সকলেই পৌত্তলিক, তবে প্রকাশের তারতম্য আছে, সাকারীকরণের মাত্রাভেদ আছে। মূর্তিও সাকার, মন্ত্রও সাকার,—কিন্তু কম বেশী। বড়কে ছোটর দ্বারা, ব্যষ্টিকে সমষ্টি দ্বারা, অরূপকে রূপ দ্বারা প্রকাশ করবার এই চেষ্টার উদ্দেশ্য অস্পষ্টকে পরিস্ফুট এবং অলক্ষ্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা। তোমার মনে অনেকখানি ভক্তি থাকতে পারে, কিন্তু বাইরে তার কোন চিহ্ন না দেখালে আমিই বা জানব কি ক'রে, তুমিই বা জানাবে কি ক'রে?—অতএব প্রণাম কর। অতএব দাম্পত্য-জীবনের বন্ধন লৌহ দ্বারা স্মরণ করাও, তার আনন্দ সিন্দুর-অলক্তক-তাম্বুলের লোহিত রাগে ব্যক্ত কর; এবং বৈধব্যের শূন্যতা বর্ণাভরণ-হীন বেশে সূচিত হোক্। খৃষ্টের পরার্থপর অমানুষিক যন্ত্রণা একটি ক্রুশের চতুঃসীমায় আবদ্ধ, বিশ্বলক্ষ্মীর অপরিসীম, অনির্বচনীয় সৌন্দর্য একটি পদ্মে বিকশিত, ভক্তির চক্ষে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি একটি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত।

এই চিহ্নতন্ত্রে লাভও আছে, যেহেতু মানুষের সহজ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংযত ক'রে আনবার সাহায্য করে; আবার ক্ষতিও আছে, যেহেতু জড়বস্তু দ্বারা চেতনকে, অনুষ্ঠান দ্বারা অনুভূতিকে চাপা দেবারও সাহায্য করে। প্রণাম আন্তরিক ভক্তিজ্ঞাপনও করতে পারে, আবার তার অভাব গোপনও করতে পারে।

সেইজন্য সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের সেই সকল প্রমাণের প্রতি বোধ হয় মানুষের বেশী ঝোঁক হয়েছে, যা অত সুলভ ও ক্ষণস্থায়ী নয়: যা একটিমাত্র নির্দিষ্ট আচরণে পর্য্যবসিত নয়, কিন্তু সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত।

এইজন্যই বলছিলুম যে, আনুষ্ঠানিক বা স্থূল ভদ্রতা অপেক্ষা আজকাল সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর মূল ভদ্রতার মূল্য বেশী হতে চলেছে। দেশকাল-ভেদে প্রথমোক্তের নানা ভিন্ন প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু শেষোক্ত-সম্বন্ধে মতভেদের অবসর কম। ভদ্রতার এই বাহ্য আকৃতিবৈষম্য ভুলে গিয়ে তার অন্তঃপ্রকৃতি-বিশ্লেষণের প্রতি মন দিলে দেখতে পাব যে, তার কতকগুলি লক্ষণ সর্ব্বজনীন ও সর্ব্ববাদিসম্মত।

প্রথমতঃ—ভদ্রতার মূলে পরহিতৈষণা, এবং তার ফল সংযম। উপস্থিতমত পরের যাতে কষ্ট না হয়,—আমার বাড়ী এসে বা আমার সম্পর্কে থেকে ক্ষণকাল যাতে অন্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, ভদ্রলোকের স্বভাবতই এই ইচ্ছা হয়। এবং সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে হলে অনেক সময় নিজের তৎকালীন প্রতিকূল ইচ্ছা দমন করতে হয়, নিজের আপাত সুবিধা বিসর্জ্জন দিতে হয়। আমার যে সময় জরুরী কাজ আছে, সে সময় হয়ত একজন দেখা করতে এলেন, ভদ্রতার নিয়মানুসারে আমার সব কাজ ফেলে রেখে তার আতিথ্যে মনোনিবেশ করতে হবে। কিংবা হয়ত কোন মাননীয় ব্যক্তি আমার মুখের সামনে সাদাকে নয় কালোকে কালো বলছেন, আমার কণ্ঠাগ্রে এলেও মুখে বলবার সাধ্য নেই যে, "ওগো, তুমি মিথ্যে কথা বলছ; কিংবা আর একজনকে "তোমার নিজেরই সম্পূর্ণ দোষে ত্রুটি ঘটেছে" কিংবা অপর একজনকে—"অন্যের নিন্দা করবার আগে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখলে ভাল হয় না?"

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে সম্প্রতি যে অভদ্রতার প্রাদুর্ভাব হয়েছে, এই প্রসঙ্গে সেজন্য দুঃখপ্রকাশ না করে থাকা যায় না। সরস্বতীর মন্দিরে প্রবেশ করবার সময়ও কি অনুতস্রোতার সঙ্গে আমরা বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ দলাদলির ভাবটা বাইরে রেখে আসতে পারিনে? অবশ্য সাহিত্যাচার্য্যের যদি কোন উচ্চ লক্ষ্য থাকে ত, সে কেবল লীলা কমলের বাতাসে অবলীলাক্রমে সাধিত হবে না, তা জানি, -অকল্যাণকে তাড়াতে হলে মধ্যে মধ্যে কুলোর বাতাসও দেওয়া চাই। কিন্তু তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম মর্ম্মান্তক অথবা যে-কোন প্রকার ভাষার অস্ত্র সাহিত্যরথী ব্যবহার করুন না কেন, ইতরতা বা দুঢ়তার অসম্প্রয়োগ এস্থলে নিষিদ্ধ হওয়া

উচিত। যিনি বাণীর সেবক হবার স্পর্দ্ধা রাখেন, অশুদ্ধ বাণী ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে বিশেষরূপে বিসদৃশ নয় কি?

স্পষ্টবাদীর দল উল্লিখিত সংযমাত্মক ভদ্রতাকে কপটতার নামান্তর মনে করেন। "আমার বাপু স্পষ্ট কথা" ব'লে আরম্ভ ক'রে তাঁরা মুখে যা আসে তাই বলতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না, বরং গর্ব্বই অনুভব করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মন এবং মুখের মধ্যে একটা পাকা বাঁধ বেঁধে না রাখলে দু'দিনও কি সমাজ টিকতে পারে?—আমার ত মনে হয় কতকগুলি কথা বা বিষয়কে একঘরে করা ভালই হয়েছে। স্পষ্টবাদিতার দোহাই দিয়ে ভদ্রসমাজে সে বাঁধ ভাঙ্গায় আমি ত কোন বাহাদুরি বা সুবিধা দেখতে পাইনে। সামান্য একটি খিল খুলে দিলে অতি বড় বন্ধনও সহজে শিথিল হয়ে পড়ে, একটি পরদা তুলে ফেলেও অনেকটা আব্রু নষ্ট হ'তে পারে। কথার সংযম কিছু কম গুরুতর জিনিস নয়। যদি তা কপটতাই হয় ত সে-পরিমাণ কপটতা সমাজরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। আমাদের কান যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূক্ষ্ম শব্দের বেশী শুনতে পায় না; চোখ যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দূরতার বেশী দেখতে পায় না, তেমনি বোধ হয় অখণ্ড সম্পূর্ণ সত্য আমাদের মন গ্রাহ্য বা সহ্য করতে পারবে না ব'লেই ভগবান্ দয়া ক'রে অন্তরের আড়ালে রেখে দিয়েছেন। ঐখানেই ত তাঁর ভদ্রতা!—বেশী তলিয়ে বুঝে লাভ কি? অনেক সময় কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোয়, কিংবা ঐ কথাই একটু ঘুরিয়ে ভাব দিয়ে বলা যেতে পারে যে, অনেক সময় সত্য খুঁজতে খুঁজতে শুধু "নিখিল অশ্রুসাগরকূলে" গিয়ে পৌঁছতে হয়।

কিন্তু অল্প মাত্রায় যা উপকারী, বেশী মাত্রায় তাকেই হিতে বিপরীত হ'তে পারে, যথা, হোমিওপ্যাথি ওষুধ। পরের মনে লাগানো কথা বলবে না ব'লেই যে পরের মন-যোগানো কথা বলতে হবে, তার কোন মানে নেই। কেউ কেউ ভদ্রতার সঙ্গে খোসামুদির তফাৎ করতে পারেন না ব'লে নিজের মানরক্ষার জন্য পরকে অপমান করা আবশ্যক এবং কর্ত্তব্য বোধ করেন। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে ব'লে ত আমার বিশ্বাস। ভদ্রতার সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি, খোসামুদির দৃষ্টি কেবল নিজের প্রতি; ভদ্রতা নিজের অসুবিধা ক'রেও পরের সুবিধা ক'রে দিতে উৎসুক, খোসামুদি নিজের সুবিধাটুকুই বোঝে ও খোঁজে; ভদ্রতা চৌকোষ, সরল ও সুন্দর,—খোসামুদি একপেশে, কুটিল ও কুৎসিত। একটু সংসারজ্ঞানের চর্চ্চাই খোসামুদি এড়াবার প্রকৃষ্ট উপায়। যে

পৃথিবীতে এসেছি, সেটা কি রকম জায়গা জানতে না পারলে উন্নতিচেষ্টা করব কি করে?—যেখানে শক্ত, সেইখানেই ভক্ত বা অতি ভক্ত!—যেখানে অক্ষমতা সেইখানেই পরমুখাপেক্ষিতা। ছোট ছেলে কি কম খোসামুদে? তবে তাদের সবই সুন্দর।

আর একটি জিনিস আছে, যা ভদ্রতার বেনামিতে চলে, অথচ বেশী পরিমাণে যা ক্ষতিকর,—সেটি হচ্ছে চক্ষুলজ্জা। এটি আমাদের দেশের ও জাতের একটি রোগবিশেষ বললেও অত্যুক্তি হয় না, এবং খুব কম লোকই সে রোগ হ'তে মুক্ত। মনে মনে আমার কোন একটি অনুরোধ রক্ষা করবার মোটেই ইচ্ছা নেই, এমন কি অভিপ্রায় নেই,—অথচ চক্ষুলজ্জায় পড়ে আমি অনুরোধকর্ত্তার সামনে বেশ একটু উৎসাহসহকারেই তার প্রস্তাবে সম্মত হলুম। এ স্থলে যদি বিরক্তভাবে কাজটা ক'রে দিই ত মন্দের ভাল; কিন্তু একবার একজনের জন্য করলেই ত অব্যাহতি পাওয়া যায় না, আর ক্রমাগত অনিচ্ছাসত্ত্বে ঢোঁক গিললেও নিজের হজমশক্তির উপর একটু অত্যাচার করা হয়। আবার যদি করব ব'লে না করি, তাহ'লে নিজের কথারও খেলাপী হয়, নিজের মনও খুঁৎখুঁৎ করে, আর অনর্থক পরের আশাভঙ্গও করা হয়। মতামত সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ভদ্রতার সঙ্গে একটু দৃঢ়তা মেশানোই উক্ত রোগের একমাত্র চিকিৎসা। অমায়িক অথচ আত্মপ্রতিষ্ঠ, লোকপ্রিয় অথচ সত্যনিষ্ঠ,—এমন সংমিশ্রণ এদেশে এত দুর্লভ কেন? কেন খাঁটি লোক যেন রূক্ষ হ'তেই বাধ্য, এবং শিষ্ট শান্ত ব্যক্তির উপর জুলুম হওয়াটাই নিয়ম?—তাও বলি যে দাতা ও গ্রহীতা না হ'লে যেমন দান সম্পূর্ণ হয় না, তেমনি অনুরোধকারীও মাত্রা বুঝে পীড়াপীড়ি করলে তবেই ভদ্রতা রক্ষা করা সম্ভব,—নইলে অযথা টান পড়লে ছিঁড়তে কতক্ষণ!

সংযম যেমন ভদ্রতার প্রধান নিবৃত্তিমূলক লক্ষণ, তেমনি সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি বা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা তার প্রধান প্রবৃত্তিমূলক লক্ষণ। অর্থ সামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি, রূপগুণ, মানমর্যাদা যার যেমনই থাকুক না কেন কম হ'লেও তাকে পায়ের তলায় ঠাসবার দরকার নেই, বেশী হ'লেও তার পায়ের তলায় পড়ে থাকবার দরকার নেই। যাকে ভাল লাগে তার সঙ্গে গলাগলিও কর না যাকে মন্দ লাগে তাকে গালাগালিও দিও না, সকলের প্রতি সহজ সদয় ব্যবহার কর, এই হচ্ছে ভদ্রতার বিধান। ভদ্রতা ব্যবহার-নীতি মাত্র, মনের নিয়ন্তা নয়। তবে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে, বাইরে যে ভাব দেখানো যায়, সেটা ক্রমে

মনের ভিতর পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়; যেমন রাগের প্রকাশ দমন করতে করতে রাগ কমে আসা সম্ভব। পূর্ব্বে ভদ্রতাকে বাঁধ বলেছি; আবশ্যক-স্থলে এই বাঁধই যে প্রাচীরের কাজ করতে পারে, তার আর আশ্চর্য্য কি?—যেখানে এই প্রাণের এই আড়ালটুকু রাখতে চাইনে, অর্থাৎ যেখানে প্রকাশই উদ্দেশ্য সেখানে অবশ্য ভদ্রতার কাজ ফুরায় এবং উচ্চতর নেতার হাতে রাজদণ্ড দিয়ে সে স'রে পড়ে।

সেইজন্যই আত্মীয়তা যেখানে শুধু রক্ত নয়, অনুরক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভদ্রতার ব্যবধান সেখানে অনাবশ্যক,—এমন কি অপ্রীতিকর। অতি দুঃখের বিষয়, নিকট এবং স্থায়ী সম্পর্ক স্থলেও যখন সব সময় আশানুরূপ মনের মিল থাকে না, তখন আত্মীয়ের মধ্যেও সাধারণতঃ ভদ্রতার নিয়ম উপেক্ষা না করাই ভাল। একসঙ্গে থাকতে গেলে অষ্টপ্রহর মেজাজে মেজাজে স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ হয়ে যে উত্তাপ সঞ্চিত হয়, দৈনিক কর্ম্মজীবনযাত্রায় অনিবার্য ভাবে যে ধূলিজাল উত্থিত হ'তে থাকে, ভদ্রতার স্নিগ্ধ শান্তিবারিসিঞ্চনই তা কথঞ্চিৎ নিবারণের অন্যতম উপায়। নিজ নিজ পারিবারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই অধিকাংশ লোক বুঝতে পারবেন যে, সময়মত একটু সহৃদয় ব্যবহার, অবস্থা বুঝে একটু সংযম, একটি মিষ্টি কথা, একটি হাসির আলোর অভাবে শেষে পরস্পরের মনে এমন দাগ দেগে যায় যে, হাজার চেষ্টাতেও তা মুছে ফেলা যায় না; ভাঙ্গা জোড়া লাগলেও জোড়ের চিহ্ন চিরকাল থেকে যায়। হাঁড়ি কলসী একসঙ্গে থাকলেই ঠোকাঠুকি হয়, সে কথা সত্য, কিন্তু একটু ঘন ক'রে প্রলেপ দিলে আওয়াজটা কম হয়, এবং টেঁকেও বেশীদিন! বাঙালীরাও পরিবারগতপ্রাণ। সেই পারিবারিক জীবনের উপর প্রায় তার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ নির্ভর করে। তাই সুখের সংসার গ'ড়ে তোলবার কোন উপচারই আমাদের অবহেলা করা উচিত নয়। বাইরে যতই মানসম্ভ্রম নামডাক থাকুক না কেন, বাড়ীর ভিতরে শান্তি না থাকলে কোন সংসারী লোকের মনই তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। বরং শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ গৃহে এসে বাইরের বিতণ্ডা ও বিরক্তি ভুলতে পারা যায়।

আত্মীয়তা-ক্ষেত্র এত জটিল ও গভীর, এত রকম বাধাবাধকতাপূর্ণ ও দেনাপাওনাজড়িত যে সেখানে ভদ্রতার চেহারা ভাল ফোটানো যায় না, ও বেশী নীতির কাছঘেঁষা হয়ে পড়ে। ঘরের বাইরে অনাত্মীয় যে বিস্তৃত সমাজ প'ড়ে আছে, সেইখানেই ভদ্রতার যথার্থ রূপ ও কদর বোঝা যায়, সেইটেই তার প্রকৃত

কর্ম্মক্ষেত্র। কারণ, এই ভদ্রতা সেতু পার হয়ে তবে ত ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গতায় পৌঁছানো যায়—যদি কপালে থাকে।

ভদ্রতা বস্তুতঃ নীতিরাজ্যের সামান্য একটি অংশমাত্র হলেও তার গৌরব ও প্রয়োজনীয়তা কিছু কম নয়। কথা ও কার্য্য—এই দুই ক্ষেত্রে তাকে বিভক্ত করা যেতে পারে, এবং দুইয়েরই বিধিনিষেধ আছে। সেগুলি এত লোকবিশ্রুত, বাপমায়ে এত করে সেগুলি ছেলেদের মনে বসাবার চেষ্টা করেন যে, পুনরাবৃত্তি বাহুল্য। জানে শোনে সবাই সব, কিন্তু সব সময় কাজে পেরে ওঠে না, সেইটেই দুঃখের বিষয়। "পাঞ্চ" নামক বিলাতী হাসির কাগজে মজার কথাগুলি প্রায়ই এই দুই শিরোনামাঙ্কিত থাকে:- এক, "Things that had better been left unsaid" আর এক, "Things that ought to have been expressed otherwise" অর্থাৎ যা না বললে ভাল হ'ত, এবং যা অন্য রকমে বলা উচিত ছিল। ভদ্রতা সম্বন্ধে অনেক নিষেধ অধিকাংশ এই দুই শ্রেণীভুক্ত। এ বিষয়ে "সত্যং ব্রূয়াৎ" শ্লোকে যে লাখ কথার এক কথা বলা হয়েছে, তার উপর আর কিছু বলবার নেই। কার্য্যক্ষেত্রে ভদ্রতার এই রকম কোন মূলমন্ত্র আমাদের শাস্ত্রে আছে কিনা জানি না, তবে ইংরাজিতে যাকে ব্যবহারের "Golden rule" (বা সোনার কাঠি!) বলে, সেটা এস্থলেও খাটে। ছেলেবেলায় তার যে অনুবাদ শুনে হাসি পেত, সেটি এই: "নিজে ব্যবহৃত হ'তে চাহিবে যেমন, কর কর ব্যবহার অপরে তেমন!" এর ভাষা যেমনই হোক্, ভাব ঠিক আছে; এবং তার এই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, ছোটোখাটো বিষয়ে রীতিরক্ষা, এবং অন্যের যাতে সুবিধা, সাহায্য বা তৃপ্তিসাধন হয়, তাই করাই ভদ্রতা, ও তদ্বিপরীত করাই অভদ্রতা।

আমাদের রাজদরবার ছিল না বলে কিম্বা যে কারণেই হোক—ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালাদেশে সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের একটু অভাব লক্ষিত হয়। উচ্চ নীচ সম্বন্ধ ব্যতীত সমকক্ষ মেলামেশার সকল অবয়ব যেন এখানে সম্পূর্ণ নয়। অপর জাতের সঙ্গে ব্রাহ্মণের দেখা হলে সাধারণ অভিবাদনের কোন নির্দ্দিষ্ট রীতি; আত্মীয়া ভিন্ন অপর স্ত্রীলোককে সম্বোধন করবার কোন শিষ্ট প্রথা নেই। কিংবা আগে থাকলেও, এখন লোপ পেয়েছে। অন্যান্য বিষয়ে যেমন, এ সব বিষয়েও তেমনি, আমরা দায়ে পড়ে ইংরাজী সভ্যতার শরণাপন্ন হয়েছি। কিন্তু প্রত্যেক

খুঁটিনাটি বিষয়ে ইংরেজদের নকল করাটা, বিশেষতঃ সামাজিক ক্ষেত্রে, মোটেই শোভন বা বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য এতদূর এগিয়ে এসে হঠাৎ বেশী পিছিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। আমি একলা ঘরে ব'সে একটা মন-গড়া নিয়ম মানলেই ও থেকেও হল না। সমাজকে যদি নতুন দিতে চাই ত, সামাজিক অবস্থা বুঝে যা সয় সয় এমন নিয়মই চালাবার চেষ্টা করতে হবে। যা' কালের অতল বিস্মৃতিসাগরে চিরবিলুপ্ত, তীরে ব'সে ব'সে তাকে পুনরুদ্ধার করবার বৃথা চেষ্টায় সময় নষ্ট না করে এখনো যেটুকু অবশিষ্ট প্রচলিত আছে, সেটুকু যাতে নব্যভাবের সঙ্গে জড়িত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত।

আত্মীয়তার বাইরেই ভদ্রতার পূর্ণ প্রকাশ ও প্রয়োজনীয়তা যেমন, তেমনি সেই বাইরের সমাজে, আবার কথোপকথনের ক্ষেত্রেই তার চরম বিকাশ লক্ষিত হয়; কারণ, ক্ষণিক মেলামেশার সঙ্কীর্ণ অবকাশে পরস্পরের জন্য হাতে কলমে বিশেষ কিছু করবার সুযোগ কমই পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকদের পুরুষমানুষে যে সব ছোটখাটো সাহায্যগুলি করতে হয় ও কথায় ভদ্রতা দেখাতে হয়, পুরুষসমাজে পরস্পরের মধ্যে তারও বিশেষ আবশ্যক হয় না,—অবশ্য বয়সের বেশী তফাৎ না থাকলে। কিন্তু সমবয়সী ও সমকক্ষ পুরুষসমাজের কথোপকথন স্থলেও আমাদের কতকগুলি জাতীয় দোষ প্রকাশ পায়, যা সংশোধন করতে পারলেই ভাল। মেয়েরাও সে-দোষবর্জিত নয়। প্রথমতঃ আমরা প্রায় সকলেই বেশী চেঁচিয়ে কথা কই; দ্বিতীয়তঃ তর্কস্থলে আমরা অধিকাংশ লোকেই চটে গিয়ে কূটতর্ক, জিদ বা ব্যক্তিগত খোঁটার আশ্রয় নিই; তৃতীয়তঃ আমরা অন্যের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে অধীরভাবে মাঝে বাধা দিয়ে কথা বলি (হিত অথচ মনোহারী বাক্যের চেয়ে কি মনোযোগী অথচ সমজদার শ্রোতা বেশী দুর্লভ নয়?)। চতুর্থতঃ আমরা নিজের উপস্থিত ইচ্ছামত কথা ব'লে যাই, শ্রোতা বুঝে কথার বিষয় এবং মাত্রা নির্দ্ধারণ করিনে। আমার শরীরের অসুখ বা আমার মনের ভাবনার বিস্তারিত বিবরণ যে সকলের রুচিকর না বোধ হ'তে পারে সে কথা ভুলে যাই এবং অন্যকে কথা বলবার বা মতামত ব্যক্ত করবার অবসর দিইনে।

ফলে দাঁড়ায় এই যে, সকলে একসঙ্গে বলে, কিন্তু কেউ শুনে না'—কিংবা ইংরাজিতে যাকে বলে 'oneman-show' তাই হয়, অর্থাৎ একজন-মাত্র বক্তা, আর সকলে শ্রোতা। অথচ প্রকৃত সর্বাঙ্গীণ আলোচনা বা

সমালোচনাই সামাজিক মেলামেশার প্রধান সুখ ও সার্থকতা। পঞ্চমতঃ আমরা জেনে শুনে এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করি যা উপস্থিত লোকের পক্ষে অপ্রীতিকর। অথবা এমন করে কথা বলি যাতে তাদের কারো মনে লাগতে পারে—ভাষায় যাকে বলে "ঠেস দিয়ে কথা বলা";—দরকার কি? ভদ্রতা যদি নীতি না হয় ত ভদ্রসমাজও নীতি উপদেশ বা শাসনদণ্ডের স্থান নয়। বেশী শাসন করতে চাও সমাজ থেকে তাড়াও, কিন্তু যে যতক্ষণ সমাজে আছে তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার কর। অভদ্রতা না করেও বোধ হয় একজনকে বোঝানো যায় যে তাকে আমার বড় পছন্দ নয়, এবং সময়ে সময়ে তা বোঝানো আবশ্যকও হয়ে পড়ে; কিন্তু এগুলি ভদ্রতার ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়ম নয়। আত্মীয়তার স্থলে ভালবাসার অভাব ভদ্রতায় পূর্ণ করা শক্ত বটে, কিন্তু অনাত্মীয়ক্ষেত্রে ভদ্রতা, বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ক্ষণকালের জন্যও ভূষিত হওয়া ত সহজ বলেই বোধ হয়। পর যখন এত অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়, তখন সেটুকু তার জন্য না করাটাই আশ্চর্য, করায় কিছু বাহাদুরী নেই। অর্থ বা মানের দম্ভে যাঁরা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন ও মানুষকে মানুষ জ্ঞান করেন না, তাঁরা ভুলে যান যে মানুষ নইলে মানুষের একদিনও চলে না এবং চিরদিন কারো সমান যায় না।

পরিশেষে আবার বলি যে, ভদ্রতা সর্ব্বরোগের মহৌষধ না হ'লেও, এবং তার প্রসার বা গভীরতা বেশী না থাকলেও, তা ঘরে বাইরে অতি আবশ্যকীয় উপাদেয় জিনিস, এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য,—শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। এক দিনের জন্যও যদি ভদ্রতা সমাজ থেকে ছুটি নেয় তাহ'লে কি ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হয়, তা মনে করতেও কি হৃৎকম্প হয় না? এক হিসেবে ভদ্রসমাজের সকলেই যেন একটি পাৎলা বরফখণ্ডের উপর নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে,—পায়ের তলায় একটু ভাঙ্গলেই অতল জলে মজ্জমান হবার সম্ভাবনা;—কিন্তু ভাগ্যক্রমে সহজে ভাঙ্গে না। এই ধূলিম্লান পৃথিবীর রুক্ষতাকে মোলায়েম ক'রে এনে দৈনিক জীবনযাত্রার যাতে একটু শ্রী সম্পাদন করতে পারি, সকলেরই কি সেই চেষ্টা করা উচিত নয়? যদি কেউ এর আনুষ্ঠানিক কর্ত্তব্য থেকে রেহাই পেতে পারে ত সে কেবল সেই সকল অসাধারণ লোক, যাঁরা এমন কোন বৃহৎ কাজ বা মহৎ চিন্তায় লিপ্ত আছেন যাতে সমাজের ছোটোখাটো আদেশ পালন করবার সময় পাওয়া অসম্ভব এবং সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকতে হয়;—যাঁরা সংসারে থেকেও সংসার ও সমাজকে অতিক্রম করেছেন। শুধু ভদ্রতার দ্বারা বড় কাজ কিছু হবে না সত্য, কিন্তু

ছোট নিয়েই ত আমাদের অধিকাংশের অধিকাংশ জীবনের কারবার,—ছোট কাজ ছোট কর্ত্তব্য, ছোট সুখ, ছোট দুঃখ। আমাদের বড় বড় ঋষিরাও ত প্রার্থনা করেছিলেন—"যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।" যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ, তাহাই আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।

—ইন্দিরা দেবী

UNIVERSITY
BENGALI SELECTIONS

ABRIDGED EDITION

UNIVERSITY OF CALCUTTA
1972

Rs. 2·50

UNIVERSITY BENGALI SELECTIONS

ABRIDGED EDITION

UNIVERSITY OF CALCUTTA
1972

সূচী

পদ্যাংশ

গদ্যাংশ

UNIVERSITY BENGALI SELECTIONS

পদ্যাংশ

ফুল্লরার বারমাস্যা

ধীরে ধীরে কহে রামা, যত দুঃখ বাণী।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর, তালপাতের ছাউনি।।
ভেরেণ্ডার থাম ওই আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।।
বৈশাখে অনল সম বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা।।
পা পোড়ায় খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞ্চার বসন।।
বৈশাখ হৈল বিষ গো, বৈশাখ হৈল বিষ।
মাংস নাহি খায় সর্ব্বলোক নিরামিষ।।

পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন।
রবিকর করে সর্ব্ব শরীর দহন।।
পসরা এড়িয়া জল খাইতে যাইতে নারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে লয় আধা-সারি।।
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস, পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস।
বঁইচির ফল খেয়ে করি উপবাস।।

আষাঢ়ে পূরিল মহী নব-মেঘে জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল।।
মাংসের পসরা লইয়া ফিরি ঘরে ঘরে।
কিছু খুদ কুঁড়া পাই, উদর না ভরে।।
কি কহিব দুঃখ মোর কহনে না যায়।
কাহারে বলিব বল দোষী বাপ মায়।।

শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবসরজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।।
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী।।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
লঘু বৃষ্টি হইলে কুড়েতে আইসে বান।।

ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
নদনদী একাকার আট দিকে জল।।
কিরাতনগরে বসি না মিলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি যেবা সহে ভার।।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় ভাসিয়া যায় বান।।

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে।
ছাগ মেষ মহিষ দিয়া বলিদানে।।
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।।
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ-মাংস সবাকার ঘরে।।

ফুল্লরার বারমাস্যা

কার্ত্তিক মাসেতে হইল হিমের জনম।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।।
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।।
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।
পিয়াণ দোপাটা দিতে করে টানাটানি।।

মাসমধ্যে মার্গশীর্ষ আপনি ভগবান্।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান।।
উদর ভরিয়া অন্ন দিল বিধি যদি।
যম সম শীত তাহে নির্ম্মল বিধি।।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।।

পৌষে প্রবল শীত, সুখী জগজনে।
তৈল তুলা তনুনপাৎ তাম্বুল তপনে।।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।
অভাগী ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন।।
হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা।
পরিতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধুলা।।
বৃথা বনিতাজনম, বৃথা বনিতাজনম।
ধূলিভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন।।

মাঘ মাসে অনিবার সদাই কুজ্ঝটী।
আঁধারে লুকায় মৃগ না পায় আখেটী।।
ফুল্লরার আছে যত কর্ম্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক।।

নিদারুণ মাঘ মাস, নিদারুণ মাঘ মাস।
সর্ব্বজন নিরামিষ কিংবা উপবাস।।

সহজে শীতল ঋতু ফাল্গুন মাসে।
পোড়য়ে যুবতীগণ বসন্ত বাতাসে।।
কত না ভুগিব আমি নিজ কর্ম্মফল।
মাটিয়া পাথর বিনা না আছে সম্বল।।
শুন মোর বাণী রামা, শুন মোর বাণী।
কোন সুখে মোর সনে হইবে ব্যাধিনী।।

মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ।।
অনলসমান পোড়ে চইত্তের খরা।
চালু সেরে বাঁধা দিনু মাটিয়া পাথরা।।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান।।

ফুল্লরার কথা শুনি কহেন পার্ব্বতী।
আজি হৈতে দূর হৈল সকল দুর্গতি।।
আজি হৈতে মোর ধনে আছে তোর অংশ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গান ভৃগুবংশ।।

—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

বীরবাহুর পতনে

সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি, অমৃতভাষিণি!
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলা-বিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন-কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি।
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক! ঊর তবে ঊর, দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত : ঊরি দাসে দেহ পদচ্ছায়া।

কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল-কুল-মান এ কাল-সমরে!
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলিশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায় শূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে তোর দুঃখে দুঃখী
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায়, ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুম-দাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;

তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে করিতে বাস বাসনা আঁধারে?"

এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ। হায় রে, মরি, যথা
হস্তিনার অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয় পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।

তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে,—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে।
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"

উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি ;—
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ! জানি হে আমি, এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল-হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,

যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"
এতেক কহিয়া রাজা দূত পানে চাহি,
আদেশিলা,—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?"

প্রণমি রাজেন্দ্র-পদে করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত,—"হায়, লঙ্কাপতি!
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীর-কুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে।
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে,
সিংহনাদে, জলধির কল্লোলে; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে!
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর!
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথসহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে; বিদ্যুৎঝলাসম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে
শনশনে! ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি কে পারে গণিতে?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কতক্ষণ পরে

প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব;
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,—" এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্ব্বদুঃখ। সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরী-মনোহর ;—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিল
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ ?"

"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত ,—"কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি।
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীমদন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে, চৌদিকে এবে সমরতরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ুসহ
নির্ঘোষে। ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু, অম্বুরাশিরবে!—
আর কি কহিব, দেব? পূর্ব্বজন্ম-দোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি। হায়, রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈম লঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহুসহ
রণভূমে, কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে, পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"

এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা;—"সাবাসি দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী
কভু কি অলসভাবে নিবসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী! চল, সবে,
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্‌জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চল দেখি জুড়াই নয়নে।"

—মধুসূদন দত্ত

ঐকতান

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্ত্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন,
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক
রয়ে গেছে ফাঁক।
কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা-একতান
কত না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।
দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়,
আমার অন্তরে বারবার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।
দক্ষিণ মেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহাজনশূন্যতায় রাত্রি তার করিতেছে সারা,
সে আমার অর্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে।
সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর
মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্বর।
প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানাদিক্ হ'তে—
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ;
গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ—
নিখিলের সংগীতের স্বাদ।।

সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,

বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল ;—
বহুদূর-প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্ম্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্ব্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হ'লে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্ব্বত্রগামী।।

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্ম্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা ক'রেছে অর্জ্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি' কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারিনি দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।।
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজদুরি।
এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্ব্বাক মনের
মর্ম্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।

প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাওতো উদ্ধারি'।

সাহিত্যের ঐকতান-সংগীত-সভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি ;—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বারাণসী

যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল—'দেখা যায় বারাণসী।'
চমকি চাহিনু, স্বর্গ-সুষমা মর্ত্যে প'ড়েছে খসি'।
এ পারে সবুজ যজবার ক্ষেত, ও পারে পুণ্য-পুরী,
দেবের চৌপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ-ঝুরি;
শারদ দিনের কনক আলোকে কিবা ছবি ঝলমল,—
অযুত যুগের পূজা-উপচার,—হেম চম্পকদল!

আধ-চাঁদখানি রচনা করিয়া গঙ্গা রয়েছে মাঝে,
স্নেহ-সুশীতল হাওয়াটি লাগায় তপ্ত-দিনের কাজে।
জয়! জয়! বারাণসী!
হিন্দুর হৃদি-গগনের তুমি চির-উজ্জ্বল শশী।

অগ্নিহোত্রী মিলেছে হেথায় ব্রহ্মবিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে।
এই সেই কাশী ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিল এইখানে,
খ্যাত যাঁর নাম শাক্যমুনির জাতকে, গাথায়, গানে ;—
যাঁর রাজত্ব-সময়ে বুদ্ধ জন্মিলা বার বার ;
ন্যায়-ধর্ম্মের মর্য্যাদা প্রেমে করিতে সমুদ্ধার।
এই সেই কাশী—ভারতবাসীর হৃদয়ের রাজধানী,
এই বারাণসী জাগ্রত চোখে স্বপন মিলায় আনি'!

এই পথ দিয়া ভীষ্ম গেছেন ভারত-ধুরন্ধর—
কাশী-নরেশের কন্যারা যবে হইল স্বয়ংবর।
সত্য পালিতে হরিশ্চন্দ্র এই কাশীধামে, হায়,
পুত্র-জায়ার বিক্রয় করি' বিকাইলা আপনায়।
তেজের মূর্ত্তি বিশ্বামিত্র সাধনায় করি' জয়—
হেথা লভিলেন তিন'টি বিদ্যা সৃষ্টি, পালন, লয় ;
নিদায় যিনি জ্যোতির পুঞ্জ করিলেন সমাহার,—
নূতন স্বর্গ করিলেন যিনি আপনি আবিষ্কার।

শুদ্ধোদনের স্নেহের দুলাল ত্যজিয়া সিংহাসন
করুণা-ধর্ম্ম হেথায় প্রথম করিলা প্রবর্ত্তন।
এই বারাণসী কোশল-দেবীর বিবাহের যৌতুক—
দেখিতেছি যেন বিম্বিসারের বিস্মিত স্মিত-মুখ!

নৃপতি অশোকে দেখিতেছি চোখে বিহারের পৈঠায়,
শ্রমণগণের আশিস্-বচনে প্রাণ মন উথলায়।
সমুখে হাজার স্থপতি মিলিয়া গাড়িছে বিরাট স্তূপ,
শত ভাস্কর রচে বুদ্ধের শত জনমের রূপ।
চিরণ চারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী
ধর্ম্মাশোকের মৈত্রী-বরণ অনুশাসনের লিপি!
মহাচীন হতে ভক্ত এসেছে মৃগদাব-সারনাথে,
স্তূপের গায় চিত্র করিছে সূক্ষ্ম সোনার পাতে।
জয়! জয়! জয় কাশী!
তুমি এসিয়ার হৃদয়-কেন্দ্র, মূর্ত্ত ভক্তিরাশি!

এই কাশীধামে ভক্ত তুলসী লিখেছেন রামকথা,
ভক্তি যাঁহার অপ্রমত্ত প্রভুপদে সংযতা।
এই কাশীধামে জোলাদের ছেলে কবীর রচিল গান,
যাঁহার দোঁহায় মিলেছিল দুই হিন্দু মুসলমান।
এই কাশীধামে বাঙ্গালীর রাজা মরেছে প্রতাপ রায়,
যার সাধনায় নবীন জীবন জেগেছিল বাংলায়।
মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই শুধু শিব!
মনে লয় মোর হেথা একদিন মিলিবে নিখিল জীব,
আত্মার সাথে হবে আত্মার নবীন আত্মীয়তা,
মিলনধর্ম্মী মানুষ মিলিবে, নহে এ স্বপ্নকথা।
জয় কাশী! জয়! জয়!
সারা জগতের ভক্তি-কেন্দ্র হবে তুমি নিশ্চয়!

স্ফটিক-শিলার বিপুল-বিলাস মাত্র নহ তো তুমি,
আমি জানি তুমি আনন্দধাম ছুঁয়ে আছ মরুভূমি,
আমি জানি তুমি ঢাকিয়াছ হাসি ভ্রূকুটির মসীলেপে,
অমৃত-পাত্র লুকায়ে রেখেছ সময় হয়নি ভেবে ;
তৃষিত জগৎ খুঁজিতেছে পথ, ডেকে লও, বারাণসি!
পথিকের প্রীতে প্রদীপ জ্বালিয়া কেন আছ দূরে বসি?

মধু-বিদ্যায় বিশ্ব-মানব দীক্ষিত কর আজ,
ঘুচাও বিরোধ, দম্ভ ও ক্রোধ, ক্ষাত, ক্ষোভ, ভয়, লাজ।
সার্থক হ'ক সকল মানব, জয়ী হ'ক ভালবাসা,
সংস্কারের পাষাণ-গুহায় পচুক কর্মনাশা।

ব্যাসের প্রয়াস ব্যর্থ সে কভু হবে নাকো একেবারে,
সবারেই দিতে হবে গো মুকতি এ বিপুল সংসারে।
তুমি কি কখনো করিতে পার গো শুচি-অশুচির ভেদ?
তুমি যে জেনেছ চরাচর-ব্যাপী চিরজনমের বেদ।
স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম অবধি অভেদ বলেছ তুমি,—
ভেদের গণ্ডী তুমি রাখিয়ো না, অয়ি বারাণসী ভূমি!
ঘোষণা করেছ আশ্রয়ে তব ক্ষুধিত রবে না কেহ;—
প্রাণের অন্ন দিবে না কি হায়? কেবলি পুষিবে দেহ?

দাও সুধা দাও, পরাণের ক্ষুধা চিরনিবৃত্ত হোক্,
বিশ্বনাথের আকাশের তলে মিলুক সকল লোক।
অখিল জনের হৃদয়ে রাজ্য কর তুমি বিস্তার,
সকল নদীর সকল হৃদির হও তুমি পারাবার।
পর যে মন্ত্রে আপনার হয় সে মন্ত্র তুমি জানো,
বিমুখ বিরূপ জগত জনেরে মুগ্ধ করিয়া আনো।
বিচিত্র মালা কর বিরচন নানা বরণের ফুলে,
অবিরোধে লোক সার্থক হোক্ পাশাপাশি মিলেজুলে
দূর ভবিষ্য নিখিল বিশ্ব যে ধনের আশা করে—
তুমি বিতরিয়া দাও সে অমৃত জগত-জনের করে।
জয়! বারাণসী জয়!
অভেদ-মন্ত্রে জয় কর তুমি জগতের সংশয়।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ইন্দ্রপতন

তখনো অস্ত যায়নি সূর্য্য, সহসা হইল সুরু
অম্বরে ঘন ডম্বরু-ধ্বনি গুরু গুরু গুরু গুরু!
আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন্ ইন্দ্রের আগমনী?
শুনি, অম্বুদ-কম্বু-নিনাদে ঘন বৃংহিত ধ্বনি।
বাজে চিত্রুর-হ্রেষা-হর্ষণ মেঘ-মন্দুরা-মাঝে,
সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলয়ঙ্কর সাজে!

ঘনায় অশ্রু-বাষ্প-কুহেলি ঈশান-দিগন্তনে
স্তব্ধ বেদনা দিগ্-বালিকারা কি যেন কাঁদনি শোনে!
কাঁদিছে ধরার তরু, লতা, পাতা, কাঁদিতেছে পশুপাখী,
ধরার ইন্দ্র স্বর্গে চলেছে ধূলির মহিমা মাখি!

বাজে আনন্দ-মৃদং গগনে, তড়িৎ-কুমারী নাচে,
মর্ত্ত্য-ইন্দ্র বসিবে গো আজ স্বর্গ-ইন্দ্র-কাছে!
সপ্ত-আকাশ-সপ্তস্বরা হানে ঘন কর-তালি,
কাঁদিছে ধরায় তাহারি প্রতিধ্বনি—খালি, সব খালি।

হায় অসহায় সর্ব্বংসহা মৌনা ধরণী মাতা,
শুধু দেব-পূজা তরে কি মা তোর পুষ্প, হরিৎ-পাতা?
তোর বুকে কি মা চির-অতৃপ্ত রবে সন্তান-ক্ষুধা?
তোমার মাটির পাত্রে কি গো মা ধরে না অমৃত-সুধা?

জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে-কেহ আনিবে অমৃত-বারি
অমৃত-অধিপ দেবতার রোষ পড়িবে কি শিরে তারি?
হয়ত তাহাই, হয়ত নহে ত—এটুকু জেনেছি খাঁটি,
তারে স্বর্গের আছে প্রয়োজন যারে ভালোবাসে মাটি!

কাঁটার মৃণালে উঠেছিল ফুটে যে চিত্ত-শতদল,
শোভেছিল যাহে বাণী-কমলার রক্ত-চরণ-তল,
সম্ভ্রমে নত পূজারী মৃত্যু ছিঁড়িল সে শতদলে
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অর্পিবে বলি' নারায়ণ-পদতলে!

জানি জানি মোরা, শঙ্খ চক্র গদা যার হাতে শোভে—
পায়ের পদ্ম হাতে উঠে তাঁর অমর হইয়া র'বে।
কত সান্ত্বনা আশা-মরীচিকা কত বিশ্বাস-দিশা
শোক-সাহারায় দেখা দেয় আসি', মেটে না প্রাণের তৃষা!

আজ শুধু জাগে তব অপরূপ সৃষ্টি-কাহিনী মনে,
তুমি দেখা দিলে অমিয়-কণ্ঠ বাণীর কমল-বনে।
কখন্ তোমার বীণা ছেয়ে গেল সোনার পদ্ম-দলে,
হেরিনু সহসা ত্যাগের তপন তোমার ললাট-তলে।

লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বাণী,
শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি কণ্ঠে গরল দানি',
বিষ্ণু দিলেন ভাঙ্গনের গদা, যশোদা-দুলাল বাঁশী,
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর, মৃগাঙ্ক দিল হাসি।

চীর গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারত-জননী কাঁদি'
প্রতাপ শিবাজী দানিল মন্ত্র দিল উষ্ণীষ বাঁধি'!
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারা দিল মন্দার-মালা, মানব মাখালো ধূলি।

নিখিল চিত্তরঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি'—
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্ম্মী, জ্ঞানী!
হিমালয় হ'তে বিপুল বিরাট, উদার আকাশ হ'তে,
বাধা-কুঞ্জর তৃণসম ভেসে গেল তব প্রাণস্রোতে!

ছন্দোগানের অতীত হে ঋষি, জীবনে পারিনি তাই
বন্দিতে তোমা', আজ আনিয়াছি চিত্ত-চিতার ছাই--
বিভূতিতিলক! কৈলাস হ'তে ফিরেছ গরল পিয়া,
এনেছি অর্ঘ্য শ্মশানের কবি ভস্মবিভূতি নিয়া।

নাও অঞ্জলি, অঞ্জলি নাও, আজ আনিয়াছি গীতি
সারা জীবনের না-কওয়া-কথার ক্রন্দন-নীরে তিতি'।
এত ভালো মোরে বেসেছিলে তুমি, দাওনিক অবসর
তোমারেও ভালোবাসিবার, আজ তাই কাঁদে অন্তর!

তোমারে দেখিয়া কাহারও হৃদয়ে জাগেনিক সন্দেহ--
হিন্দু কিংবা মুসলিম তুমি অথবা অন্য কেহ।
তুমি আর্ত্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি,
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি!

হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজিব,
যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শিব!
নিন্দা গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া, বাউল, মিলন-হেতু
হিন্দু মুসলমানের পরাণে তুমিই বাঁধিলে সেতু!

জানি না আজিকে কি অর্ঘ্য দেবে হিন্দু মুসলমান,
ঈর্ষা পঙ্কে পঙ্কজ হ'য়ে ফুটুক এদের প্রাণ!
হে অরিন্দম, মৃত্যুর তীরে ক'রেছ শত্রু জয়,
প্রেমিক! তোমার মৃত্যু-শ্মশান আজিকে মিত্রময়!

তাই দেখি, যারা জীবনে তোমায় দিল কণ্টক-হুল,
আজ তাহারাই এনেছে অর্ঘ্য নয়ন-পাতার ফুল!
কে যে ছিলে তুমি জানিনাক কেহ দেবতা কি আউলিয়া,
শুধু এই জানি, হেরে আর কারে ভরেনি এমন হিয়া।

* * *

অসুর নাশিনী জগন্মাতার অকাল উদ্বোধনে
আঁখি উপাড়িতে গেছিলেন রাম, আজিকে পড়িছে মনে,
রাজর্ষি! আজি জীবন উপাড়ি' দিলে অঞ্জলি তুমি,
দনুজ-দলনী জাগে কিনা—আছে চাহিয়া ভারতভূমি।

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

গৌরচন্দ্রিকা

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব।।
কি পেখলু নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম- কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর।।
চঞ্চল চরণ- কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর।।
অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরণে
অখিল-মনোরথ পুর।
তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর।।

—গোবিন্দদাস

দীপ-শিখা

তপন যখন অস্ত-মগন ভুবন-ভ্রমণ-শেষে,
আমি তপনের স্বপন দেখি গো, পথিক-বধূর বেশে।
শয্যা পেতেছে মোর জ্বালিয়া অনল,
এলাইয়া দিই ধূম-কুন্তল,
কালো-অঞ্চল ছায়া হয়ে লোটে চরণের তলদেশে,
মোর দেহময় দাহনের জয় তপনের উদ্দেশে।

মাটির বাটিতে স্নেহরস শুষি', বৃন্ত সে বর্ত্তিকা
ফুটায় হরষে তিমির-তোষিণী চম্পা রূপিণী শিখা ;
বৃন্ত বাহিয়া যত স্নেহরস
যোগায় আমার জ্বালার হরষ—
আমি তৃষিতের প্রাণের নিশীথে বাসনা-বাসন্তিকা।
ধূম নয়, সে যে অলি-লাঞ্ছন কাঞ্চন মল্লিকা।

আলোকের লাগি' আঁধার-প্রাচীরে নিশা মরে মাথা কুটে
আমি সে ললাটে রক্তের ফোঁটা দিকে দিকে উঠি ফুটে।
কালোর অঙ্গে আলোকের ক্ষত—
সারারাত জাগি নিমেষ-নিহত,
জাগর রক্ত আঁখির কাজল অশ্রুতে নাহি টুটে,
যত সে জ্বলুক, কালিটুকু থাকে লাগিয়া অক্ষিপুটে।

*　　　*　　　*

দিক্-অঙ্গনা গগনাঙ্গনে ফুল্কির ফুল গাঁথে—
অবোধ বনানী তাই হেরি' পরে জোনাকির হার মাথে!
মিছা মায়া সেই আলোর কণিকা,
মিছা হাসি হাসে আঁধার-গণিকা—
রক্ত-বিহীন পাণ্ডুর ভাতি, তাপ নাই তার সাথে,
বিদ্রূপ করে সখের দীপালি সুপ্ত দিবস-রাতে!

আমি যামিনীর নীল অঞ্চলে আগুনের ফুল বুনি,
আমি আঁধারের বুকের বাঁ ধারে হৃৎস্পন্দন শুনি!
দিবা পুড়ে মরে স্বামীর চিতায় -
আমি ছিনু তব সিঁদুর সিঁথায়,
জ্বলে উঠে শুনি ভর সন্ধ্যায় ঝিঁঝির ঝুনঝুনি,
আমি নববধূর কাল-রাত্রির আয়ুর প্রহর গুণি।

আমি দীপ শিখা—আলোক-বালিকা—বসি ঘরে বাতায়নে,
দূর প্রান্তরে আলেয়া-ডাকিনী মিলায় আঁধার সনে,
নিশার দুলাল প্রেত কবন্ধ
নৃত্য অমনি করে যে বন্ধ!
উদ্গত-পাখা পিপীলিকা মরে রূপশিখা-চুম্বনে।
আমি বহ্নির তন্বী কুমারী তপনেরে জপি মনে!

আমি নিয়ে যাই অধীরা বধূরে অচেনার অভিসারে,
দেব-আয়তনে আরতি করি গো প্রেমহীন দেবতারে।
আমি কালো চোখে পরাই কাজল,
বাসর নিশটি করি যে উজল,
আমি চেয়ে থাকি অনিমিখ-আঁখি মরণ-শয়নাগারে;
প্রলয় ঘটাই, তবু নিবে যাই মলয়ের ফুৎকারে!

—মোহিতলাল মজুমদার

———

নব নিদাঘ

অঙ্গে আমার লেগেছে রে আজ নব নিদাঘের ঘোর।
ওরে মন, আজ সাঙ্গ করিয়া সকল কর্ম্ম তোর।
বিছায়ে দে মোর শিথিল শরীর শুধু আঁচলের প্রায়;
চেয়ে থাক্ দূরে, অর্ধ শয়নে আধখোলা জানলায়।

দুপুর বেলার রূপালি রৌদ্রে ফুলদল পড়ে নুয়ে,
মৌমাছিগুলি গুঞ্জন তুলি' উড়ে যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘেরিয়া গুমট করিয়া আছে,
অমনি গান কি গন্ধের মতো ঘুরে বেড়া মোর কাছে!

দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র ঝিঁঝির পাখার মত,
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি' কে হাপরে ফুঁ দিতেছে অবিরত?
দিকে দিকে দিকে, জানি না কি পাখী হাতুড়ি ঠুকিছে ডালে
কোন্ রূপসীর স্বপ্ন-মেখলা গাড়িছে বিশ্বশালে?

কালো দীঘিজলে গাহন করিতে নেমেছে গাছের ছায়া,
নিদ্রিত মাঠে নির্জ্জন ঘাটে জাগিছে এ কার মায়া?
মরীচিকা চাহি' শ্রান্ত পথিক ফুকারে ফটিক জল,
অঙ্গে আলস আসে জড়াইয়া ছাড়ে না অশথতল।

আজিকে বিশ্ব কি মধুমধুর মদির নেশায় ভোর!
মাথায় তাহার ঘুরিছে হাজার ঘূর্ণি হাওয়ার ঘোর।
বাসনা তাহার মরীচিকা হ'য়ে আঁকা পড়ে দূর পটে;
কল্পনা তার গুন গুন ক'রে অলিগুঞ্জনে রটে।

শীতল শিলায় শ্রান্তি বিছায়ে শিথিল অঙ্গ রেখে,
নিমীল নয়নে মলিন বিরহ মিলনস্বপন দেখে।
সুদূর অতীত কাছে আসে আজ গোপন সেতু বাহি'।
অদেখা অগম দাঁড়ায়েছে যেন মোর মুখপানে চাহি'!

এসেছে তাহারা দিগন্ত-হারা সাহারা-প্রান্ত হতে,
এসেছে রে কারা কোন্ বসোরার খর্জ্জুরবীথিপথে,
কত বেদুয়িন্ পার ক'রে মরু দীপ্ত অগ্নিঢালা,
নামায় আমার হৃদয়ের হাটে তরুণী ইরাণী বালা!

মর্ম্মরে গাঁথা মর্ম্মবেদীতে, কে পাতি' পদ্মপাতা,
পত্রলেখায় লিখিতে অঙ্গ ঘুমে ঢুলে' পড়ে মাথা!
আঁখি মুদে একা প'ড়ে আছি এই সুখস্মৃতিঘেরা নীড়ে,
প্রাণ ভ'রে যায় চেনা অচেনার মিলনমধুর ভিড়ে'

বেলা প'ড়ে আসে, বধূ চলে ঘাটে ভরিতে সাঁঝের জল,
পথপাশে তরু গায়ে তুলে নিল চ্যুত ছায়া-অঞ্চল'
শ্মশানেতে নিয়ে চলে মোরে নিদাঘনিশীথ ঘোর
ওরে মন আয়, ছিঁড়ে ফেলে আয় সকল কর্ম্ম-ডোর।

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বিড়াল

(শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর উক্তি)

আমি শয়ন গৃহে চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা-হাতে ঝিমাইতে ছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেওয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এ জন্য হুঁকা-হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না? এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল 'মেও'।

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট আফিঙ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে পাষাণবৎ কঠিন হইয়া বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, 'মেও'।

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে, একটি ক্ষুদ্র মার্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে,—আমি ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই; এক্ষণে মার্জার-সুন্দরী নির্জ্জল দুগ্ধ-পানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, 'মেও'। বলিতে পারি না, বুঝি তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি মার্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল সেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে 'মেও' শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায়

করিয়াছিল! বুঝি বিড়ালের মনের ভাব—'তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি, এখন বল কি?' বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না, দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই, সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়াল দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গারস্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতর চিত্তে হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া একটু সরিয়া বসিল। বলিল, 'মেও!' প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারীর বক্তব্য সকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে, আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিয়া আমার বোধ হয় তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল। অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভাগী—আমি চুরিই করি আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্ম-সঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ।

অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী।

"দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত নর্দ্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে? হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখনও অন্ধকে মুষ্টিভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোট-লোকের দুঃখে কাতর? ছি! কে হইবে?

"দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড় হাত করিয়া বলিতে, 'আর একটু কি আনিয়া দিব?' তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি বড় পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তাহা তো নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!

"দেখ, আমাদের দশা দেখ। দেখ, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদের মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের

সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহ-মার্জ্জার হইয়া মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি।

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, মেও! মেও! খাইতে পাই না। আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস্য-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার-সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাওয়ার পর যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম! মার্জ্জার-পণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক, সমাজ-বিশৃঙ্খলার মূল। যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধন সঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধন-সঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজে ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জ্জারী বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের ক্ষতি কি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।

বিড়াল রাগ করিয়া বলিল, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বিড়ালকে বুঝানো দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্‌কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জ্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব

ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন; অতএব চোরের দণ্ড বিধান কর্ত্তব্য।"

মার্জ্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে কাহারও ভাণ্ডার-ঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারীকে বলিলাম, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। মন হইতে এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর। প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে; জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না, বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষাভর আফিঙ দিব।"

মার্জ্জার বলিল, "আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জ্জার বিদায় হইল।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র

যেকালে বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলাদেশের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।

সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল। এবং ক্ষুদ্র যে লেখক-সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত, তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

আবার এখনকার যে নূতন পাঠক- ও লেখক সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্যভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু বর্তমান লেখকের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় তখন সাহিত্য পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনোরূপ পূর্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই এবং বর্তমান কালের নূতন ভাবস্রোতও আমাদের নিকট অপরিচিত ও অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গসাহিত্যেরও যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।

পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা একমুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালকভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম

র্ষার মতো সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ। এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাতকলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম; সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিয়াছিলাম— সেই জন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। মনে হয় সেদিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল তদনুরূপ ফললাভ করিতে পারি নাই। সে জীবনের বেগ আর নাই। কিন্তু এ নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কখনো স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব আনন্দ নবীন আশার স্মৃতির সহিত বর্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে রাগিণীতে বংশীধ্বনি হয় সে রাগিণী চিরদিনের নহে। সেদিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্তব্য, মিশ্রিত দুঃখসুখ, ক্ষুদ্র বাধাবিঘ্ন, আবর্তিত বিরহমিলন— তাহার পর হইতে গভীর গম্ভীরভাবে নানাপথ বাহিয়া নানা শোকতাপ অতিক্রম করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিদিন আর সে নহবত থাকিবে না। তথাপি সেই একদিনের উৎসবের স্মৃতি কঠোর কর্তব্যপথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যেদিন নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন সেইদিনের সর্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ-উৎসব আমাদের মনে আছে। সেদিন আর নাই। আজ নানা লেখা নানা মত নানা আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ কোনোদিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে, কোনোদিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এইরূপই হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল সে কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণকর্তা বলিয়া আমরা জানি না। কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা,

কী সমাজ, কী ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক। যখন নবশিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃতপ্রায় বেদপুরাণতন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ অদ্য এই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না।

রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন-দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে, এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।

মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙালীর যে কী মহৎ কী চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে-কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা আর দুর্ভাগ্য কিছুই নাই। তৎপূর্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরেজি পণ্ডিতেরা বর্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলাভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা যাইতে পারে সে-কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এইজন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকের জন্য অনুগ্রহপূর্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠযোগ্যতা সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা রেভরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত এন্ট্রান্স-পাঠ্য বাংলাগ্রন্থে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সংকুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তখনকার কালে কী যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরেজিতে দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরেজি সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালির মতো বালির বাঁধ নির্মাণ করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কী হইতে পারে? সম্পূর্ণ ক্ষমতা সত্ত্বেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাঁহাদের নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া একটি অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা উদ্যম ক্ষমতাকে প্রেরণ করা কত বিশ্বাস এবং কত সাহসের বলে হয় তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্বে সেই অনাদর মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

তখন, পূর্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন তাঁহারা বঙ্গভাষার যৌবন সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমতঃ, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোন আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, সেখানে আপন

ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্বদা সম্মুখে বর্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতি লাভের প্রলোভন সংবরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম। চতুর্দিক্‌ব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মতো এমন গুরুভার আর কিছু নাই; তাহার নিয়তপ্রবল ভারাকর্ষণশক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম তাহা এখনকার সাহিত্যব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন। তখন যে আরো কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভাবলে যে কার্য করিলেন তাহা অত্যাশ্চর্য। বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদবর্গের কত ঊর্ধ্বে সমুত্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে। একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাঁহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব অভ্যাসবশতঃ সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরো কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোকে যে একলম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই; লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখনো দাঁড়াইয়া

যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর-একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিমচন্দ্র একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানের যে ফল তাহাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচকপদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। এবং কল্পনাপ্রবণ লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোটো ছোটো দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন বর্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এইজন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোনোদিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব করিতে হয় নাই।

নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া গ্রাম্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। এই প্রগল্‌ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক কখনো সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীর ভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে, উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য

এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল সুসংগতি নহে, সুরুচি এবং শিষ্টতার সীমা নির্ণয় করিতেও একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তির আবশ্যক। মাঝে মাঝে অনেক বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে সেই বোধশক্তির অভাব দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভায় বল এবং সৌকুমার্যের একটি সুন্দর সংমিশ্রণ ছিল। নারীজাতির প্রতি যথার্থ বীর-পুরুষের মনে যেরূপ একটি সসম্ভ্রম সম্মানের ভাব থাকে তেমনই সুরুচি এবং শীলতার প্রতি বঙ্কিমের বলিষ্ঠ বুদ্ধির একটি ভদ্রোচিত বীরোচিত প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্কিমের রচনা তাহার সাক্ষ্য। বর্তমান লেখক যেদিন প্রথম বঙ্কিমকে দেখিয়াছিল, সেদিন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচিপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজাপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়ুনিয়ন নামক মিলনসভা বসিয়াছিল। ঠিক কতদিনের কথা ভালো স্মরণ নাই কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারও পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনোরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে প্রথম-দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেকবার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমলহাস্যে

অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম-দর্শনে সেই যে তাঁহার মুখে উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগ-মূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সংকুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন।

বঙ্কিমের সেই সসংকোচ পলায়নদৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে-সময়কার সাহিত্য অন্য যে-কোনোপ্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক, ঠিক সুরুচিশিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে-সময়কার অসংযত বাক্-যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা যে কী আশ্চর্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতার প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোনোকালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম-সংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়সঙ্গিনী

বঙ্গভাষা আজ বঙ্কিমের জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এই শোকোচ্ছ্বাসের অতীত শান্তিধামে দুষ্কর জীবনযজ্ঞের অবসানে নির্বিকার নিরাময় বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে একটি কোমল প্রসন্নতা, একটি সর্বদুঃখতাপহীন গভীর প্রশান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—যেন জীবনের মধ্যাহ্নরৌদ্রদগ্ধ কঠিন সংসারতল হইতে মৃত্যু তাঁহাকে স্নেহসুশীতল জননীক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছে। আজ আমাদের বিলাপ পরিতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমাদের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিবার জন্য সেই প্রতিভাজ্যোতির্ময় সৌম্য প্রসন্নমূর্তি এখানে উপস্থিত নাই। আমাদের এই শোক এই ভক্তি কেবল আমাদেরই কল্যাণের জন্য। বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে যে-আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এই শোকে এই ভক্তিতে সেই আদর্শ-প্রতিমা আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল এবং স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রস্তরের মূর্তিস্থাপনের অর্থ এবং সামর্থ্য আমাদের যদি না থাকে, তবে একবার তাঁহার মহত্ত্ব সর্বতোভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমাদের বঙ্গহৃদয়ের স্মরণস্তম্ভে স্থায়ী করিয়া রাখি। রাজনৈতিক সামাজিক মতামত সহস্রবার পরিবর্তিত হইতে পারে, যে-সকল ঘটনা যে-সকল অনুষ্ঠান আজ সর্বপ্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার উন্মাদনার কোলাহলে সমাজের শান্তিহীন শব্দহীন কর্তব্যগুলিকে নগণ্য বলিয়া ধারণা হইতেছে, কাল তাহার স্মৃতিচিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে না পারে; কিন্তু তিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদিগের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের মধ্যে চিরসৌন্দর্যের অক্ষয় আকর উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যাহা-কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা-কিছু অমর করিবে সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার, প্রকাশ করিবার এবং সর্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।

মতবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে, আজ আমাদিগের নিকট যাহা প্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা রুচি এবং অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের উত্তরপুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম

বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন; তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতঃস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন,—ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ-কথা কোনো বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাংলা লেখকদিগের গুরু, বাংলা পাঠকদিগের সুহৃদ্, এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিমদিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভাগীর স্বর্গ

১

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলে-মেয়েদের ছেলে-পুলে হইয়াছে, জামাইরা, প্রতিবেশীর দল, চাকর-বাকর—সে যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধুমধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দুর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার—এ যেন বড় বাড়ীর গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামিগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া অলক্ষ্যে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল, সে কাঙালীর মা। সে তাহার কুটীর-প্রাঙ্গণের গোটা-কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার আঁচলে বেগুন বাঁধা—সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্রামের একান্তে গরুড় নদীর তীরে শ্মশান। সেখানে পূর্ব্বাহ্ণেই কাঠের ভার, চন্দনের টুক্‌রা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল। কাঙালীর মা ছোটজাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না,

তফাতে একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্য্যাপ্ত চিতার 'পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাহার রাঙা পা দুখানি দেখিয়া তাহার দুচক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আল্‌তা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহু কণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্ছো—আমাকেও আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও আমিও যেন এম্‌নি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন! সে ত সোজা কথা নয়! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতিনী, দাস, দাসী, পরিজন—সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ—দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্যঃপ্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতা-পাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছেন, মুখ তাঁহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিঁদূরের রেখা, পদতল দুটি আল্‌তায় রাঙানো। ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চোদ্দ পনেরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস্ মা, ভাত রাঁধবি নে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধবো'খন রে! হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, দ্যাখ্ দ্যাখ্ বাবা—বামুনমা ওই রথে চ'ড়ে সগ্যে যাচ্ছে!

ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, কই? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই ক্ষেপেছিস্! ও ত ধুঁয়া! রাগ করিয়া কহিল, বেলা দুপুর বাজে, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি? এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল লক্ষ্য করিয়া বলিল, বামুনদের গিন্নী মরেছে তুই কেন কেঁদে মরিস্ মা?

কাঙালীর মার এতক্ষণে হুঁস হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এই ভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমন কি, ছেলের অকল্যাণের

আশঙ্কায় মুহূর্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাঁদব কিসের জন্যে রে—চোখে ধোঁ লেগেছে বই ত নয়!

হাঁঃ, ধোঁ লেগেছে বই ত না! তুই কাঁদ্‌ছিলি!

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালীকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল—শ্মশান সংকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।

২

সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলোকেই যেন আমরণ ভ্যাঙচাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট, কিন্তু সেই ছোট্ট কাঙালীজীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর মা হইতে বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ও শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

তাহার সেই কাঙালী বড় হইয়া আজ পনেরয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলি নে মা?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল, না, ক্ষিদে নেই বই কি! কই দেখি তোর হাঁড়ি?

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর একজনের মত ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্নমুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়সের ছেলে সচরাচর এরূপ করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্ন ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গী সাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলা-ধুলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে। এক হাতে গলা জড়াইয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া পোড়ানো কি তুই—

মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, ছি বাবা, মড়া পোড়ানো বলতে নেই, পাপ হয়। সতীলক্ষ্মী মা-ঠাকরুণ রথে করে সগ্যো গেলেন।

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা! রথে চড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যো যায়?

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখনু কাঙালী, বামুনমা রথের ওপরে বসে। তেনার রাঙা পা দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখলে রে!

সবাই দেখলে?

সব্বাই দেখলে!

কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই সে শিশুকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই মা যখন বলিতেছে সবাই চোখ মেলিয়া এতবড় ব্যাপার দেখিয়াছে, তখন অবিশ্বাস করিবার আর কিছু নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তা হলে তুইও ত মা সগ্যো যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসিকে বলতেছিল ক্যাঙলার মা'র মত সতীলক্ষ্মী আর দুলেপাড়ায় কেউ নেই।

কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, ক্যাঁতাটা পেতে দেব মা, শুবি?

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে বালিশটী পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, কাঙালী, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভাল লাগিল, কিন্তু কহিল, জলপানির পয়সা দুটো ত তা হ'লে দেবে না মা!

না দিক্ গে—আয় তোকে রূপকথা বলি।

আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না, কাঙালী তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল্ তা হ'লে। রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুর আর সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া—

অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ সকল তাহার পরের কাছে কত দিনের শোনা এবং কত দিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত্ত-কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র—সে এমন উপকথা সুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়—নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—কাঙালীর স্বল্প দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকারে কেবল রুগ্ন মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশানযাত্রার কাহিনী। সেই রথ, সেই রাঙা পা দুটি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া। কেমন করিয়া শোকার্ত্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তারপরে সন্তানের হাতের আগুন! সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালী, সেই ত হরি! তার আকাশজোড়া ধুঁয়ো ত ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই ত সগ্যের রথ! কাঙালীচরণ, বাবা আমার!

কেন মা?

তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুনমার মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো।

কাঙালী অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ—বল্‌তে নেই।

মা সে কথা বোধ করি শুনিতেও পাইল না, তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোটজাত ব'লে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না ক'রতে পারবে না—দুঃখী ব'লে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস্‌! ছেলের হাতের আগুন—রথকে যে আসতেই হবে।

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস্‌ নে মা, বলিস্‌ নে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ্‌ কাঙালী, তোর বাবাকে একবার ধ'রে আন্‌বি, অম্‌নি যেন পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে আমাকে বিদায় দেন। অম্‌নি পায়ে আল্‌তা, মাথায় সিঁদুর দিয়ে –কিন্তু কে বা দেবে? তুই দিবি, না রে কাঙালী? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব। বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

৩

অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্তৃতি বেশি নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেম্‌নি সামান্যভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালী গিয়া কাঁদাকাটি করিল, হাতে-পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে একটাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটা-চারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত কি আয়োজন; খল, মধু, আদার সত্ত্ব, তুলসীপাতার রস—কাঙালীর মা ছেলের উপর রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না ব'লে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি, বাবা! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভাল হই ত এতেই হব, বাগ্‌দী-দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না!

দিন দুই-তিন এম্‌নি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে যাহা মুষ্টিযোগ জানিত, হরিণের শিঙ্‌ঘষা জল, গেটে-কড়ি পুড়াইয়া

মধুতে মাড়িয়া চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কবরেজের বড়িতে কিছু হ'ল না বাবা, আর ওদের ওষুধে কাজ হ'বে? আমি এম্‌নিই ভাল হ'ব।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি ত খেলি নে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এম্‌নি কি কেউ সারে?

আমি এম্‌নি সেরে যাবো। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।

কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফেন ঝাড়িতে, না পারিল ভাল করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না—ভিতরে জল পড়িয়া ধূঁয়া হয়; ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; মায়ের চোখ্ ছল ছল করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণকণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরল-ধারে জল পড়িতে লাগিল।

গ্রামের ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সুমুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না! সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আন্‌তে পারিস্ বাবা?

কাকে মা?

ওই যে রে—ও গাঁয়ে যে উঠে গেছে—

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল।

কাঙালী বলিল, সে আস্‌বে কেন মা?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বলবি, মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধুলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হই'ল সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদা-কাটা করিস্ বাবা, বলিস্, মা যাচ্ছে।

একটু থামিয়া কহিল, ফের্‌বার পথে অম্‌নি নাপ্‌তে বৌদির কাছ থেকে একটু আল্‌তা চেয়ে আনিস ক্যাঙালী, আমার নাম করলেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালবাসে।

ভাল তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিষের কথা এতবার এতরকম করিয়া শুনিয়াছে যে সে সেইখান হইতেই কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিল।

৪

পরদিন রসিক দুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ সংসারের কাজ সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে। কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেছে—পায়ের ধুলো নেবে যে!

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথ-যাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া দিয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধুলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দির পিসি দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধুলো।

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশনবসন দেয় নাই, কোন খোঁজ খবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধুলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রাখালের মা বলিল, এমন সতীলক্ষ্মী বামুন কায়েতের ঘরে না জন্মে' ও আমাদের দুলের ঘরে জন্মালো কেন! এইবার ওর একটু গতি ক'রে দাও বাবা—ক্যাঙ্‌লার হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।

অভাগীর অভাগের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া এ কথা যেন তীরের মত বিঁধিল।

সেদিন দিনের-বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটাও কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। কি জানি, এত ছোট-

জাতের জন্যও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়—কিন্তু এটা বুঝা গেল রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

কুটীর-প্রাঙ্গণে একটা বেল গাছ ছিল, একটা কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দরওয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কসাইয়া দিল; কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা, একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাট্‌তে লেগেছিস্?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ, এ যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ দরওয়ানজী। বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানী দরওয়ান তাহাকেও একটা অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়া ছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকা-হাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভাল হয় নাই, তাহারাই আবার দরওয়ানজীর হাতে পায়ে ধরিতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন। কারণ, অসুখের সময় যে কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালীর মা তাহারই হাতে ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছে।

দরওয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাতমুখ নাড়িয়া জানাইল, এ সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন, গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্তা। লোকগুলা যখন হিন্দুস্থানীটার কাছে ব্যর্থ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারি বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল অতবড় অসংগত অত্যাচারের কথা যদি কর্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না। হায় রে অনভিজ্ঞ! বাঙলা দেশের জমিদার ও তাহার কর্ম্মচারীকে সে চিনিত না। সদ্যমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, অধর রায় সেইমাত্র

সন্ধ্যাহ্নিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কে রে?

আমি কাঙালী। দরওয়ানজী আমার বাবাকে মেরেছে।

বেশ করেছে। হারামজাদা খাজনা দেয় নি বুঝি?

কাঙালী কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাটতেছিল—আমার মা মরেছে—, বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।

সকাল-বেলা এই কান্না-কাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল না কি! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস্ রে, এখানে একটু গোবরজল ছড়িয়ে দে! কি জাতের ছেলে তুই?

কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।

অধর কহিলেন, দুলে! দুলের মড়ায় কাঠ কি হবে শুনি?

কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে! তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে, সকলে শুনেছে যে। মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ মুহূর্তে স্মরণ হওয়ায় কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্ গে। পারবি?

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যের জন্য তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়—পাজি, হতভাগা, নচ্ছার!

কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের উঠানের গাছ, বাবুমশায়! সে যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ!

হাতে-পোঁতা গাছ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত!

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্ম্মচারীরাই পারে।

কাঙালী ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন সে যে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ, ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না।

গোমস্তার নির্বিকার চিত্তে দাগ পর্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকরি তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখ ত হে, এ ব্যাটার খাজনা বাকী পড়েছে কিনা। থাকে ত জাল-টাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয়—হারামজাদা পালাতে পারে।

* * * *

মুখুয্যেবাড়ীতে শ্রাদ্ধের দিন—মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকী। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, ঠাকুরমশাই, আমার মা মরে গেছে।

তুই কে? কি চাস্ তুই?

আমি কাঙালী। মা বলে গেছে তেনাকে আগুন দিতে।

তা দিগে' না।

কাছারির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, ও বোধ হয় একটা গাছ চায়। এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, শোন আবদার। আমারই কত কাঠের দরকার—কাল বাদে পরশু কাজ। যা যা, এখানে কিছু হবে না—এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে—যা, মুখে একটু নুড়ো জেবলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দিগে'।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ছেলে ব্যস্তসমস্ত ভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখছেন ভটচাজমশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হ'তে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙালী আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘণ্টা-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ানো হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তারপরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত—শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাকাব্য

ইংরাজি এপিক্‌শব্দের অনুবাদে মহাকাব্য-শব্দের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ মিলে কি না তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে আলংকারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ যেরূপে সূক্ষ্মভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহাকবিগণের চিন্তার কারণ কিছুই রাখেন নাই। কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য এ দেশে চলিত আছে, এবং ঐ সকল মহাকাব্য সম্ভবতঃ অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা চলে কি না, তাহা লইয়া একটা তুমুল সমস্যা গোড়াতেই দাঁড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত এপিক্‌ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উঁহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে সর্ব্বদা সম্মত হন না। প্রথমতঃ, এ দুই গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলী অত্যন্ত উৎকটরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মহাকাব্য বলিলে উঁহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি আখ্যা দিলে, বোধ করি, এই দুই গ্রন্থের মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উঁহাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়।

বস্তুতই মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়। কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জ্জুনীয় যে অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য নহে। কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয় যে শ্রেণীর যে পর্য্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর—সে পর্য্যায়ের গ্রন্থ নহে। একের নাম মহাকাব্য দিলে, অন্যকে মহাকাব্য বলা কিছুতেই সংগত হয় না।

রামায়ণ মহাভারতের ঐতিহাসিকত্বে ও ধর্ম্মশাস্ত্রত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান্‌ থাকিয়াও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে উঁহাতে কাব্যরসও যথেষ্ট পরিমাণে

বিদ্যমান। মহর্ষি বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উঁহারা যাহা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব রহিয়া গিয়াছে,—হয়ত উঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু কবিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

রামায়ণ-মহাভারতে কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই, মহর্ষিদ্বয়কে মহাকবি ও তাঁহাদের কাব্যদ্বয়কে মহাকাব্য না বলিলে চলে না; কেন-না, ভাষাতে আর কোন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা এই কাব্যদ্বয়ের সঙ্গত নামকরণ চলিতে পারে। কুমারসম্ভব-কিরাতার্জুনীয়কে আপাততঃ মহাকাব্যের শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দিয়া আমরা রামায়ণ-মহাভারতকেই মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

মনে হইতেছে মেকলে কোথায় বলিয়াছেন, সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে। সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস করে, অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে পায় না। বলা বাহুল্য, মেকলের অনেক উক্তির মত এই উক্তিটিকেও সুধীজনে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার আস্ফালন-সত্ত্বেও ইউরোপ-খণ্ডে কবিত্বের যেরূপ স্ফূর্তি দেখা গিয়াছে, তাহাই তাহার প্রমাণ। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় মেকলের ঐ উক্তির ভিতর একটু প্রচ্ছন্ন সত্য আছে। সভ্যতা কবিত্বের মস্তক চর্বণ না করিতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যকে বোধ করি সশরীরে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার বলা আবশ্যক, মহাকাব্য-শব্দ আমি আলঙ্কারিক-সম্মত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব ও প্যারাডাইস লষ্ট্‌কে আমি এ স্থলে মহাকাব্যের মধ্যে ফেলিতেছি না। রামায়ণ-মহাভারত যে পর্য্যায়ের কাব্য, সেই পর্য্যায়ের কাব্যকেই আমি মহাকাব্য বলিতেছি। পৃথিবীতে কত কবি কত কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য সেই কোন্ কালে রচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর একখানাও রচিত হইল না। পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যে লেখকের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই; কিন্তু সন্দেহ হয়, কেবল হোমারের নামে প্রচলিত গ্রন্থ-দুইখানি ব্যতীত আর কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য দেশে সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত কবিত্বের অবনতি হইয়াছে, এ-কথা কেহই বলিতে পারিবে না। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের নাম মনে রাখিয়াও

অকুতোভয়ে বলা যাইতে পারে, ইউরোপ-মহাদেশেও একবারের বেশী হোমারের জন্ম হয় নাই।

বস্তুতই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার পর কত হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না। কেন এরূপ হইল, তাহার কারণ চিন্তনীয়; কিন্তু সেই কারণ আবিষ্কারে লেখকের ক্ষমতা নাই। তবে এক একবার মনে হয়, মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা, বোধ করি, আর সেই শ্রেণীর মহাকাব্য-উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে।

রামায়ণ মহাভারত ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা মনুষ্যসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে সেই সমাজকে আধুনিক হিসাবে সভ্য বলিতে পারা যায় না। মনুষ্যসমাজের সে অবস্থা আবার কখনও ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা জানি না; কিন্তু তাৎকালিক সমাজে যে সকল ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইত, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। আমরা এমন কল্পনায় আনিতে পারি না যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি কোন ইউরোপের রাজসভায় আতিথ্যস্বীকার করিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মীকে জাহাজে তুলিয়া প্রস্থান করিতেছেন, ও তাহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ ইউরোপের নরপালবর্গ ওয়াশিংটন অবরুদ্ধ করিয়া দশ বৎসরকাল বসিয়া আছেন। ডিলারী বন্দীকৃত লর্ড মেথুয়েন্‌কে গাড়ীর চাকায় বাঁধিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধুর উপত্যকায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কোন দিনের টেলিগ্রামে দেখিবার কেহ আশা করেন না। সিডান্‌ক্ষেত্রে বিসমার্ক লুই নেপোলিয়ান্‌কে হস্তগত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বুক চিরিয়া নেপোলিয়ান্‌-বংশের শোণিতের আস্বাদগ্রহণ আবশ্যক বোধ করেন নাই। ত্রেতাযুগ-অবসানের বহুদিন পরে বুয়রদেশে লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষাও তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তজ্জন্য লাঙ্গুলের ব্যবহার করিতে হয় নাই।

সেকালের এই অসভ্যতা আমাদের চোখে বড়ই বীভৎস ঠেকে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেকালের সামাজিকতার আর একটা দিক্ আছে, একালে সে দিকটাও তেমন দেখিতে পাই না। বার্ক এক সময়ে আপনার মহাপ্রাণতার ঝোঁকে বলিয়াছিলেন, শিভাল্‌রির দিন গত হইয়াছে। শিভালরি-নামক

অনির্ব্বাচ্য বস্তু নগ্ন বর্ব্বরতার সহিত নিরাবরণ মনুষ্যের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সমুৎপন্ন। একালে মানুষ মানুষের রক্তপান করিয়া জিঘাংসার তৃপ্তি করিতে চাহে না বটে, কিন্তু আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কটাক্ষমাত্র শাসনে, পত্নীর অপমান স্বচক্ষে দেখিয়াও, আত্মসংযমে সমর্থ হয় কি না, বলা যায় না। একালের রাজারা মালকোঁচা মারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে অবতীর্ণ হন না সত্য বটে, কিন্তু ভীমরতিগ্রস্ত পিতার একটা কথা রাখিবার জন্য ফিজিদ্বীপে নির্ব্বাসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন কি না, বলিতে পারি না। অশ্বত্থামা ঘোর নিশাকালে সুখসুপ্ত বালকবৃন্দের হত্যাসাধন করিয়া ভীষণ ক্রূরতা দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সভা ডাকিয়া ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া সেই ক্রূরতার সমর্থন তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ-সহায় পাণ্ডবগণ যখন জয়বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া নিশাকালে শত্রুশিবিরে ভীষ্মের নিকট দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভীষ্মকে তাঁহার জীবনটুকু দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের লৌহবর্ম্মের অন্তরালে কারেন্সি নোটের গোছা লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে মনুষ্যসমাজের বাহিরের মূর্ত্তিটা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। মনুষ্যের বাহিরের পরিচ্ছদটা সম্পূর্ণ বদলাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের ভিতরের গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের রাজারাজড়াও, বোধ হবি, সময়মত কৌপিনধারী হইয়া সভামধ্যে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না, কিন্তু এখনকার অন্নহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিরূপতা পোশাকের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্ব্বরতা ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোন আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ, কোনরূপ রঙ-ফলান ছিল না। একালেও ক্রূরতা, বর্ব্বরতা ও পাশবিকতা হয়ত ঠিক তেমনি বর্ত্তমান আছে, তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ স্থাপিত হইয়া তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সম্প্রতি চীনদেশে সভ্য ইউরোপের সম্মিলিত সেনা যে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আটিলা ও জঙ্গিস্ খাঁর প্রেতাত্মার আর লজ্জিত হইবার কোন কারণই নাই।

বস্তুতই চারি হাজার বৎসরের ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র অধিক বদলায় নাই; তবে সমাজের মূর্ত্তিটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং মনুষ্যসমাজের অবস্থা যে-কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেই কাব্যের মূর্ত্তিও যে তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। বিস্ময়ের কারণ থাক্ আর নাই থাক্, আধুনিক কালের সাহিত্যে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের আর আবির্ভাব হয় নাই, এবং আর যে কখনও হইবে তাহা আশা করাও দুষ্কর। সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়া গিয়াছে। কালের যখন অবধি নাই ও পৃথ্বী যখন বিপুলা, তখন বড় কবির ও কাব্যের অসদ্ভাব কখন হইবে না; কিন্তু মনুষ্যসমাজের সেই প্রাচীন অবস্থা ফিরিয়া আসিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে মহাকবির ও মহাকাব্যের, বোধ করি, আবির্ভাব আর হইবে না।

বস্তুতই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা, বোধ করি, আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্ম্মিত কৃত্রিম কারুকার্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্তনির্ম্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।

আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতকে এক একবার ভারতবর্ষের হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পাষাণ-কলেবরের অঙ্কদেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত সহস্র বৎসরকাল অঙ্কে রাখিয়া লালন-পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে। হিমাচলের বিশাল বক্ষোদেশ হইতে বিনিঃসৃত সহস্র উৎস হইতে সহস্র স্রোতস্বিনী অমৃতরসপ্রবাহে ভারতভূমিকে আর্দ্র ও সিক্ত করিয়া 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে, সেইরূপ মহাভারতের মধ্য হইতে সহস্র উপাখ্যান, সহস্র কাহিনী, সহস্র কথা সমগ্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্র ধারা প্রবাহিত করিয়া পুণ্যতর ভাবপ্রবাহে জাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ রাখিয়া

বহুকোটী লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্টি ও কান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ যেমন হিমাচলের ক্রমবিন্যস্ত স্তরপরম্পরা পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে কত বিস্ময়কর জীবের অস্থিকঙ্কাল উদ্ধার করিয়া অতীতের লুপ্তস্মৃতি কালের কুক্ষি হইতে উদ্ঘাটন করেন, সেইরূপ প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই বিশাল গ্রন্থের স্তরপরম্পরা হইতে ভারতীয় জনসমাজের অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত নিদর্শনের চিহ্ন ধরিয়া ইতিহাসের অতীত অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অগ্রদূত—আল্-বেরুনী

বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সভ্যতার মধ্যে সংস্কৃতিগত সমন্বয়, মিলন, ঐক্য ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জন্য এক শ্রেণীর সুধীমণ্ডলী যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা যে সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইতে পারিতেছে না, তাহার মূল কারণ সংস্কৃতি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব, এবং ব্যাপারটিকে উদারভাবে দেখিবার ও বুঝিবার মত দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি একই বস্তু। যতগুলি ধর্ম্ম আছে, ততগুলি সংস্কৃতিও আছে। আপন আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাকে লোকে যেমন অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য মনে করে, সংস্কৃতিকেও সেই ভাবে দেখিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে; সংস্কৃতি ধর্ম্ম হইতে আলাদা বস্তু। ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক জগতের বস্তু; কিন্তু সংস্কৃতি পার্থিব জগৎকে লইয়া। মানবের আচার-পদ্ধতি, শিক্ষাদীক্ষা, মানসিক উন্নতি, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব এই সবের সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব মনোভাবই হইতেছে সংস্কৃতি। জাতির সর্ব্ববিধ বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির চরমতম পরিণতি হইতেছে তাহার সংস্কৃতি। এ কথা সত্য যে, ধর্ম্মের আদর্শ সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম একই বস্তু নহে। সেই জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয়-সাধন যতই কঠিন বোধ হউক না কেন, বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়-সাধন কঠিন ত নহেই, বরং যুগে যুগে প্রত্যেক দেশেই তাহা হইয়া আসিতেছে। ইহার জন্য দরকার প্রকৃত জ্ঞান ও উদার মনোভাব।

ভারতবর্ষ ও গ্রীস এই দুইটি অতি প্রাচীন সভ্য দেশ। এই দুইটি দেশের মধ্যে নানা বিষয়ে সংস্কৃতিগত সমন্বয় ও মিলনের চেষ্টা হইয়াছিল, সে প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। পিথাগোরাস হইতে আরম্ভ করিয়া (অথবা তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে) মেগাসথিনিসের যুগ পর্য্যন্ত কতভাবে আর্য্য ও গ্রীক সভ্যতার মধ্যে আদান-প্রদান হইয়া গিয়াছে। সেই ভাবে প্রাক্-ইস্‌লামের যুগ হইতে আরব ও ভারতের মধ্যে নানা বিষয়ে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল। উত্তর ভারতের সুপ্রসিদ্ধ মৌলানা সৈয়দ সোলায়মান্ নদবীর "আরব ও হিন্দ কি তাআল্লুকাত্" নামক মূল্যবান্ পুস্তকে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ইস্লামের যুগেও বহু মুসলমান ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, রাজ্যবিজয়ের উদ্দেশ্যে নয়, এ দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে। দেশ-বিজয়ের বাসনা তাহার বহু পরে হয়। কিন্তু পৌত্তলিকতার বিরোধী মুসলমানগণ এ দেশের পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখিয়া আর অধিকদূর অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা এ দেশের সংস্কৃতিকে অবহেলা করিতে লাগিলেন। প্রায় তিন শত বৎসর এইরূপ অবহেলার মধ্যে চলিল। তারপর সুলতান মাহ্মূদের সময় একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি সেই ছিন্ন তার জোড়া দিয়া আবার মোহন সুরে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইনি মহামনীষী পণ্ডিত আবু রয়হান্ আল্-বেরূনী। যে পথ এত দিন বন্ধ ছিল, মনীষী আল্-বেরূনী তাহা বিশ্বের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। আরব ও ভারতের মধ্যে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের জন্য তিনি সে যুগে যাহা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট চিরঋণী।

যে সব বিদেশী লেখক প্রাচীন ভারতবর্ষসম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে আল্-বেরূনীকে আমরা অতি উচ্চাসন প্রদান করিতে পারি। পৃথিবীর এক প্রান্তে বসিয়া পাঁচ-দশখানা বই পড়িয়া অপর দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া তাহাকে নিজের প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল বলিয়া চালাইয়া দিবার দুঃসাহস অনেক লেখকের আছে। কিন্তু আল্-বেরূনী সে ধরণের লেখক ছিলেন না। তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা এ যুগেও দুর্লভ। একাদিক্রমে সাত বৎসর ভারতের ভাষা বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া, এ দেশের জনসাধারণ ও পণ্ডিত শ্রেণীর লোকের সহিত প্রাণখোলাভাবে মিলিয়া-মিশিয়া সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার এই বিরাট্ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ও আরব দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার বিষয় অতি ব্যাপক—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, গণিত, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি। এই সব বিষয় তিনি নিরপেক্ষ দর্শকের মত তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া গ্রন্থ

লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচনার সব চেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত মতামতের আভাস খুবই কম আছে।

আল্-বেরুনীর জীবনবৃত্তান্ত খুব ঘটনাবহুল নহে। অতি সংক্ষেপেই তাহা বর্ণনা করিতেছি। তাঁহার পুরা নাম আবু রয়হান্ মহম্মদ ইব্‌নে আহ্মদ্ আল্-বেরুনী। মধ্য এসিয়ার খোওয়ারিজাম্ নামক রাজ্যে ৯৬৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বীয় পল্লীতে তিনি অল্প বয়সে সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও গণিতবিদ্যা শিক্ষা করেন, এবং তথায় কিছু দিন শিক্ষকতা করিতে থাকেন। পরে ১০১৩ খৃঃ অব্দে উক্ত খোওয়ারিজাম্ রাজ্য সুলতান মাহ্মুদ অধিকার করেন। সেই সময়ে আল্-বেরুনী স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সুলতান মাহ্মুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তাহাতে তিনি সুলতানের কোপে পতিত হন। পরে সুলতান তাঁহাকে বন্দী করিয়া ভারতে প্রেরণ করেন। তিনি বাধ্য হইয়া ভারতে যে ভাবে জীবন-যাপন করিতেছিলেন তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া দুষ্কর। কারণ, তাঁহার লিখিত বিবরণে তিনি অপরের সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছিলেন, নিজের সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই বলেন নাই। ভারতে অবস্থানকালে তাঁহাকে যত্রতত্র যাইতে দেওয়া হইত না। কিন্তু হিন্দু পণ্ডিত ও সাধুদের সহিত মিলিবার ও মিশিবার অনুমতি তিনি পাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর। অবসরসময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখিতে লাগিলেন; এবং কয়েক বৎসর বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তিনি হিন্দু বিজ্ঞান, দর্শন, ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ ও গণিতবিদ্যা শিখিয়া ফেলিলেন; এবং সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দ্বারা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্বন্ধে কয়েকখানা মূল্যবান্ পুস্তক লিখিলেন।

ইতিপূর্ব্বে যে সব মুসলমান লেখক হিন্দুদের ধর্ম্ম, সামাজিক ব্যবস্থা, দর্শন ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, আল্-বেরুনী যে তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁহার রচিত গ্রন্থই সে পরিচয় প্রদান করিবে। তাঁহার "কিতাব আত্ তহকীক আল্ হিন্দ" একখানা বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, উহার সহিত ইস্‌লামিক দর্শন বিশেষতঃ সুফি মতবাদের বিশেষ পার্থক্য নাই; অন্ততঃ মূলগত আদর্শ বিষয়ে। একজন নিরপেক্ষ দর্শকের মত তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখিলেন যে, হিন্দু মানসিকতার অধঃপতনের মূল কারণ উহাদের দর্শন বা

শাস্ত্রের মধ্যে নাই। সাধারণের মধ্যে বিদ্যা-চর্চ্চা কমিয়া আসাতে পৌরোহিত্যের প্রভাব বৃদ্ধি পাইল এবং তাহা হইতে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ও স্ফুরণ আর হইল না। তিনি এই উক্তি কেবল হিন্দুদের বেলায় করেন নাই। তাঁহার মতে মুসলিম মানসিকতার অধঃপতনের মূল কারণ তুর্ক-প্রাধান্য-বৃদ্ধি।

ভারতবর্ষসম্বন্ধে পক্ষপাতিত্বহীন সঠিক বিবরণ লিখিবার প্রেরণা তিনি তাঁহার গুরু আবু সোহলের নিকট প্রাপ্ত হন। তিনি আল্-বেরূনীকে বলেন, ভারত-বিষয়ক এমন গ্রন্থ লিখিতে হইবে যাহাতে সত্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। তাই মহাত্মা আল্ বেরূনী গুরুর আদেশ নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার "কিতাবুল হিন্দে"র মুখবন্ধে লিখিতেছেন:— "আমি হিন্দু ধর্ম্ম ও সভ্যতাসম্বন্ধে লিখিতে অগ্রসর হইলাম। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অপ্রামাণিক অভিযোগ দিব না; আমি যদিও মুসলমান, তবুও তাহাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে যেমনভাবে দেখিয়াছি, ঠিক সেই ভাবে বর্ণনা করিতে কাতর হই নাই। তাহাদের ধর্ম্ম-নীতি যদিও ইস্‌লামের অনুরূপ নহে, তবুও তাহা কোনওরূপ রং ফলাইয়া লিখি নাই—ইহা নিরপেক্ষ ব্যক্তির ঘটনা-বর্ণনা মাত্র। ইহাতে আমার অতিরঞ্জন কিছুই থাকিবে না।"

অনেক অহিন্দু প্রাচীন ভারতের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বহু ভ্রমে পতিত হন। কারণ, তাঁহারা অনুবাদের অনুবাদ তস্য অনুবাদ পড়িয়া মাত্র নকলে আসল খাস্তা করিয়া যান। দশম ও একাদশ শতাব্দীর ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহারা বলেন যে, ভারতের হিন্দুগণ বিভিন্ন জাতিতে এমন ভাবে বিভক্ত ছিল যে, তাহাদের মধ্যে কোনরূপ ঐক্য ছিল না। কিন্তু শত পার্থক্যের মধ্যেও সমগ্র হিন্দু সমাজে একটা একজাতীয়তার ভাব ছিল, তীক্ষ্ণদর্শী আল্-বেরূনী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন যে, সেই একাদশ শতাব্দীতেও Hindus were a single people, one and undivided — হিন্দুরা একই অবিভক্ত জাতি ছিল। সত্য বটে, দেশে নানাবিধ দেবদেবীর পূজা আরাধনা ছিল, নানাবিধ দল ও উপদল ছিল, এবং দার্শনিক মতও নানা প্রকার ছিল। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? সমস্ত দল ও উপদল তাহাদের বিভিন্ন আদর্শ লইয়া পরস্পরের সহিত শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত পাশাপাশি বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। উচ্চশিক্ষিত হিন্দুগণ দেবদেবীসম্বন্ধে সাধারণ লোক হইতে পৃথক্ ধারণা পোষণ করিতেন। দেবদেবীতে বিশ্বাস সাধারণের জন্য দরকারী মনে করিলেও তাঁহারা নিজেরা উহাতে প্রগাঢ়ভাবে

বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং তাঁহারা প্লেটোর মত বিশ্বাস করিতেন যে, God is in the singular number—"ঈশ্বর একবচনাত্মক আদর্শ।"

আল্-বেরূনীর মতে, হিন্দুদের বিভিন্ন দার্শনিকগণের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তাহা বাহিক, মৌলিক নহে। তিনি সমস্ত মতবাদ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই সব মতবাদের মধ্যে একটা সাধারণ ভিত্তি আছে। রসায়ন, গণিত, বস্তুবিজ্ঞান, বিশ্ববিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা ছিল। ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন দেবদেবীকে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ উদারভাবে দেখিতেন। সেই জন্য এক দল অন্য দলের সহিত মতের জন্য যুদ্ধ করিত না। বিভিন্ন স্থানে সামাজিক আচার ব্যবহার কিছু কিছু বিভিন্ন ছিল, কিন্তু সমগ্র দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত সর্ব্বত্র একই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও জীবন-সম্বন্ধে একই আদর্শ ছিল।

সে যুগের হিন্দুদের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া আল্-বেরূনী তাহাদের দোষত্রুটি বিচ্যুতির কথা লিখিতেও ভুলেন নাই। একপ্রকার দাম্ভিকতাভাব ধীরে ধীরে তাহাদিগকে গ্রাস করিতেছিল। পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাহারা কাহারও সহিত জ্ঞানের আদান প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিল না। একটু গর্ব্বিত, একটু গোঁড়া ও নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা তাহাদের বৈশিষ্ট্য হইয়া পড়িয়াছিল। আর কেহ যে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ইহা তাহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না।

হিন্দু সমাজের জাতিভেদ-প্রথাকে আল্-বেরূনী সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। তিনি উহাকে সমর্থন করেন নাই, তবে খুব ধীরভাবেই এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। জাতিভেদ-প্রথার জন্য দশম শতাব্দীর হিন্দু সমাজ দায়ী নহে। তাহারও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে উহার উৎপত্তি। আল্-বেরূনী এ কথাও বলিতে ভুলেন নাই যে, এই প্রকার জাতিভেদ-প্রথা অন্যান্য বহু দেশেও ছিল। পারস্যেও উক্ত প্রকার জাতিভেদ প্রথা ছিল। হিন্দু ধর্ম্মের চরমতম বিকাশে জাতিভেদ প্রথার স্থান নাই। কারণ তখন ব্রাহ্মণ হিন্দুও শূদ্রের নিকট মাথা নত করে।

আল্-বেরূনী গীতোক্ত একটা শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গীতার এক স্থানে আছে:—ঈশ্বর জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দয়া বিতরণ করেন। যদি মানুষ সৎকর্ম্ম করিতে গিয়ে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়, তবে তিনি সেই সৎকর্ম্মকে মন্দ বলিয়া ধরেন। এখানে একটা কথা লক্ষ্য করিতে

হইবে যে, হিন্দু ধর্ম্মের এই প্রকার উদার ব্যাখ্যা বর্ত্তমান যুগের সংস্কারবাদী হিন্দু পণ্ডিতের কথা নয়। সেই দশম শতাব্দীতে বুদ্ধিবাদী ভিন্নদেশীয় মুসলমান দার্শনিক হিন্দু ধর্ম্মকে যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা তাঁহারই অপক্ষপাতপূর্ণ গবেষণার ফল।

আল্-বেরূনী সে যুগের হিন্দুদের আর একটা প্রধান দোষ লক্ষ্য করিয়াছেন। সেটা হইতেছে তাহাদের তীব্র আগ্রহের অভাব। হয়ত ইহা সাহসের অভাবে নয়, কিন্তু ইহা তাহাদের ছিল। আর এই জন্য তাহারা খুব বড় বড় কাজ করিতে অশক্ত হইয়া পড়িতেছিল। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, বহু বিজ্ঞ হিন্দু ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করিতেন; এবং মূর্ত্তিপূজার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ ছিল না। আবার তিনি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, একদল গোঁড়া ও সংস্কারাপন্ন লোক ঈশ্বরসম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব সব রকম কথাই বিশ্বাস করিতেন। ইহার কারণ কি? আল্-বেরূনী বলিতেছেন, ইহার প্রধান কারণ দার্শনিক পণ্ডিতগণের সাধারণের মধ্যে সত্যপ্রচারের আগ্রহের অভাব। ঈশ্বরসম্বন্ধে যখন সাধারণ লোকের বিশ্বাস ও দার্শনিকের বিশ্বাসের মধ্যে বিরোধ বাধিত, তখন দার্শনিক পণ্ডিতগণ হয় দার্শনিক মত পরিত্যাগ করিতেন, অথবা জনসাধারণকে তাহাদের জ্ঞানানুসারে ঈশ্বরসম্বন্ধে জ্ঞান দান করিতেন।

হিন্দু দর্শন ছিল মূলতঃ esoteric (আভ্যন্তরীণ)। ইহা কুসংস্কার ও আচার-মূলক বিশ্বাস হইতে মুক্ত। কিন্তু হিন্দু দার্শনিক ও সুধীগণ সাধারণের মধ্যে এই সব উচ্চ ভাব ও দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিবার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য গ্রহণ করেন নাই। হিন্দু দার্শনিকদের এই আচরণকে আল্-বেরূনী সমর্থন করেন নাই।

জ্ঞানবিজ্ঞানের কতকগুলি শাখায় হিন্দুরা যে খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আল্-বেরূনী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের সাহিত্য তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রীত ও মুগ্ধ করিয়াছিল। হিন্দু-সাহিত্যের মধ্যে বেদকে তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, সমগ্র বেদটা একখানি গ্রন্থ, যদিও ইহা চারিভাগে বিভক্ত। তাঁহার যুগের ব্রাহ্মণগণ ইহা পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহার অর্থ বুঝিতেন না। বেদকে তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পুরাণ তাঁহার মতে ঋষিদের রচিত গ্রন্থ। পুরাণ অষ্টাদশ খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে

অনেক গাল-গল্প থাকিলেও বহু নীতি ও উপদেশে ইহা পরিপূর্ণ; এবং ইহার অনেক গল্প রূপক। স্মৃতিশাস্ত্র বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে আইন, কার্যাবিধি, ধর্মনীতি প্রভৃতি বিষয় আছে।

বিজ্ঞানালোচনার জন্য যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি আর্যদের জানা ছিল, এবং তাঁহাদের বিজ্ঞান বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল, যথা, বস্তুবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মাপবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁহারা প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন. আল্-বেরুনী আর্যদের জ্যোতির্বিদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষসম্বন্ধে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, জ্যোতির্বিদ্যাসম্বন্ধে আর্যদের জ্ঞান গ্রীক হইতেও স্পষ্ট ছিল। কিন্তু ফলিত জ্যোতিষকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই, এবং এ কথাও বলিয়াছেন যে, সে যুগের অনেক দার্শনিক হিন্দু তাহাতে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। রসায়ন ও ঔষধতত্ত্বে আর্যদের যে বিশেষ জ্ঞান ছিল, তাহা আল্-বেরুনী বার বার বলিয়াছেন। চরকের গ্রন্থ ঔষধ বিজ্ঞানের মূল ও প্রামাণিক গ্রন্থ।

পঞ্চতন্ত্রখানি অনুবাদ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গল্প অপেক্ষা বিদ্যার্জনের দিকে এঁহার বেশী ঝোঁক ছিল বলিয়া তিনি তাহাতে হাত দেন নাই।

আল্-বেরুনী অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন, কতকগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন, শ্রেণী বিভাগ করেন। আবার কতকগুলির লিপি উদ্ধারও করিয়াছিলেন, এবং তিনি অনেক গ্রন্থকে অবজ্ঞা ও বিস্মৃতির গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়া লোক-লোচনের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। বহু দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ যে অমর কীর্তি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দশম শতাব্দীর ভারতের এক উজ্জ্বল ইতিহাস। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথায় বলিতে হয়, "যথার্থবাদী ঐতিহাসিক বলিয়া, ভারতের প্রাচীন বিদ্যার একাগ্রচিত্ত অনুশীলনকারী বলিয়া সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে আল্-বেরুনীর নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হয়, এবং তাঁহার বই সমত্নে পঠিত ও আলোচিত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে সত্য পরিচয়-স্থাপনের চেষ্টায় জ্ঞানকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন বলিয়া আল্-বেরুনী সমস্ত সভ্য মানবের সাধুবাদের যোগ্য।"

আজ আমরা জাতিসমন্বয়, ধর্মসমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক মিলন ও সম্প্রীতির

কথা আলোচনা করি; অথচ যাহাদের সহিত সমন্বয় ও মিলন করিতে যাইব, তাহাদের ভিতরের খবর একেবারেই রাখি না। আর যাহা রাখি, তাহা মিস্ মেয়ো, অথবা স্যার উইলিয়াম মুইরের পক্ষপাতপূর্ণ একদেশদর্শী গ্রন্থ পাঠ করিয়া। আমাদিগকে এই পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং আল্-বেরূনীর পন্থা অবলম্বন করিয়া অপরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।

আল্-বেরূনীর বহু পরে ভারত-সম্রাট্ শাহ্‌জাহান-পুত্র মহাত্মা সাধক দারা শিকোহ্ এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং তিনি সেই উদ্দেশ্যে কতিপয় পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। 'মজ্‌মা-উল-বাহ্‌রায়েন'—অর্থাৎ "দুই সাগরের মিলন" নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি আমাদিগকে এই পথের নির্দেশ দিয়াছিলেন। মহাজন নির্দ্দেশমত সেই সব পথ ধরিয়া যদি আমরা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পরস্পরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বিষয় আলোচনা করি এবং পূর্ব্ব হইতে বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব পরিত্যাগ করি, তবে আশা করা যায়—মহামনীষী আল্-বেরূনীর সাধনা সার্থক হইবে—মহাপ্রাণ সাধক দারা শিকোহ্‌র আত্মবলিদান সফল হইবে, এবং ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতিগত সমন্বয়, মিলন ও সম্প্রীতি সম্ভব হইবে।

রেজাউল করীম

— · — —

স্বদেশমন্ত্র

বাহ্য জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে প্রত্যক্ষ শক্তি সংগ্রহ-রূপ, প্রমাণ বাহন, শতসূর্য্য-জ্যোতিঃ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি-প্রতিঘাতী প্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষীর উদ্ঘাটিত, যুগ-যুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্ব্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ব্বপুরুষদিগের অপূর্ব্ব বীর্য্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্ব-কাহিনী।

একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী স্বরে, পূর্ব্ব-দেবাদিগের আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্রিত পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গীতে অপূর্ব্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান ইত্যাদির দৃশ্য উপস্থিত হইয়াছে। একদিকে পাশ্চাত্ত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্য্যসমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্ত্য দেশে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাজনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায় ত্যাগ। বর্ত্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে—বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্ম কল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্ব্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছি—

"ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ।
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।।"

একদিকে, নব্য ভারত-ভারতী বলিতেছেন, পতি-পত্নী-নির্ব্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত; কারণ, যে বিবাহ আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্ব্বাচন করিব; অপরদিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

একদিকে, নব্য ভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্ত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্ত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন হইব; অপরদিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহ-চর্ম্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?

একদিকে, নব্য ভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্ত্য জাতিরা যাহা করে, তাহাই ভাল; ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপরদিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান!

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টাযত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই?

আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ কি সর্ব্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।" যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্ব্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। কিন্তু একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, "বুঝি কোনও ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল।"

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা; পাশ্চাত্ত্য অনুকরণমোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি বিচার শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গেরা যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই

ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?

পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল; পাশ্চাত্য নারী স্বয়ংবরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান; পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ, ভূষা, অশন, বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ; পাশ্চাত্যেরা মূর্তিপূজা দোষাবহ বলে,—অতএব মূর্তিপূজা অতি দূষিত, সন্দেহ কি?

পাশ্চাত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিসর্জন দাও। পাশ্চাত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে, অতএব সর্ববর্ণ একাকার হও। পাশ্চাত্যেরা বাল্যবিবাহ সর্বদোষের আকর বলে, অতএব তাহা অতি মন্দ নিশ্চিত।

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য—ইহাই বিচার করিতেছি না; তবে যদি পাশ্চাত্যদিগের অবজ্ঞাদৃষ্টিই আমাদের রীতিনীতির জঘন্যতার কারণ হয়, তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্তব্য।

বড়লোকের দিকে সকলে যায়, গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গায়ে কোনওপ্রকারে একটু লাগে, দুর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয়-বেশ-ভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!! চতুর্দশ শত বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্শী এক্ষণে আর "নেটিভ" নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রাহ্মণগৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি উহারা অনার্যজাতি!! উহারা আর আমাদের কেহ নহে!!!

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের বা নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই

"মায়ের" জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামানবের ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সুন্দর

যারা ভাবি পণ্ডিত তারা সুন্দরকে প্রদীপ ধরে দেখতে চলে আর যারা কবি ও রূপদক্ষ তারা সুন্দরের নিজেরই প্রভায় সুন্দরকে দেখে নেয়, অন্ধকারের মধ্যেও অভিসার করে তাদের মন। আলোর বেলাতেই কেবল সুন্দর আসেন দেখা দিতে, কালোর দিক থেকে তিনি দূরে থাকেন—একথা একেবারেই বলা চলে না, বিষম অন্ধকার না বলে বলতে হ'ল বিশদ অন্ধকার যদিও ভাষাতত্ত্ববিদ্ এরূপ কথায় দোষ দেখবেন। কালো দিয়ে যে আলো এবং রঙ সবই ব্যক্ত করা যায় সুন্দরভাবে তা রূপদক্ষ মাত্রেই জানেন। এই যে সুন্দর কালো এর সাধনা বড় কঠিন। সেইজন্য জাপানে ও চীনদেশে একটা বয়স না পার হ'লে কালি দিয়ে ছবি আঁকতে হুকুম পায় না গুরুর কাছ থেকে শিল্পশিক্ষার্থীরা। যে রচনায় রস রইলো সেই রচনাই সুন্দর হ'ল এটা স্থির, কিন্তু রস পাবার মত মনটি সকল মানুষেই সমানভাবে বিদ্যমান নেই, কাজেই এটা ভাল ওটা ভাল নয় এই রকম কথা ওঠে। মেঘের সঙ্গে ময়ূরের মিত্রতা, তাই কোন্ একদিন নিজের গলা থেকে গন্ধর্ব্বনগরের বিচিত্র রঙের তারা-ফুলে গাঁথা রঙ্গীন মালা ময়ূরের গলায় পরিয়ে দিয়ে মেঘ তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলে। মানুষ প্রথম ভাবলে, এমন সুন্দর সাজ কারো নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সে দেখলে বকের পাতি পদ্মফুলের মালার ছলে সুন্দর হয়ে মেঘের বুক থেকে মাটির বুকে নেমে এল,—মানুষ বল্লে, ময়ূর ও বক এরা দুইটিই সুন্দর। আবার এল একদিন জলের ধারে সারস পাখী -মেঘ যাকে নিজের গায়ের রঙে সাজিয়ে পাঠালে। এমনি একের পর এক সুন্দর দেখতে দেখতে মানুষ বর্ষাকাল কাটালে, তারপর শরতে দেখা দিলে আকাশে নীলপদ্মমালার দুটি পাপড়িতে সেজে নীলকণ্ঠ পাখী। এমনি ঋতুর পর ঋতুতে সুন্দরের সন্দেশ-বহ আসতে লাগলো একটির পর একটি মানুষের কাছে—সবশেষে এলো রাতের কালো পাখী আকাশপটের আলো নিভিয়ে অন্ধকার দুখানি পাখনা মেলে -পৃথিবীর কোন ফুল, আকাশের কোন তারার সঙ্গে মানুষ তার তুলনা খুঁজে না পেয়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো।

এই যে একটি মানুষের কথা বল্লেম, এমন মানুষ জগতে একটি দুটি পাই যার কাছে সুন্দর ধরা দিচ্ছেন সকল দিকে নানা সাজে নানা রূপে বর্ণে সুরে ছন্দে! সবই সুন্দর, কদাচিৎ নয়, কাক নয় এই কথা যারা বলছে এমন মানুষই পৃথিবী ছেয়ে রয়েছে দেখতে পাই।

যার চোখ সুন্দরকে দেখতে পেলে না আজন্ম তার চোখের উপরে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা ঘষে ঘষে ক্ষইয়ে ফেল্লেও ফল পাওয়া যায় না, আবার যে সুন্দরকে দেখতে পেলে সে অতি-সহজেই দেখে নিতে পারলে সুন্দরকে, কোনো গুরুর উপদেশ পরামর্শ এবং ডাক্তারি দরকার হ'ল না তার, বিনা অঞ্জনেই সে নয়নরঞ্জনকে চিনে নিলে।

মাটি থেকে আরম্ভ ক'রে সোনা পর্যন্ত, যে ভাষায় কথা চলে সেটি থেকে ছন্দোময় ভাষা পর্যন্ত, তারের সুর থেকে গলার সুর পর্যন্ত বহুতর উপকরণ নিয়ে রূপদক্ষেরা রচনা ক'রে চলেছেন সুন্দরের জন্য বিচিত্র আসন, মানুষের কাজে কতটা লাগবে কি না লাগবে এ ভাবনা তাঁদের নেই। কাদার যে গড়ে সে কাদাছানা থেকেই সুন্দরের ধ্যান ক'রে চলে, না হ'লে গড়ার উপযুক্ত ক'রে মাটি কিছুতে প্রস্তুত করতে পারে না সে—একথাটা কারিগরের কাছে হেঁয়ালী নয়। চাষের আরম্ভ থেকেই সোনার ধানের স্বপ্ন জমীতে বিচিয়ে দেয় চাষা, কিন্তু যার সুন্দরের ধ্যান মনে নেই সে যখন ভাল মাটি নিয়ে ব'সে যায় এবং দেখে মাটি বাগ মানছে না তার হাতে, তখন সে হয়তো বোঝে হয়তো বোঝেও না কথাটার মর্ম্ম।

ছন্দ, সুর-সাধা এবং রঙ প্রস্তুত ও তুলি-টানার প্রকরণ সহজে মানুষ আয়ত্ত করতে পারে, কিন্তু তুলি-টানা হাতুড়ি-পেটা কলম-চালানোর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দরের ধ্যানে মনকে স্থির রাখতে সবাই পারে না, এমন কি যারা রূপদক্ষ তারাও সময়ে সময়ে লক্ষ্য হারিয়ে ফেলছে তাও দেখা যায়।

যে রচনাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তার মধ্যে রচনার কল-কৌশল ধরা যায় না—কথা সে যেন ভারি সহজে বলা হয়ে যায় সেখানে। এই যে সহজ গতি এ থাকে না যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয় তাতে—কৌশল নৈপুণ্য সবই চোখে পড়ে। কবিতা থেকে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, ছবি মূর্ত্তি সব থেকে এটা প্রমাণ করা চলে। কর্ম্ম কোনো রকমে নিষ্পন্ন হ'ল এবং কর্ম্ম খুব হাঁকডাক ধুমধামে নিষ্পন্ন হয়ে গেল, কিন্তু কর্ম্মের জঞ্জালগুলো চোখে পড়লো না।

আমি একবার একটা ছাপার কল অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। যন্ত্রটা একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষের কাজ একা করছে, মানুষের চেয়ে সুচারু ও দ্রুতভাবে। এতে ক'রে ভারি একটা আনন্দ হ'ল, কিন্তু একটি পাখীকে উড়তে দেখে যে আনন্দ তার সঙ্গে সেদিনের আনন্দের তফাৎ ছিল। পাখীর ডানার মধ্যে নানা কল-বল কি ভাবে কাজ করছে তার খোঁজই নেই, ওড়ার সুন্দর ছন্দই সেখানে দেখা দিয়ে মনকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কোন্ দেশে তার ঠিক নেই। সৃষ্টির নিয়মে সমস্ত সুন্দর জিনিষ আপনার নির্ম্মাণের কৌশল লুকিয়ে চলো দর্শকের কাছ থেকে এবং এই নিয়মই মেনে চল্লো সমস্ত সুন্দর জিনিষ যা মানুষে রচনা ক'রলে—যেখানে নির্ম্মাণের নানা প্রকরণ ও কৌশল ধরা প'ড়ে গেল সেখানেই রচনার সৌন্দর্য্য হানি হ'ল, কলের দিক্ ফুটলো কিন্তু রসের দিক্ সৌন্দর্য্যের দিক্ চাপা প'ড়ে গেল। ঘুড়ি যখন আকাশে ওড়ে তখন যে কলটি তাতে বেঁধে দেয় কারিগর, সেটি বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে যায় তবেই সুন্দর ঠেকে ঘুড়িখানির ওড়ার ছন্দ। জাহাজ এমন কি উড়ো কল তারাও দেখায় সুন্দর এই কারণে এবং সবচেয়ে দেখায় সুন্দর গঙ্গার উপরে নৌকাগুলি যার চলার হিসেব ও কল-বল প্রত্যক্ষ হয়েও চক্ষুশূল হচ্ছে না।

সুন্দর জিনিষের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা—যেমন রূপ, তেমনি ভাব। বহিরঙ্গ যা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়ে সুন্দর বর্ত্তমান হ'ল। চোখের বাইরে যে পরকল্য তার সঙ্গে চোখের ভিতরে যে মণিদর্পণ তার যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য হ'ল; তখনই সুন্দর-ভাবে দেখতে পাওয়া গেল বিশ্বের জিনিষ, চশমার কাচে আঁচড় প'ড়লো চোখ রইলো পরিষ্কার, কিংবা চোখের মণিতে ছানি প'ড়লো চশমা রইলো ঠিকঠাক এ হ'লে সুন্দর দেখা একেবারেই সম্ভব হ'ল না।

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভদ্রতা

ভদ্রতা আত্মীয়তার চেয়ে কিছু কম এবং সামাজিকতার চেয়ে কিছু বেশী। আত্মীয়তা আন্তরিক, সামাজিকতা আনুষ্ঠানিক। ভদ্রতা উভয়ের মধ্যে সেতু-স্বরূপ, এবং উভচর।

এই বন্ধনের গুণেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা সম্ভবপর হয়, নচেৎ বাকি শুধু উচ্ছৃঙ্খল একাচার পশুত্ব,—কিংবা মূক নিরাকার দেবত্ব।

অবশ্য যেখানে ভালবাসা, ভক্তি, ভয় বা অন্য কোন ভ-পূর্ব্বক ভাবাত্মক সম্বন্ধ বিদ্যমান, সেখানে ভদ্রতার কথা ওঠেই না,—কারণ, খণ্ড ত সমগ্রের অন্তর্গত। যেখানে সন্তুষ্ট করবার ইচ্ছে স্বাভাবিক, সেখানে ব্যবহার ত আপনা হইতেই শুধু শিষ্ট কেন, মিষ্টই হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে অপরিচয় বা অতি পরিচয় বা ঔদাসীন্যবশতঃ মন সহজে অনুকূল নয়, সেইখানেই ভদ্রতার শিক্ষা ও চর্চ্চার প্রয়োজন। অর্থাৎ মনোভাব যেমনই থাকুক না কেন, লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নাম ভদ্রতা। এবং যে সমাজ যত সভ্য, তার লোক-ব্যবহার তত সদ্ভাবমূলক ও সুরুচিব্যঞ্জক।

সকলের মত এক না হলেও যেমন কার্য্যক্ষেত্রে অধিকাংশের মতে মত দিতে হয়, নইলে কাজ চলে না; তেমনি সকলের মন সমান না হলেও, সামাজিক অনুষ্ঠানে সৌভাগ্য ও সৌষ্ঠব রক্ষার্থে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয় তাকে বলে রীতি। ভদ্রতা রীতিমাত্র নয়, তার চেয়ে কিছু বেশী উদার। কারণ, রীতি ক্রিয়া-কর্ম্মক্ষেত্রে ও স্বশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ. কিন্তু ভদ্রতা সমাজবিশেষ ও স্থানবিশেষ ছাড়িয়ে সকল সমাজ এবং সকল অবস্থায় পরিব্যাপ্ত। মানুষমাত্রেই পরস্পরের কাছে তা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা দাবি করতে পারে।

অপরপক্ষে নীতির তুলনায় ভদ্রতার ক্ষেত্র অনেক সংকীর্ণ। কোমর বেঁধে পৃথিবীর দুঃখ দূর বা পরের উপকার করতে যাওয়া, কিংবা ন্যায়ান্যায়ের বিচারপূর্ব্বক চলা, অথবা মহৎ কর্ত্তব্য পালন করা ভদ্রতার এলাকা নয়। যারা কাছাকাছি আছে, কিংবা ঘটনাচক্রে এসে পড়েছে, তাদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করাই তার মূল উদ্দেশ্য। সাময়িক এবং উপস্থিত নিয়ে তার কারবার,—কিন্তু অভাবপক্ষে তারই মধ্যে খণ্ডপ্রলয় বেধে যেতে পারে।

কিন্তু রীতির সঙ্গে ভদ্রতার এইটুকু সাদৃশ্য আছে যে, সব সময় সকলের প্রতি সকলের মনে সমান সদ্ভাব থাকা যখন সম্ভব নয়, তখন অন্ততঃ বাইরের প্রকাশের সুষমাবিধানার্থে অনুষ্ঠানের ন্যায় ব্যবহারকেও কতকগুলি নিয়মাধীন করা সমাজ আবশ্যক মনে করে। আর নীতির সঙ্গে তার এইটুকু সাদৃশ্য আছে যে, মানুষের অন্তরতম প্রদেশে যদি মানুষের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি না থাকত ও পরস্পরের মনে আঘাত দেবার সহজ অপ্রবৃত্তি না হ'ত, তাহ'লে দীর্ঘকাল ধরে বহু লোকের পক্ষে সে নিয়ম রক্ষা করে চলা প্রায় অসম্ভব হ'ত। সুতরাং ভদ্রতাকে সংক্ষেপে লোকব্যবহারের ক্ষুদ্র রীতিনীতি বলা যেতে পারে। কিংবা মনুষ্য সম্বন্ধের 'স া গু',—অর্থাৎ প্রত্যেকের পরস্পরের প্রতি সেই পরিমাণ সদ্ভাব-প্রকাশ, যেটুকু নইলে জীবন যান তৈলাভাবে অচল হয়ে পড়ত। কি ঘরে, কি বাইরে, এই সামান্য স্নেহলাভেও যে অনেক সময় মানুষকে বঞ্চিত হতে হয়, সেটি বড়ই দুঃখের বিষয়। অবশ্য সভ্যসমাজে অধিকাংশ লোকই স্পষ্টতঃ অভদ্র নয়, কিন্তু যে মার্জ্জিত ও মোলায়েম, সদাশয় ও সুশ্রী, চৌকোষ ও চোস্ত ব্যবহারকে যথার্থ ভদ্রতা বলা যেতে পারে, তাও সুলভ নয়।

অনেকে আজকাল আক্ষেপ করেন যে, একালের ছেলেদের ভদ্রতা কমে গিয়েছে। যেহেতু অল্প লোকেরই দিকালজ্ঞ হবার সুযোগ ঘটে, সে কারণ আমি এ কথার সমর্থন বা প্রতিবাদ করতে অক্ষম। তবে এইটুকু স্বীকার্য্য যে, আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার দিন এদেশে গেছে বা যেতে বসেছে।

তার কারণ হয়ত এই যে একালের লোকের সময়-সংক্ষেপ। প্রত্যেক চিঠির লাইন যোড়া ভিন্ন ভিন্ন পাঠ শিখতে ও লিখতে হ'লে বোধ হয় ইস্কুলের পাঠ বন্ধ করতে হয়। আর উঠতে বসতে যদি প্রত্যেক গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়, কিংবা সকলের কুশল প্রশ্ন অন্তে অন্য কথা পাড়তে হয়, তাহলেও আধুনিক জীবনযাত্রা চালানো দায় হয়ে পড়ে।

আর এক কারণ এই হ'তে পারে যে, একালে গুরু-লঘু সম্পর্কের দূরতাকে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত করবার দিকে আমাদের ঝোঁক হয়েছে। মাকে 'আপনি' বলা, বাপ খুড়োর সামনে তটস্থ হয়ে থাকা, শাশুড়ী-ননদের কাছে এক হাত ঘোমটা টেনে ইসারায় কথা কওয়ার আমলের তুলনায় আজকাল আমরা হয়ত অপেক্ষাকৃত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি।

কিন্তু এমন যে ব্রাহ্মণ জাতি,—যার তুল্য গুরু সেকালে ছিল না, তারাও যখন কালিকালে পূর্ব্বপ্রাপ্য পদমর্য্যাদা থেকে চ্যুত হ'তে বাধ্য হয়েছেন, তখন অন্যান্য গুরুজনকেও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণে নিজ নিজ বাকি খাজনা এবং উপরি পাওনার লোভ সংবরণপূর্ব্বক সমতল সমকক্ষতার ক্ষেত্রে হাসিমুখে নামতে হবে, এবং কালের সঙ্গে সমপদবিক্ষেপে চল্‌তে হবে। সুতরাং উপরি-উক্ত অনুষ্ঠানের ত্রুটি মার্জ্জনা ক'রে দেখতে হবে যে, সারভূত ভদ্রতার লক্ষণ কি,—যে ভদ্রতা সব দেশের, সব কালের এবং সব পাত্রের।

প্রতীক বা স্মরণচিহ্ন রচনার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মজ্জাগত। অসীমকে সসীমে বাঁধবার, নিরাকারকে সাকারে ধরবার প্রয়াস তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা সকলেই পৌত্তলিক ; তবে প্রকাশের তারতম্য আছে, সাকারীকরণের মাত্রাভেদ আছে। মূর্ত্তিও সাকার, মন্ত্রও সাকার,—কিন্তু কম বেশী। বড়কে ছোটর দ্বারা, ব্যষ্টিকে সমষ্টি দ্বারা, অরূপকে রূপ দ্বারা প্রকাশ করবার এই চেষ্টার উদ্দেশ্য অস্পষ্টকে পরিস্ফুট এবং অলক্ষ্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা। তোমার মনে অনেকখানি ভক্তি থাকতে পারে, কিন্তু বাইরে তার কোন চিহ্ন না দেখালে আমিই বা জানব কি ক'রে, তুমিই বা জানাবে কি ক'রে?—অতএব প্রণাম কর। অতএব দাম্পত্য-জীবনের বন্ধন লৌহ দ্বারা স্মরণ করাও, তার আনন্দ সিন্দুর-অলক্তক-তাম্বুলের লোহিত রাগে ব্যক্ত কর ; এবং বৈধব্যের শূন্যতা বরণাভরণ-হীন বেশে সূচিত হোক্। খৃষ্টের পরার্থপর অমানুষিক যন্ত্রণা একটি ক্রুশের চতুঃসীমায় আবদ্ধ, বিশ্বলক্ষ্মীর অপরিসীম, অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য একটি পদ্মে বিকশিত, ভক্তির চক্ষে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি একটি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত।

এই চিহ্নতন্ত্রে লাভও আছে, যেহেতু মানুষের সহজ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংযত ক'রে আনবার সাহায্য করে; আবার ক্ষতিও আছে, যেহেতু জড়বস্তু দ্বারা চেতনকে, অনুষ্ঠান দ্বারা অনুভূতিকে চাপা দেবারও সাহায্য করে। প্রণাম আন্তরিক ভক্তিজ্ঞাপনও করতে পারে, আবার তার অভাব গোপনও করতে পারে।

সেইজন্য সত্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের সেই সকল প্রমাণের প্রতি বোধ হয় মানুষের বেশী ঝোঁক হয়েছে, যা অত সুলভ ও ক্ষণস্থায়ী নয়; যা একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট আচরণে পর্য্যবসিত নয়, কিন্তু সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত।

এইজন্যই বলছিলুম যে, আনুষ্ঠানিক বা স্থূল ভদ্রতা অপেক্ষা আজকাল সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর মূল ভদ্রতার মূল্য বেশী হতে চলেছে। দেশকাল-ভেদে প্রথমোক্তের নানা ভিন্ন প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু শেষোক্ত-সম্বন্ধে মতভেদের অবসর কম। ভদ্রতার এই বাহ্য আকৃতিবৈষম্য ভুলে গিয়ে তার অন্তঃপ্রকৃতি বিশ্লেষণের প্রতি মন দিলে দেখতে পাব যে, তার কতকগুলি লক্ষণ সর্ব্বজনীন ও সর্ব্ববাদিসম্মত।

প্রথমতঃ—ভদ্রতার মূল পরহিতৈষণা, এবং তার ফল সংযম। উপস্থিতমত পরের যাতে কষ্ট না হয়, -আমার বাড়ী এসে বা আমার সম্পর্কে থেকে ক্ষণকাল যাতে অন্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, -ভদ্রলোকের স্বভাবতই এই ইচ্ছা হয়। এবং সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে হলে অনেক সময় নিজের তৎকালীন প্রতিকূল ইচ্ছা দমন করতে হয়, নিজের আপাত সুবিধা বিসর্জ্জন দিতে হয়। আমার যে সময় জরুরী কাজ আছে, সে সময় হয়ত একজন দেখা করতে এলেন; ভদ্রতার নিয়মানুসারে আমার সব কাজ ফেলে রেখে তাঁর আতিথ্যে মনোনিবেশ করতে হবে। কিংবা হয়ত কোন মাননীয় ব্যক্তি আমার মুখের সামনে হয়ত নয়, সাদাকে কালো বলছেন, আমার কণ্ঠাগ্রে এলেও মুখে বলবার সাধ্য নেই যে, "ওগো, তুমি মিথ্যে কথা বলছ", কিংবা আর একজনকে—"তোমার নিজেরই সম্পূর্ণ দোষে ত্রুটি ঘটেছে" কিংবা অপর একজনকে—"অন্যের নিন্দা করবার আগে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখলে ভাল হয় না?"

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে সম্প্রতি যে অভদ্রতার প্রাদুর্ভাব হয়েছে, এই প্রসঙ্গে সেজন্য দুঃখপ্রকাশ না করে থাকা যায় না। সরস্বতীর মন্দিরে প্রবেশ করবার সময়ও কি জুতোজোড়াটার সঙ্গে আমরা বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ দলাদলির ভাবটা বাইরে রেখে আসতে পারিনে? অবশ্য সাহিত্যচর্চ্চার যদি কোন উচ্চ লক্ষ্য থাকে ত সে কেবল লীলা-কমলের বীজনে অবলীলাক্রমে সাধিত হবে না, তা জানি, -অকল্যাণকে তাড়াতে হলে মধ্যে মধ্যে কুলোর বাতাসও দেওয়া চাই। কিন্তু তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম মারাত্মক অস্ত্র যে কোন প্রকার ভাষার অস্ত্র সাহিত্যরথী ব্যবহার করুন না কেন, ইতরতা বা দুষ্টতার অস্ত্রপ্রয়োগ এস্থলে নিষিদ্ধ হওয়া

উচিত। যিনি বাণীর সেবক হবার স্পর্দ্ধা রাখেন, অশুদ্ধ বাণী ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে বিশেষরূপে বিসদৃশ নয় কি?

স্পষ্টবাদীর দল উল্লিখিত সংযমাত্মক ভদ্রতাকে কপটতার নামান্তর মনে করেন। "আমার বাপু স্পষ্ট কথা" ব'লে আরম্ভ ক'রে তাঁরা মুখে যা আসে তাই বল্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না, বরং গর্ব্বই অনুভব করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা ক'রি, মন এবং মুখের মধ্যে একটা পাকা বাঁধ বেঁধে না রাখলে দু'দিনও কি সমাজ টিকতে পারে?—আমার ত মনে হয় কতকগুলি কথা বা বিষয়কে একঘরে করা ভালই হয়েছে। স্পষ্টবাদিতার দোহাই দিয়ে ভদ্রসমাজে সে বাঁধ ভাঙ্গার আমি ত কোন বাহাদুরি বা সুবিধা দেখতে পাইনে। সামান্য একটি খিল খুলে দিলে অতি বড় বন্ধনও সহজে শিথিল হয়ে পড়ে, একটি পরদা তুলে ফেল্লেও অনেকটা আব্রু নষ্ট হ'তে পারে। কথার সংযম কিছু কম গুরুত্বের জিনিস নয়। যদি তা কপটতাই হয় ত সে-পরিমাণ কপটতা সমাজরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। আমাদের কান যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূক্ষ্ম শব্দের বেশী শুনতে পায় না, চোখ যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বের বেশী দেখতে পায় না তেমনি বোধ হয় অখণ্ড সম্পূর্ণ সত্য আমাদের মন গ্রাহ্য বা সহ্য করতে পারবে না ব'লেই ভগবান্ দয়া ক'রে অন্তরের আড়ালে রেখে দিয়েছেন। ঐখানেই ত তাঁর ভদ্রতা!—বেশী তলিয়ে বুঝে লাভ কি? অনেক সময় কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোয়, কিংবা ঐ কথাই একটু ঘুরিয়ে ভাব দিয়ে বলা যেতে পারে যে, অনেক সময় সত্য খুঁজতে খুঁজতে শুধু "নিখিল অশ্রুসাগরকূলে" গিয়ে পৌঁছতে হয়।

কিন্তু অল্প মাত্রায় যা উপকারী, বেশী মাত্রায় তাতেই হিতে বিপরীত হ'তে পারে,—যথা, হোমিওপ্যাথি ওষুধ। পরের মনে লাগানো কথা বলব না ব'লেই যে পরের মন যোগানো কথা বল্‌তে হবে, তার কোন মানে নেই। কেউ কেউ ভদ্রতার সঙ্গে খোসামুদির তফাৎ করতে পারেন না ব'লে নিজের মানরক্ষার জন্য পরকে অপমান করা আবশ্যক এবং কর্ত্তব্য বোধ করেন। কিন্তু এ দু'য়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে ব'লে ত আমার বিশ্বাস। ভদ্রতার সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি, খোসামুদির দৃষ্টি কেবল নিজের প্রতি; ভদ্রতা নিজের অসুবিধা ক'রেও পরের সুবিধা ক'রে দিতে উৎসুক, খোসামুদি নিজের সুবিধাটুকুই বোঝে ও খোঁজে; ভদ্রতা চৌকোষ, সবল ও সুন্দর,—খোসামুদি একপেশে, কুটিল ও কুৎসিত। একটু সংসারজ্ঞানের চর্চ্চাই খোসামুদি এড়াবার প্রকৃষ্ট উপায়। যে

পৃথিবীতে এসেছি, সেটা কি রকম জায়গা জানতে না পারলে উন্নতিচেষ্টা করব কি করে?—যেখানে শক্ত, সেইখানেই ভক্ত বা অতি ভক্ত!—যেখানে অক্ষমতা সেইখানেই পরমুখাপেক্ষিতা। ছোট ছেলে কি কম খোসামুদে? তবে তাদের সবই সুন্দর।

আর একটি জিনিস আছে, যা ভদ্রতার বেনামিতে চলে, অথচ বেশী পরিমাণে যা ক্ষতিকর,—সেটি হচ্ছে চক্ষুলজ্জা। এটি আমাদের দেশের ও জাতের একটি রোগবিশেষ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, এবং খুব কম লোকই সে রোগ হ'তে মুক্ত। মনে মনে আমার কোন একটি অনুরোধ রক্ষা করবার মোটেই ইচ্ছা নেই, এমন কি অভিপ্রায় নেই,—অথচ চক্ষুলজ্জায় পড়ে আমি অনুরোধকর্ত্তার সামনে বেশ একটু উৎসাহসহকারেই তার প্রস্তাবে সম্মত হলুম। এ স্থলে যদি বিরক্তভাবে কাজটা ক'রে দিই ত মন্দের ভাল; কিন্তু একবার একজনের জন্য করলেই ত অব্যাহতি পাওয়া যায় না, আর ক্রমাগত অনিচ্ছাসত্ত্বে ঢোঁক গিলুলেও নিজের হজমশক্তির উপর একটু অত্যাচার করা হয়। আবার যদি করব ব'লে না করি, তাহ'লে নিজের কথারও খেলাপী হয়, নিজের মনও খুঁৎখুঁৎ করে, আর অনর্থক পরের আশাভঙ্গও করা হয়। মতামত সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ভদ্রতার সঙ্গে একটু দৃঢ়তা মেশানোই উক্ত রোগের একমাত্র চিকিৎসা। অমায়িক অথচ আত্মপ্রতিষ্ঠ, লোকপ্রিয় অথচ সত্যনিষ্ঠ,—এমন সংমিশ্রণ এদেশে এত দুর্লভ কেন? কেন খাঁটি লোক যেন রুক্ষ হ'তেই বাধ্য, এবং শিষ্ট শান্ত ব্যক্তির উপর জুলুম হওয়াটাই নিয়ম?—তাও বলি যে, দাতা ও গ্রহীতা না হ'লে যেমন দান সম্পূর্ণ হয় না, তেমনি অনুরোধকারীও মাত্রা বুঝে পীড়াপীড়ি করলে তবেই ভদ্রতা রক্ষা করা সম্ভব,—নইলে অযথা টান পড়লে ছিঁড়তে কতক্ষণ!

সংযম যেমন ভদ্রতার প্রধান নিবৃত্তিমূলক লক্ষণ, তেমনি সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি বা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা তার প্রধান প্রবৃত্তিমূলক লক্ষণ। অর্থ-সামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি, রূপগুণ, মানমর্য্যাদা যার যেমনই থাকুক না কেন কম হ'লেও তাকে পায়ের তলায় ঠাসবার দরকার নেই, বেশী হ'লেও তার পায়ের তলায় পড়ে থাকবার দরকার নেই। যাকে ভাল লাগে তার সঙ্গে গলাগলিও ক'র না, যাকে মন্দ লাগে তাকে গালাগালিও দিও না, সকলের প্রতি সহজ সদয় ব্যবহার ক'র,—এই হচ্ছে ভদ্রতার বিধান। ভদ্রতা ব্যবহার-নীতি মাত্র, মনের নিয়ন্তা নয়। তবে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে, বাইরে যে ভাব দেখানো যায়, সেটা ক্রমে

মনের ভিতর পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়, যেমন রাগের প্রকাশ দমন করতে করতে রাগ কমে আসা সম্ভব। পূর্ব্বে ভদ্রতাকে বাঁধ বলেছি; আবশ্যক-স্থলে এই বাঁধই যে প্রাচীরের কাজ করতে পারে, তার আর আশ্চর্য্য কি?—যেখানে এই প্রাণের এই আড়ালটুকু রাখতে চাইনে, অর্থাৎ যেখানে প্রকাশই উদ্দেশ্য—সেখানে অবশ্য ভদ্রতার কাজ ফুরায় এবং উচ্চতর নেতার হাতে রাজদণ্ড দিয়ে সে সরে পড়ে।

সেইজন্যই আত্মীয়তা যেখানে শুধু রক্ত নয়, অনুরক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভদ্রতার ব্যবধান সেখানে অনাবশ্যক,—এমন কি অপ্রীতিকর। অতি দুঃখের বিষয়, নিকট এবং স্থায়ী সম্পর্ক স্থলেও যখন সব সময়ে আশানুরূপ মনের মিল থাকে না, তখন আত্মীয়ের মধ্যেও সাধারণতঃ ভদ্রতার নিয়ম উপেক্ষা না করাই ভাল। একসঙ্গে থাকতে গেলে অষ্টপ্রহর মেজাজে মেজাজে স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ হয়ে যে উত্তাপ সঞ্চিত হয়, দৈনিক কর্ম্মজীবনযাত্রায় অনিবার্য ভাবে যে ধূলিজাল উত্থিত হতে থাকে, ভদ্রতার স্নিগ্ধ শান্তিবারিসিঞ্চনই তা কথঞ্চিৎ নিবারণের অন্যতম উপায়। নিজ নিজ পারিবারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই অধিকাংশ লোক বুঝতে পারবেন যে, সময়মত একটু সহৃদয় ব্যবহার, অবস্থা বুঝে একটু সংযম, একটি মিষ্টি কথা, একটি হাসির আলোর অভাবে শেষে পরস্পরের মনে এমন দাগ লেগে যায় যে, হাজার চেষ্টাতেও তা মুছে ফেলা যায় না, ভাঙ্গা জোড়া লাগলেও জোড়ের চিহ্ন চিরকাল থেকে যায়। হাঁড়ি কলসী একসঙ্গে থাকলেই ঠোকাঠুকি হয়, সে কথা সত্য, কিন্তু একটু ঘন করে প্রলেপ দিলে আওয়াজটা কম হয়, এবং টেকেও বেশীদিন! বাঙালীরাও পরিবারগতপ্রাণ। সেই পারিবারিক জীবনের উপর প্রায় তার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ নির্ভর করে। তাই সুখের সংসার গড়ে তোলবার কোন উপচারই আমাদের অবহেলা করা উচিত নয়। বাইরে যতই মানসম্ভ্রম নামডাক থাকুক না কেন, বাড়ীর ভিতরে শান্তি না থাকলে কোন সংসারী লোকের মনই তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। বরং শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ গৃহে এসে বাইরের বিতণ্ডা ও বিরক্তি ভুলতে পারা যায়।

আত্মীয়তা-ক্ষেত্র এত জটিল ও গভীর, এত রকম বাধাবাধকতাপূর্ণ ও দেনাপাওনাজড়িত যে, সেখানে ভদ্রতার চেহারা ভাল ফোটানো যায় না, ও বেশী নীতির কাছঘেঁষা হয়ে পড়ে। ঘরের বাইরে অনাত্মীয় যে বিস্তৃত সমাজ পড়ে আছে, সেইখানেই ভদ্রতার যথার্থ রূপ ও কদর বোঝা যায়, সেইটেই তার প্রকৃত

কর্ম্মক্ষেত্র। কারণ, এই ভদ্রতা সেতু পার হয়ে তবে ত ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গতায় পৌঁছানো যায়—যদি কপালে থাকে!

ভদ্রতা বিস্তৃত নীতিবাক্যের সামান্য একটি অংশমাত্র হলেও তার গৌরব ও প্রয়োজনীয়তা কিছু কম নয়। কথা ও কার্য্য—এই দুই ক্ষেত্রে তাকে বিভক্ত করা যেতে পারে, এবং দুইক্ষেত্রেই বিধিনিষেধ আছে। সেগুলি এত লোকবিশ্রুত, বাপমায়েরা এত করে সেগুলি ছেলেদের মনে বসাবার চেষ্টা করেন যে, পুনরাবৃত্তি বাহুল্য। জানে শোনে সবাই সব, কিন্তু সব সময় কাজে লেগে ওঠে না, সেইটিই দুঃখের বিষয়। "পাঞ্চ" নামক বিলাতী হাসির কাগজে মজার কথাগুলি প্রায়ই এই দুই শিরোনামাঙ্কিত থাকে:—এক, "Things that had better been left unsaid" আর এক, "Things that ought to have been expressed otherwise" অর্থাৎ যা না বললে ভাল হ'ত, এবং যা অন্য রকমে বলা উচিত ছিল। ভদ্রতা সম্বন্ধে বাচনিক নিষেধ অধিকাংশ এই দুই শ্রেণীভুক্ত। এ বিষয়ে "সত্যং ব্রুয়াৎ' শ্লোকে যে লাখ কথার এক কথা বলা হয়েছে, তার উপর আর কিছু বলবার নেই। কার্য্যক্ষেত্রে ভদ্রতার এই রকম কোন মূলমন্ত্র আমাদের শাস্ত্রে আছে কিনা জানি না; তবে ইংরাজিতে যাকে ব্যবহারের "Golden rule" (বা সোনার কাঠি') বলে, সেটা এস্থলেও খাটে। ছেলেবেলায় তার যে অনুবাদ শুনে হাসি পেত, সেটি এই:—"নিজে ব্যবহৃত হতে চাহিবে যেমন, কর কর ব্যবহার অপরে তেমন!" এর ভাষা যেমনই হোক, ভাব ঠিক আছে, এবং তার এই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, ছোটখাটো বিষয়ে রীতিরক্ষা, এবং অন্যের যাতে সুবিধা, সাহায্য বা তুষ্টিসাধন হয়, তাই করাই ভদ্রতা, ও তদ্বিপরীত করাই অভদ্রতা।

আমাদের রাজদরবার ছিল না বলে কিম্বা যে কারণেই হোক ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালাদেশে সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের একটু অভাব লক্ষিত হয়। উচ্চ নীচ সম্বন্ধ ব্যতীত সমকক্ষ মেলামেশার সকল অবয়ব যেন এখানে সম্পূর্ণ নয়। অপর জাতের সঙ্গে ব্রাহ্মণের দেখা হলে সাধারণ অভিবাদনের কোন নির্দ্দিষ্ট রীতি; আত্মীয়া ভিন্ন অপর স্ত্রীলোককে সম্বোধন করবার কোন শিষ্ট প্রথা নেই। কিংবা আগে থাকলেও, এখন লোপ পেয়েছে। অন্যান্য বিষয়ে যেমন, এ সব বিষয়েও তেমনি, আমরা দায়ে পড়ে ইংরাজী সভ্যতার শরণাপন্ন হয়েছি। কিন্তু প্রত্যেক

খুঁটিনাটি বিষয়ে ইংরেজদের নকল করা—বিশেষতঃ সামাজিক ক্ষেত্রে, মোটেই শোভন বা বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য এতদূর এগিয়ে এসে হঠাৎ বেশী পিছিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। আমি একলা ঘরে বসে একটা মন-গড়া নিয়ম মানলেই তা যথেষ্ট হল না। সব সমাজকেই যদি সঙ্গে নিতে চাই তো, সামাজিক অবস্থা বুঝে যা সয় সয় এমন নিয়মই চালাবার চেষ্টা করতে হবে। যা' কালের অতল বিস্মৃতিসাগরে চিরবিলুপ্ত, তীরে বসে বসে তাকে পুনরুদ্ধার করবার বৃথা চেষ্টায় সময় নষ্ট না করে বরং যেটুকু সত্যিকার প্রাণশক্তি আছে, সেটুকু যাতে নবভাবের সঙ্গে জড়িত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত।

আত্মীয়তার বাইরেই ভদ্রতার পূর্ণ প্রকাশ ও প্রয়োজনীয়তা যেমন, তেমনি সেই বাইরের সমাজে, আবার কথোপকথনের ক্ষেত্রেই তার চরম বিকাশ লক্ষিত হয়। কারণ, ক্ষণিক মেলামেশার সঙ্কীর্ণ অবকাশে পরস্পরের জন্য হাতে কলমে 'কাজের কিছু' করবার অবসর কমই পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকদের প্রতি পুরুষসমাজের যে ছোটোখাটো সাহায্যগুলি করা যেতে পারে ও করলে ভাল দেখায়, পুরুষসমাজে পরস্পরের মধ্যে তারও বিশেষ আবশ্যক হয় না,—অবশ্য বয়সের বেশী তফাৎ না থাকলে। কিন্তু সমবয়সী ও সমকক্ষ পুরুষসমাজের কথোপকথন স্থলেও আমাদের কতকগুলি জাতীয় দোষ প্রকাশ পায়, যা সংশোধন করতে পারলেই ভাল। মেয়েরাও সে-দোষবর্জিত নয়। প্রথমতঃ আমরা প্রায় সকলেই বেশী চেঁচিয়ে কথা বলি; দ্বিতীয়তঃ তর্কস্থলে আমরা অধিকাংশ লোকেই চটে গিয়ে কুতর্ক, জিদ বা ব্যক্তিগত খোঁটার আশ্রয় নিই; তৃতীয়তঃ আমরা অন্যের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে অধীরভাবে মাঝে বাধা দিয়ে কথা বলি (হিত অথচ মনোহারী বাক্যের চেয়ে কি মনোযোগী অথচ সমজদার শ্রোতা বেশী দুর্লভ নয়?)। চতুর্থতঃ আমরা নিজের উপস্থিত ইচ্ছামত কথা বলে যাই, শ্রোতা বুঝে কথার বিষয় এবং মাত্রা নির্দ্ধারণ করিনে। আমার শরীরের অসুখ বা আমার মনের ভাবনার বিস্তারিত বিবরণ যে সকলের রুচিকর না বোধ হতে পারে সে কথা ভুলে যাই, এবং অন্যকে কথা বলবার বা মতামত ব্যক্ত করবার অবসর দিইনে।

ফলে দাঁড়ায় এই যে, সকলে একসঙ্গে বলে কিন্তু কেউ শোনে না'—কিংবা ইংরাজিতে যাকে বলে 'oneman show' তাই হয়, অর্থাৎ একজন-মাত্র বক্তা, আর সকলে শ্রোতা। অথচ আসল সর্বাঙ্গীণ আলোচনা বা

সমালোচনাই সামাজিক মেলামেশার প্রধান সুখ ও সার্থকতা। পঞ্চমতঃ আমরা জেনে শুনে এমন প্রসংগ উত্থাপন করি যা উপস্থিত লোকের পক্ষে অপ্রীতিকর। অথবা এমন করে কথা বলি যাতে তাদের কারো মনে লাগতে পারে—ভাষায় যাকে বলে “ঠেস দিয়ে কথা বলা”।—দরকার কি? ভদ্রতা যদি নীতি না হয় ত ভদ্রসমাজও নীতি উপদেশ বা শাসনদণ্ডের স্থান নয়। বেশী শাসন করতে চাও সমাজ থেকে তাড়াও, কিন্তু যে যতক্ষণ সমাজে আছে তার সংগে ভদ্র ব্যবহার কর। অভদ্রতা না করেও বোধ হয় একজনকে বোঝানো যায় যে তাকে আমার বড় পছন্দ নয়, এবং সময়ে সময়ে তা বোঝানো আবশ্যকও হয়ে পড়ে; কিন্তু এগুলি ভদ্রতার ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়ম নয়। আত্মীয়তার স্থলে ভালবাসার অভাব ভদ্রতায় পূর্ণ করা শক্ত বটে, কিন্তু অনাত্মীয়ক্ষেত্রে ভদ্রতা, বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ক্ষণকালের জন্যও ভূষিত হওয়া ত সহজ হলেই বোধ হয়। পর যখন এত অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়, তখন সেটুকু তার জন্য না করাটাই আশ্চর্য্য, করায় কিছু বাহাদুরী নেই। অর্থ বা মানের দম্ভে যাঁরা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন ও মানুষকে মানুষ জ্ঞান করেন না, তাঁরা ভুলে যান যে, মানুষ নইলে মানুষের একদিনও চলে না এবং চিরদিন কারো সমান যায় না।

পরিশেষে আবার বলি যে, ভদ্রতা সর্ব্বরোগের মহৌষধ না হলেও, এবং তার প্রসার বা গভীরতা বেশী না থাকলেও, তা ঘরে বাইরে অতি আবশ্যকীয় উপাদেয় জিনিস, এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য,—শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। এক দিনের জন্যও যদি ভদ্রতা সমাজ থেকে ছুটি নেয়, তাহলে কি ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হয়, তা মনে করতেও কি হৃৎকম্প হয় না? এক হিসেবে ভদ্রসমাজের সকলেই যেন একটি পাৎলা বরফখণ্ডের উপর নৃত্য করে বেড়াচ্ছে,—পায়ের তলায় একটু ভাঙলেই অতল জলে মজ্জমান হবার সম্ভাবনা;—কিন্তু ভাগ্যক্রমে সহজে ভাঙে না। এই ধূলিম্লান পৃথিবীর রুক্ষতাকে মোলায়েম করে এনে দৈনিক জীবনযাত্রায় যাতে একটু শ্রী সম্পাদন করতে পারি, সকলেরই কি সেই চেষ্টা করা উচিত নয়? যদি কেউ এর আনুষ্ঠানিক কর্ত্তব্য থেকে রেহাই পেতে পারে ত সে কেবল সেই সকল অসাধারণ লোক, যাঁরা এমন কোন বৃহৎ কাজ বা মহৎ চিন্তায় লিপ্ত আছেন যাতে সমাজের ছোটোখাটো আদেশ পালন করবার সময় পাওয়া অসম্ভব এবং সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকতে হয়,—যাঁরা সংসারে থেকেও সংসার ও সমাজকে অতিক্রম করেছেন। শুধু ভদ্রতার দ্বারা বড় কাজ কিছু হবে না সত্য, কিন্তু

ছোট নিয়েই ত আমাদের অধিকাংশের অধিকাংশ জীবনের কারবার,—ছোট কাজ ছোট কর্ত্তব্য, ছোট সুখ, ছোট দুঃখ। আমাদের বড় বড় ঋষিরাও ত প্রার্থনা করেছিলেন—"যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।" যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ, তাহাই আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।

—ইন্দিরা দেবী

—

UNIVERSITY
BENGALI SELECTIONS

ABRIDGED EDITION

UNIVERSITY OF CALCUTTA
1972

Rs. 2·50

UNIVERSITY BENGALI SELECTIONS

ABRIDGED EDITION

UNIVERSITY OF CALCUTTA
1972

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.
SCUP—2206 B.T.—20-6-72—J.

ভূমিকা

এই পুস্তকে সংকলিত রচনাগুলি প্রকাশের জন্য যে সকল স্বত্বাধিকারী আমাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সূচী

পদ্যাংশ

UNIVERSITY BENGALI SELECTIONS

পদ্যাংশ

ফুল্লরার বারমাস্যা

ধীরে ধীরে কহে রামা যত দুঃখবাণী।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর, তালপাতার ছাউনি॥
ভেরেণ্ডার থাম ওই আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥
বৈশাখে অনল সম বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পা পোড়ায় খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞ্চার বসন॥
বৈশাখ হৈল বিষ গো, বৈশাখ হৈল বিষ।
মাংস নাহি খায় সর্ব্বলোক নিরামিষ॥

পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন।
রবিকর করে সর্ব্ব শরীর দহন॥
পসরা এড়িয়া জল খাইতে যাইতে নারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে লয় আধা-সারি॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস, পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস।
বঁইচির ফল খেয়ে করি উপবাস॥

আষাঢ়ে পূরিল মহী নব-মেঘে জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল।।
মাংসের পসরা লইয়া ফিরি ঘরে ঘরে।
কিছু খুদ কুঁড়া পাই, উদর না ভরে।।
কি কহিব দুঃখ মোর কহনে না যায়।
কাহারে বলিব বল দোষী বাপ মায়।।

শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবসরজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।।
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী।।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়েতে আইসে বান।।

ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
নদনদী একাকার আট দিকে জল।।
কিরাতনগরে বসি না মিলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি যেবা নহে ভার।।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
বৃষ্টি হইলে কুঁড়্যায় ভাসিয়া যায় বান।।

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে।
ছাগ মেষ মহিষ দিয়া বলিদানে।।
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।।
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ-মাংস সবাকার ঘরে।।

কার্ত্তিক মাসেতে হইল হিমের জনম।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।।
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।।
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।
পিরাণ দোপাটা দিতে করে টানাটানি।।

মাসমধ্যে মার্গশীর্ষ আপনি ভগবান্।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান।।
উদর ভরিয়া ভক্ষ্য দিল বিধি যদি।
যম-সম শীত তাহে নির্মিল বিধি।।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।।

পৌষে প্রবল শীত, সুখী জগজনে।
তৈল তুলা তনুনপাৎ তাম্বুল তপনে।।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।
অভাগী ফুল্লরা-মাত্র শীতের ভাজন।।
হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা।
পরিতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা।।
বৃথা বনিতাজনম, বৃথা বনিতাজনম।
ধূলিভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন।।

মাঘ মাসে অনিবার সদাই কুজ্ঝটী।
আঁধারে লুকায় মৃগ, না পায় আখেটী।।
ফুল্লরার আছে যত কর্ম্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক।।

নিদারুণ মাঘ মাস, নিদারুণ মাঘ মাস।
সর্ব্বজন নিরামিষ কিংবা উপবাস।।

সহজে শীতল ঋতু ফাল্গুন মাসে।
পোড়য়ে যুবতীগণ বসন্ত বাতাসে।।
কত না ভুগিব আমি নিজ কর্ম্মফল।
মাটিয়া পাথর বিনা না আছে সম্বল।।
শুন মোর বাণী রামা, শুন মোর বাণী।
কোন সুখে মোর সনে হইবে ব্যাধিনী।।

মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ।।
অনলসমান পোড়ে চৈত্রের খরা।
চালু সেরে বাঁধা দিনু মাটিয়া পাথরা।।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান।।

ফুল্লরার কথা শুনি কহেন পার্ব্বতী।
আজি হৈতে দূর হৈল সকল দুর্গতি।।
আজি হৈতে মোর ধনে আছে তোর অংশ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গান ভৃগুবংশ।।

—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

বীরবাহুর পতনে

সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি, অমৃতভাষিণি।
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলা-বিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন-কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি।
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক! ঊর তবে ঊর, দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত: ঊরি দাসে দেহ পদচ্ছায়া।

তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ্, নতভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত,
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকসিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা, যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে।
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়, মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা,
হর-কোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধররূপে।
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ-মুরতি,
পাণ্ডব-শিবিরদ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধ বহি,

অনন্ত বসন্ত বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী-লহরী, মরি! মনোহর, যথা
বাঁশরী স্বরলহরী গোকুল বিপিনে!
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা,
স্বহস্তে গড়িলা তুমি, তুষিতে পৌরবে?

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে। ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। করযোড় করি
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্বকলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
একমাত্র বাঁচে বীর; যে কাল-তরঙ্গ,
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।

এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ দুঃখে।
আঁধার জগৎ, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে। কতক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ ;
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা
রে দূত! অমর-বৃন্দ যার ভুজবলে

কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল-কুল মান এ কাল-সমরে!
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলিশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস কুল-রক্ষণ? হায় শূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল-পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে তোর দুঃখে দুঃখী
পাবক শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায়, ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুম-দাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;

তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে কারিতে বাস বাসনা আঁধারে?"

এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ; হায় রে, মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয় পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।

তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে;—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে।
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"

উত্তর করিলা তবে লঙ্কা অধিপতি;—
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ! জানি হে আমি, এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল বিকল-হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,

যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"
এতেক কহিয়া রাজা দূত পানে চাহি,
আদেশিলা,—"কহ দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?"

প্রণমি রাজেন্দ্র-পদে করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত,—"হায়, লঙ্কাপতি!
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল-মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে।
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে,
সিংহনাদে, জলধির কল্লোলে, দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে, কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড টঙ্কারে!
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর।
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহুসহ
রণে, যূথনাথসহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে; বিদ্যুৎঝলসম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে
শনশনে! ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি কে পারে গণিতে?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কতক্ষণ পরে

প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব;
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,—" এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্ব্বদুঃখ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরী-মনোহর ;—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ ?"

"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত ;—"কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি!
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীমদন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে, চৌদিকে এবে সমরতরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ুসহ
নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশিরবে!—
আর কি কহিব, দেব? পূর্ব্বজন্ম দোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি। হায়, রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈম লঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহুসহ
রণভূমে, কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে, পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"

এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা;—"সাবাসি দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল-ফণী
কভু কি অলসভাবে নিবসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা বীরপুত্রধাত্রী! চল, সবে,
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্‌জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীরচূড়ামণি
বীরবাহু,. চল দেখি জুড়াই নয়নে।"

—মধুসূদন দত্ত

ঐকতান

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্ত্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক
রয়ে গেছে ফাঁক।
কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা-একতান
কত না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।
দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়,
আমার অন্তরে বারবার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।
দক্ষিণ মেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহাজনশূন্যতায় রাত্রি তার করিতেছে সারা,
সে আমার অর্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা ক'রেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে।
সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর
মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্বর।
প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানাদিক্ হ'তে—
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ;
গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ—
নিখিলের সংগীতের স্বাদ।।

সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,

বাধা হ'য়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রায়।
চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল ;—
বহুদূর-প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্ম্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হ'লে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্ব্বত্রগামী।।

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্ম্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জ্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি' কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারিনি দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।।
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজদুরি।
এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্ব্বাক মনের
মর্ম্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।

প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনার
তাই তুমি দাওতো উদ্ধার।

সাহিত্যের ঐকতান-সংগীত-সভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি ;—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বারাণসী

যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল—'দেখা যায় বারাণসী!'
চমকি চাহিনু, স্বর্গ-সুষমা মর্ত্যে পড়েছে খসি'।
এ পারে সবুজ বজরার ক্ষেত, ও পারে পুণ্য-পুরী,
দেবের চৌপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ-ঝুরি;
শারদ দিনের কনক আলোকে কিবা ছবি ঝলমল,—
অমৃত যুগের পূজো-উপচার,—হেম চম্পকদল!

আধ-চাঁদখানি রচনা করিয়া গঙ্গা রয়েছে মাঝে,
স্নেহ-সুশীতল হাওয়াটি লাগায় তপ্ত-দিনের কাজে।
জয়! জয়! বারাণসী!
হিন্দুর হৃদি-গগনের তুমি চির-উজ্জ্বল শশী।

অগ্নিহোত্রী মিলেছে হেথায় ব্রহ্মবিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে।
এই সেই কাশী ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিল এইখানে,
খ্যাত যাঁর নাম শাক্যমুনির জাতকে, গাথায়, গানে ;—
যাঁর রাজত্ব-সময়ে বুদ্ধ জন্মিলা বার বার ;
ন্যায়-ধর্ম্মের মর্য্যাদা প্রেমে করিতে সমুদ্ধার।
এই সেই কাশী—ভারতবাসীর হৃদয়ের রাজধানী,
এই বারাণসী জাগ্রত চোখে স্বপন মিলায় আনি'।

এই পথ দিয়া ভীষ্ম গেছেন ভারত-ধুরন্ধর—
কাশী-নরেশের কন্যারা যবে হইল স্বয়ংবর।
সত্য পালিতে হরিশ্চন্দ্র এই কাশীধামে, হায়,
পুত্র-জায়ায় বিক্রয় করি' বিকাইলা আপনায়।
তেজের মূর্ত্তি বিশ্বামিত্র সাধনায় করি' জয়
হেথা লভিলেন তিনটি বিদ্যা—সৃষ্টি, পালন, লয়,
বিদ্যায় যিনি জ্যোতির পুঞ্জ করিলেন সমাহার—
নূতন স্বর্গ করিলেন যিনি আপনি আবিষ্কার।

শুদ্ধোদনের স্নেহের দুলাল ত্যজিয়া সিংহাসন
করুণা-ধর্ম্ম হেথায় প্রথম করিলা প্রবর্ত্তন।
এই বারাণসী কোশল-দেবীর বিবাহের যৌতুক,—
দেখিতেছি যেন বিম্বিসারের বিস্মিত স্মিত-মুখ।

নৃপতি অশোকে দেখিতেছি চোখে বিহারের পৈঠায়,
শ্রমণগণের আশীর্ব্বচনে প্রাণ মন উথলায়।
সম্মুখে হাজার স্থপতি মিলিয়া গাড়িছে বিরাট স্তূপ,
শত ভাস্কর রচে বুদ্ধের শত জনমের রূপ।
চিক্কণ চারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী
ধর্ম্মাশোকের মৈত্রী-করুণ অনুশাসনের লিপি।
মহাচীন হ'তে ভক্ত এসেছে মৃগদাব-সারনাথে,
স্তূপের গায় চিত্র করিছে সূক্ষ্ম সোণার পাতে।
জয়! জয়! জয় কাশী!
তুমি এসিয়ার হৃদয়-কেন্দ্র,—মূর্ত্ত ভকতিরাশি!

এই কাশীধামে ভক্ত তুলসী লিখেছেন রামকথা,
ভকতি যাঁহার অপ্রমত্ত প্রভুপদে সংযতা।
এই কাশীধামে জোলাদের ছেলে কবীর রচিল গান,
যাহার দোঁহায় মিলেছিল দুহু হিন্দু মুসলমান।
এই কাশীধামে বাঙ্গালীর রাজা মরেছে প্রতাপ রায়,
যাঁর সাধনায় নবীন জীবন জেগেছিল বাংলায়।
মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই—শুধু শিব!
মনে লয় মোর হেথা একদিন মিলিবে নিখিল জীব,
আত্মার সাথে হবে আত্মার নবীন আত্মীয়তা,
মিলনধর্ম্মী মানুষ মিলিবে; নহে এ স্বপ্নকথা।
জয় কাশী! জয়! জয়!
সারা জগতের ভকতি-কেন্দ্র হবে তুমি নিশ্চয়!

স্ফটিক-শিলার বিপুল-বিলাস-মাত্র নহ তো তুমি,
আমি জানি তুমি আনন্দধাম হয়ে আছ মরুভূমি,
আমি জানি তুমি ঢাকিয়াছ হাসি ভ্রূকুটির মসীলেপে,
অমৃত-পাত্র লুকায়ে রেখেছ সময় হয়নি ভেবে;
তৃষিত জগৎ খুঁজিতেছে পথ, ডেকে লও, বারাণসি!
পথিকের প্রীতে প্রদীপ জ্বালিয়া কেন আছ দূরে বসি?

মধু-বিদ্যায় বিশ্ব-মানব দীক্ষিত কর আজ,
ঘুচাও বিরোধ, দম্ভ ও ক্রোধ, ক্ষাত, ক্ষোভ, ভয়, লাজ।
সার্থক হ'ক সকল মানব, জয়ী হ'ক ভালবাসা,
সংস্কারের পাষাণ-গুহায় পড়ুক কর্মনাশা।

ব্যাসের প্রয়াস ব্যর্থ সে কভু হবে নাকো একেবারে,
সবারেই দিতে হবে গো মুকতি এ বিপুল সংসারে।
তুমি কি কখনো করিতে পার গো শুচি অশুচির ভেদ?
তুমি যে জেনেছ চরাচর ব্যাপী চিদানন্দের বেদ।
স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম অবধি অভেদ বলেছ তুমি,
ভেদের গণ্ডী তুমি রাখিয়ো না, অয়ি বারাণসী-ভূমি।
ঘোষণা করেছ আশ্রমে তব ক্ষুধিত রবে না কেহ ;—
প্রাণের অন্ন দিবে না কি হায়? কেবলি পুষিবে দেহ?

দাও সুধা দাও, পরাণের ক্ষুধা চিরনিবৃত্ত হোক,
বিশ্বনাথের আকাশের তলে মিলুক সকল লোক।
অখিল জনের হৃদয়ে রাজ্য কর তুমি বিস্তার,
সকল নদীর সকল হৃদির হও তুমি পারাবার।
পর যে মন্ত্রে আপনার হয় সে মন্ত্র তুমি জানো,
বিমুখ বিরূপ জগত-জনেরে মুগ্ধ করিয়া আনো।
বিচিত্র মালা কর বিরচন নানা বরণের ফুলে,
অবিরোধে লোক সার্থক হোক্ পাশাপাশি মিলেজুলে
দূর ভাবিয়া নিখিল বিশ্ব যে ধনের আশা করে—
তুমি বিতরিয়া দাও সে অমৃত জগত-জনের করে।
জয়! বারাণসী জয়!
অভেদ-মন্ত্রে জয় কর তুমি জগতের সংশয়।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ইন্দ্রপতন

তখনো অস্ত যায়নি সূর্য্য, সহসা হইল সুরু
অম্বরে ঘন ডম্বরু-ধ্বনি গুরু গুরু গুরু গুরু!
আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন্ ইন্দ্রের আগমনী?
শুনি, অম্বুদ-কম্বু-নিনাদে ঘন বৃংহিত ধ্বনি।
বাজে চিক্কুর-হ্রেষা-হর্ষণ মেঘ-মন্দুরা-মাঝে,
সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলয়ঙ্কর সাজে!

ঘনায় অশ্রু-বাষ্প-কুহেলি ঈশান-দিগঙ্গনে
স্তব্ধ বেদনা দিগ্-বালিকারা কি যেন কাঁদনি শোনে।
কাঁদিছে ধরার তরু, লতা, পাতা, কাঁদিতেছে পশুপাখী,
ধরার ইন্দ্র স্বর্গে চলেছে ধূলির মহিমা মাখি।

বাজে আনন্দ-মৃদং গগনে, তড়িৎ-কুমারী নাচে,
মর্ত্ত্য-ইন্দ্র বসিবে গো আজ স্বর্গ-ইন্দ্র-কাছে।
সপ্ত-আকাশ সপ্তস্বরা হানে ঘন করতালি,
কাঁদিছে ধরায় তাহারি প্রতিধ্বনি—খালি, সব খালি।

হায় অসহায় সর্ব্বংসহা মৌনা ধরণী মাতা,
শুধু দেব-পূজা তরে কি মা তোর পুষ্প, হরিৎ-পাতা?
তোর বুকে কি মা চির-অতৃপ্ত রবে সন্তান-ক্ষুধা?
তোমার মাটির পাত্রে কি গো মা ধরে না অমৃত-সুধা?

জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে-কেহ আনিবে অমৃত-বারি
অমৃত-অধিপ দেবতার রোষ পড়িবে কি শিরে তারি?
হয়ত তাহাই, হয়ত নহে ত—এটুকু জেনেছি খাঁটি,
তারে স্বর্গের আছে প্রয়োজন যারে ভালোবাসে মাটি।

কাঁটার মৃণালে উঠেছিল ফুটে যে চিত্ত-শতদল,
শোভেছিল যাহে বাণী-কমলার রক্ত-চরণ-তল,
সম্ভ্রমে নত পূজারী মৃত্যু ছিঁড়িল সে শতদলে—
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অর্পিবে বলি' নারায়ণ-পদতলে!

জানি জানি মোরা, শঙ্খ-চক্র-গদা যার হাতে শোভে—
পায়ের পদ্ম হাতে উঠে তাঁর অমর হইয়া রবে।
কত সান্ত্বনা আশা-মরীচিকা কত বিশ্বাস-দিশা
শোক-সাহারায় দেখা দেয় আসি', মেটে না প্রাণের তৃষা!

আজ শুধু জাগে তব অপরূপ সৃষ্টি-কাহিনী মনে,
তুমি দেখা দিলে অমিয়-কণ্ঠ বাণীর কমল-বনে!
কখন্ তোমার বীণা ছেয়ে গেল সোনার পদ্ম-দলে,
হেরিনু সহসা ত্যাগের তপন তোমার ললাট-তলে!

লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বাণী,
শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি কণ্ঠে গরল দানি',
বিষ্ণু দিলেন ভাঙনের গদা, যশোদা-দুলাল বাঁশী,
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর, মৃগাঙ্ক দিল হাসি।

চীর গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারত-জননী কাঁদি'
প্রতাপ শিবাজী দানিল মন্ত্র দিল উষ্ণীষ বাঁধি'!
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারা দিল মন্দার-মালা, মানব মাখালো ধূলি।

নিখিল-চিত্তরঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি'—
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্ম্মী, জ্ঞানী!
হিমালয় হ'তে বিপুল বিরাট, উদার আকাশ হ'তে,
বাধা-কুঞ্জর তৃণসম ভেসে গেল তব প্রাণস্রোতে!

ছন্দোগানের অতীত হে ঋষি, জীবনে পারিনি তাই
বন্দিতে তোমা', আজ আনিয়াছি চিত্ত-চিতার ছাই—
বিভূতিতিলক! কৈলাস হ'তে ফিরেছ গরল পিয়া,
এনেছি অর্ঘ্য শ্মশানের কবি ভস্মবিভূতি নিয়া।

নাও অঞ্জলি, অঞ্জলি নাও, আজ আনিয়াছি গীতি
সারা জীবনের না-কওয়া-কথার ক্রন্দন-নীরে তিতি'।
এত ভালো মোরে বেসেছিলে তুমি, দাওনিক অবসর
তোমারেও ভালোবাসিবারে, আজ তাই কাঁদে অন্তর।

তোমারে দেখিয়া কাহারও হৃদয়ে জাগেনিক সন্দেহ—
হিন্দু কিংবা মুসলিম তুমি অথবা অন্য কেহ।
তুমি আর্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি,
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি!

হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজিব,
যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শিব।
নিন্দা গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া, পাগল, মিলন-হেতু
হিন্দু-মুসলমানের পরাণে তুমিই বাঁধিলে সেতু!

জানি না আজিকে কি অর্ঘ্য দেবে হিন্দু মুসলমান,
ঈর্ষা-পঙ্কে পঙ্কজ হ'য়ে ফুটুক এদের প্রাণ।
হে অরিন্দম, মৃত্যুর তীরে ক'রেছ শত্রু জয়,
প্রেমিক! তোমার মৃত্যুশ্মশান আজিকে মিত্রময়!

তাই দেখি, যারা জীবনে তোমায় দিল কণ্টক-হুল,
আজ তাহারাই এনেছে অর্ঘ্য নয়ন-পাতার ফুল!
কে যে ছিলে তুমি জানিনাক কেহ দেবতা কি আউলিয়া,
শুধু এই জানি, হেরে আর কারে ভরেনি এমন হিয়া।

* * *

অসুর নাশিনী জগন্মাতার অকাল উদ্বোধনে
আঁখি উপাড়িতে গেছিলেন রাম, আজিকে পড়িছে মনে,
রাজর্ষি! আজি জীবন উপাড়ি দিলে অঞ্জলি তুমি,
দনুজ দলনী জাগে কিনা —আছে চাহিয়া ভারতভূমি।

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

গৌরচন্দ্রিকা

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব।।
কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম- কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর।।
চঞ্চল চরণ- কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত অগোর।।
অবিরত প্রেম- রতন-ফল বিতরণে
অখিল-মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর।।

—গোবিন্দদাস

দীপ-শিখা

তপন যখন অস্ত মগন ভুবন ভ্রমণ-শেষে,
আমি তপনের স্বপন দেখি গো, পথিক বধূর বেশে।
সারা দেহে মোর জ্বালিয়া অনল,
এলাইয়া দিই ধূম-কুন্তল,
কালো অঞ্চল ছায়া হ'য়ে লোটে চরণের তলদেশে,
মোর দেহময় দাহনের জয় তপনের উদ্দেশে।

মাটির বাটিতে স্নেহরস শুষি', বৃন্ত সে বর্ত্তিকা
ফুটায় হরষে তিমির-তোষিণী চম্পা-রূপিণী শিখা ;
বৃন্ত বাহিয়া যত স্নেহরস
যোগায় আমারে জ্বালার হরষ—
আমি তৃষিতের প্রাণের নিশীথে বাসনা-বাসন্তিকা।
ধূম নয়, সে যে অলি-লাঞ্ছন কাঞ্চন-মল্লিকা।

আলোকের লাগি' আঁধার-প্রাচীরে নিশা মরে মাথা কুটে
আমি সে ললাটে রক্তের ফোঁটা দিকে দিকে উঠি ফুটে!
কালোর অঙ্গে আলোকের ক্ষত—
সারারাত জাগি নিমেষ-নিহত,
জাগর-বন্ধু আঁখির কাজল অশ্রুতে নাহি টুটে,
যত সে জ্বলুক, কালিটুকু থাকে লাগিয়া অক্ষিপুটে।

* * *

দিক্-অঙ্গনা গগনাঙ্গনে ফুল্কির ফুল গাঁথে—
অবোধ বনানী তাই হেরি' পরে জোনাকির হার মাথে!
মিছা মায়া সেই আলোর কণিকা,
মিছা হাসি হাসে আঁধার-গণিকা—
রক্ত-বিহীন পাণ্ডুর ভাতি, তাপ নাই তার সাথে,
বিদ্রূপ করে সখের দীপালি সুস্থ দিবস-মাথে!

আমি যামিনীর নীল অঞ্চলে আগুনের ফুল বুনি,
আমি আঁধারের বুকের বাঁ-ধারে হৃৎস্পন্দন শুনি!
দিবা পুড়ে' মরে স্বামীর চিতায়—
আমি ছিনু তার সিঁদুর সিঁথায়,
জ্বলে' উঠে শুনি ভর-সন্ধ্যায় ঝিল্লির ঝুনঝুনি,
আমি সারারাত কাল-রাত্রির আয়ুর প্রহর গুণি!

আমি দীপ-শিখা—আলোক-বালিকা—বসি যবে বাতায়নে,
দূর প্রান্তরে আলেয়া-ডাকিনী মিলায় আঁধার সনে;
নিশার দুলাল প্রেত-কবন্ধ
নৃত্য অমনি করে যে বন্ধ!
উন্মত্ত-পাখা পিপীলিকা মরে রূপশিখা চুম্বনে!
আমি বহ্নির তম্বী কুমারী তপনেরে জপি মনে!

আমি নিয়ে যাই অধীরা বধূরে অচেনার অভিসারে,
দেব-আয়তনে আরতি করি গো প্রেমহীন দেবতারে।
আমি কালো-চোখে পরাই কাজল,
বাসর নিশিটি করি যে উজল,
আমি চেয়ে থাকি অনিমিখ-আঁখি মরণ শয়নাগারে;
প্রলয় ঘটাই, তবু নিবে যাই মলয়ের ফুৎকারে!

—মোহিতলাল মজুমদার

নব নিদাঘ

অঙ্গে আমার লেগেছে রে আজ নব নিদাঘের ঘোর।
ওরে মন, আয় সাঙ্গ করিয়া সকল কর্ম্ম তোর!
বিছায়ে নে মোর শিথিল শরীর শুভ্র আঁচলের প্রায়:
চেয়ে থাক্ দূরে, অর্দ্ধ শয়নে আধখোলা জানলায়।

দুপুর বেলায় রূপালি রৌদ্রে ফুলদল পড়ে নুয়ে,
মৌমাছিগুলি গুঞ্জন তুলি' উড়ে যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে:
ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘেরিয়া গুমট করিয়া আছে,
অমনি গান কি গন্ধের মতো ঘুরে বেড়া মোর কাছে!

দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র ঝিঁঝির পাখার মত,
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি' কে হাপরে ফুঁ দিতেছে অবিরত?
দিকে দিকে দিকে, জানি না কি পাখী হাতুড়ি ঠুকিছে ডালে.
কোন্ রূপসীর স্বপ্ন-মেখলা গাড়িছে বিশ্বশালে?

কালো দীঘিজলে গাহন করিতে নেমেছে গাছের ছায়া,
নিদ্রিত মাঠে নির্জ্জন ঘাটে জাগিছে এ কার মায়া?
মরীচিকা চাহি' শ্রান্ত পথিক ফুকারে ফটিক জল,
অঙ্গে আলস আসে জড়াইয়া ছাড়ে না অশথতল।

আজিকে বিশ্ব কি মধুমধুর মদির নেশায় ভোর!
মাথায় তাহার ঘুরিছে হাজার ঘূর্ণি হাওয়ার ঘোর।
বাসনা তাহার মরীচিকা হ'য়ে আঁকা পড়ে দূরে পটে:
কল্পনা তার গুন গুন ক'রে অলিগুঞ্জনে রটে।

শীতল শিলায় শ্রান্তি বিছায়ে শিথিল অঙ্গ রেখে,
নিমীল নয়নে মলিন বিরহ মিলনস্বপন দেখে।
সুদূর অতীত কাছে আসে আজ গোপন সেতু বাহি'।
অদেখা অগম দাঁড়ায়েছে যেন মোর মুখপানে চাহি'!

এসেছে তাহারা দিগন্ত-হারা সাহারা-প্রান্ত হ'তে,
এসেছে রে কারা কোন্ বসোরায় খর্জ্জুরবীথিপথে,
কত বেদুয়ীন্ পার ক'রে মরু দীপ্ত অগ্নিঢালা,
নামায় আমার হৃদয়ের হাটে তরুণী ইরাণী বালা!

মর্ম্মরে গাঁথা মর্ম্মবেদীতে, কে পাতি' পদ্মপাতা,
পত্রলেখায় লিখিতে অঙ্গ ঘুমে ঢুলে' পড়ে মাথা!
আঁখি মুদে একা প'ড়ে আছি এই সুখস্মৃতিঘেরা নীড়ে,
প্রাণ ভ'রে যায় চেনা অচেনার মিলনমধুর ভিড়ে।

বেলা প'ড়ে আসে, বধূ চলে ঘাটে ভরিতে সাঁঝের জল,
পথপাশে তরু গায়ে তুলে নিল ছ্যুত ছায়া-অঞ্চল।
স্বপ্নান্তরে নিয়ে চলে মোরে নিদাঘনিশীথ ঘোর
ওরে মন আয়, ছিঁড়ে ফেলে আয় সকল কর্ম্ম-ডোর।

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বিড়াল

(শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তীর উক্তি)

আমি শয়ন-গৃহে চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা-হাতে ঝিমাইতে ছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেওয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এ জন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না? এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল 'মেও'।

চাহিয়া দেখিলাম হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট আফিঙ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে পাষাণবৎ কঠিন হইয়া বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, 'মেও'।

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে, একটি ক্ষুদ্র মার্জার। প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই; এক্ষণে মার্জার-সুন্দরী নির্জ্জল দুগ্ধ-পানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, 'মেও'। বলিতে পারি না, বুঝি তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল সেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে 'মেও' শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায়

করিয়াছিল! বুঝি বিড়ালের মনের ভাব—'তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি, এখন বল কি?' বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না, দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়াল দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গারস্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জ্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতর চিত্তে হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জ্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না, কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া একটু সরিয়া বসিল। বলিল, 'মেও!' প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া মার্জ্জারের বক্তব্য সকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি মৎস্য মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে, আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেংগা লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটা বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহৃত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভাগী—আমি চুরিই করি আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্ম সঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ।

অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহেন না ইহাতেই চোরে চুরি করে। চোর দোষী বটে কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী।

"দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা পাতের ভাত নর্দ্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে? হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখনও অন্ধকে মুষ্টিভিক্ষা দেয় না সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোট-লোকের দুঃখে কাতর? ছি! কে হইবে?

"দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড় হাত করিয়া বলিতে, 'আর একটু কি আনিয়া দিব?' তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি বড় পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তাহাতো নয়, তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!

"দেখ, আমাদের দশা দেখ। দেখ, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদের মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের

সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহ-মার্জ্জার হইয়া মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি।

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, মেও! মেও! খাইতে পাই না। আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস্য-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার-সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাওয়ার পর যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে, কেন-না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম! মার্জ্জার-পণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক, সমাজ-বিশৃঙ্খলার মূল। যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধন সঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধন-সঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজে ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জ্জারী বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের ক্ষতি কি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।

বিড়াল রাগ করিয়া বলিল, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বিড়ালকে বুঝানো দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্‌কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জ্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব

ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন; অতএব চোরের দণ্ড-বিধান কর্তব্য।"

মার্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে কাহারও ভাণ্ডার-ঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জারীকে বলিলাম, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। মন হইতে এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর। প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে। জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না, বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব।"

মার্জার বলিল, "আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জার বিদায় হইল।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র

যেকালে বঙ্কিমের নবীন প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলাদেশের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।

সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল। এবং ক্ষুদ্র যে-লেখক-সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত, তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

আবার এখনকার যে নূতন পাঠক- ও লেখক-সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্যভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু বর্তমান লেখকের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় তখন সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোরূপ পূর্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই এবং বর্তমান কালের নূতন ভাবপ্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত ও অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গসাহিত্যেরও যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।

পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা একমুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম

বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।' এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাতকলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম, সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিয়াছিলাম সেই জন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। মনে হয় সেদিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল তদনুরূপ ফললাভ করিতে পারি নাই। সে জীবনের বেগ আর নাই। কিন্তু এ নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম-সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কখনো স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব আনন্দ নবীন আশার স্মৃতির সহিত বর্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে-রাগিণীতে বংশীধ্বনি হয় সে-রাগিণী চিরদিনের নহে। সেদিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্তব্য, মিশ্রিত দুঃখসুখ ক্ষুদ্র বাধাবিঘ্ন, আবর্তিত বিরহমিলন· তাহার পর হইতে গভীর গম্ভীরভাবে নানাপথ বাহিয়া নানা শোকতাপ অতিক্রম করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিদিন আর সে নহবত বাজিবে না। তথাপি সেই একদিনের উৎসবের স্মৃতি কঠোর কর্তব্যপথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যেদিন নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন সেইদিনের সর্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ উৎসব আমাদের মনে আছে। সেদিন আর নাই। আজ নানা লেখা নানা মত নানা আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ কোনোদিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে কোনোদিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এইরূপই হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল সে-কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণকর্তা বলিয়া আমরা জানি না। কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা,

কী সমাজ, কী ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক। যখন নব্যশিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃতপ্রায় বেদপুরাণতন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ অদ্য এই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না।

রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।

মাতৃভাষার বন্ধ্যদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙালীর যে কী মহৎ কী চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে-কথা যদি কাহাকেও বুঝাইতে আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা আর দুর্ভাগ্য কিছুই নাই। তৎপূর্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা বর্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলাভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা যাইতে পারে সে-কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এইজন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্য অনুগ্রহপূর্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠ্যযোগ্যতা সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত এন্ট্রেন্স-পাঠ্য বাংলাগ্রন্থ দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সংকুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন, তখনকার কালে কী যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরেজিতে দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরেজি সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালির মতো বালির বাঁধ নির্মাণ করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কী হইতে পারে? সম্পূর্ণ ক্ষমতা সত্ত্বেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাঁহাদের নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া একটি অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা উদ্যম ক্ষমতাকে প্রেরণ করা কত বিশ্বাস এবং কত সাহসের বলে হয় তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির সব কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্বে সেই অনাদরমলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

তখন, পূর্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন তাঁহারা বঙ্গভাষার যৌবনসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমতঃ, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোন আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প

ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্বদা সম্মুখে বর্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতি-লাভের প্রলোভন সংবরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম। চতুর্দিকব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মতো এমন গুরুভার আর কিছু নাই, তাহার নিয়তপ্রবল ভারাকর্ষণশক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম তাহা এখনকার সাহিত্যব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন। তখন যে আরো কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভাবলে যে কার্য করিয়াছেন তাহা অসামান্য। বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদবর্গের কত ঊর্ধ্বে সমুত্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে। একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব অভ্যাসবশতঃ সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরো কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোকে যে একলম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখনো দাঁড়াইয়া

যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর-একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিমচন্দ্র একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানের যে ফল তাহাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচকপদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। এবং কল্পনাপ্রবণ লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোটো ছোটো দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন বর্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এইজন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোনোদিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব করিতে হয় নাই।

নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া গ্রাম্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভ্যজনের মনোরঞ্জন করিত। এই প্রগল্‌ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক্‌ কখনো সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীর ভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত

বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে, উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য

এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল সুসংগতি নহে, সুরুচি এবং শিষ্টতার সীমা নির্ণয় করিতেও একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তির আবশ্যক। মাঝে মাঝে অনেক বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে সেই বোধশক্তির অভাব দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভায় বল এবং সৌকুমার্যের একটি সুন্দর সংমিশ্রণ ছিল। নারীজাতির প্রতি যথার্থ বীর-পুরুষের মনে যেরূপ একটি সসম্ভ্রম সম্মানের ভাব থাকে তেমনই সুরুচি এবং শীলতার প্রতি বঙ্কিমের বলিষ্ঠ বুদ্ধির একটি ভদ্রোচিত বীরোচিত প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্কিমের রচনা তাহার সাক্ষ্য। বর্তমান লেখক যেদিন প্রথম বঙ্কিমকে দেখিয়াছিল, সেদিন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচিপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ রিয়ুনিয়ন নামক মিলনসভা বসিয়াছিল। ঠিক কতদিনের কথা ভালো স্মরণ নাই কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারও পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনোরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেকবার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমলহাস্যে

অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম দর্শনে সেই যে তাঁহার মুখে উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগমূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সংকুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন।

বঙ্কিমের সেই সসংকোচ পলায়নদৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে-সময়কার সাহিত্য অন্য যে-কোনোপ্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক, ঠিক সুরুচিশিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে-সময়কার অসংযত বাক্‌-যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা যে কী আশ্চর্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতার প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোনোকালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম-সংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়সঙ্গিনী

বঙ্গভাষা আজ বঙ্কিমের জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এই শোকোচ্ছ্বাসের অতীত শান্তিধামে দুষ্কর জীবনযজ্ঞের অবসানে নির্বিকার নিরাময় বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে একটি কোমল প্রসন্নতা, একটি সর্বদুঃখতাপহীন গভীর প্রশান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—যেন জীবনের মধ্যাহ্নরৌদ্রদগ্ধ কঠিন সংসারতল হইতে মৃত্যু তাঁহাকে স্নেহসুশীতল জননীক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছে। আজ আমাদের বিলাপ পরিতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমাদের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিবার জন্য সেই প্রতিভাজ্যোতির্ময় সৌম্য প্রসন্নমূর্তি এখানে উপস্থিত নাই। আমাদের এই শোক এই ভক্তি কেবল আমাদেরই কল্যাণের জন্য। বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে যে-আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এই শোকে এই ভক্তিতে সেই আদর্শ প্রতিমা আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল এবং স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রস্তরের মূর্তিস্থাপনের অর্থ এবং সামর্থ্য আমাদের যদি না থাকে, তবে একবার তাঁহার মহত্ত্ব সর্বতোভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমাদের বঙ্গহৃদয়ের স্মরণস্তম্ভে স্থাপিত করিয়া রাখি। রাজনৈতিক সমাজনৈতিক মতামত সম্বন্ধের পরিবর্তিত হইতে পারে, যে সকল ঘটনা যে সকল অনুষ্ঠান আজ সর্বপ্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার উন্মাদনার কোলাহলে সমাজের শান্তিহীন শব্দহীন কর্তব্যগুলিকে নগণ্য বলিয়া ধারণা হইতেছে কাল তাহার স্মৃতিমাত্র চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে না পারে কিন্তু যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ্ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদিগের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের মধ্যে চিরসৌন্দর্যের অক্ষয় আকর উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যাহা কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা-কিছু অমর করিবে সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার পোষণ করিবার প্রকাশ করিবার এবং সর্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।

রচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে—আজ আমাদিগের নিকট যাহা প্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা রুচি এবং অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের উত্তর-পুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম

বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতঃস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ-কথা কোনো বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাংলা লেখকদিগের গুরু, বাংলা পাঠকদিগের সুহৃদ্‌, এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিমদিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

— —

অভাগীর স্বর্গ

•

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলে মেয়েদের ছেলে-পুলে হইয়াছে, জামাইরা, প্রতিবেশীর দল, চাকর-বাকর—সে যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধুমধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দুর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার—এ যেন বড় বাড়ীর গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামিগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া অলক্ষ্যে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল, সে কাঙালীর মা। সে তাহার কুটীর-প্রাঙ্গণের গোটা কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার আঁচলে বেগুন বাঁধা—সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্রামের একান্তে গরুড় নদীর তীরে শ্মশান। সেখানে পূর্বাহ্নেই কাঠের ভার, চন্দনের টুকরা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল। কাঙালীর মা ছোটজাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না,

তফাতে একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্য্যাপ্ত চিতার 'পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাঁহার রাঙা পা দুখানি দেখিয়া তাহার দুচক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আল্‌তা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহু কণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্ছো—আমাকেও আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও আমিও যেন এমনি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন! সে ত সোজা কথা নয়! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতিনী, দাস, দাসী, পরিজন—সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ—দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্যঃপ্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতা-পাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছেন, মুখ তাঁহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিঁদুরের রেখা, পদতল দুটি আল্‌তায় রাঙানো। ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চোদ্দ-পনেরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস্ মা, ভাত রাঁধবি নে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধবো'খন রে! হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, দ্যাখ্ দ্যাখ্ বাবা—বামুনমা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্ছে!

ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, কই? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই ক্ষেপেছিস্! ও ত ধুঁয়া! রাগ করিয়া কহিল, বেলা দুপুর বাজে, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি? এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল লক্ষ্য করিয়া বলিল, বামুনদের গিন্নী মরেছে তুই কেন কেঁদে মরিস্ মা?

কাঙালীর মার এতক্ষণে হুঁস হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এই ভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমন কি, ছেলের অকল্যাণের

আশঙ্কায় মুহূর্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাঁদব কিসের জন্যে রে—চোখে ধোঁ লেগেছে বই ত নয়!

হাঁ, ধোঁ লেগেছে বই ত না! তুই কাঁদ্‌ছিলি!

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালীকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল—শ্মশান-সৎকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।

২

সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলোকেই যেন আমরণ ভ্যাঙ্‌চাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট, কিন্তু সেই ছোট্ট কাঙালীজীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর মা হইতে বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ও শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

তাহার সেই কাঙালী বড় হইয়া আজ পনরয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলি নে মা?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল, না, ক্ষিদে নেই বই কি! কই দেখি তোর হাঁড়ি?

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর একজনের মত ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্নমুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়সের ছেলে সচরাচর এরূপ করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্ন ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গী সাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলা ধূলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে। এক হাতে গলা জড়াইয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া পোড়ানো কি তুই

মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, ছি বাবা, মড়া পোড়ানো বলতে নেই, পাপ হয়। সতীলক্ষ্মী মাঠাকরুণ রথ করে সগ্যে গেলেন।

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা। রথে চড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যে যায়?

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখনু কাঙালী, বামুনমা রথের ওপরে ব'সে। তেনার রাঙা পা দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখলে রে!

সবাই দেখলে?

সব্বাই দেখলে!

কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই সে শিশুকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই মা যখন বলিতেছে সবাই চোখ মেলিয়া এতবড় ব্যাপার দেখিয়াছে, তখন অবিশ্বাস করিবার আর কিছু নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তা হ'লে তুইও ত মা সগ্যে যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসিকে বলতেছিল কাঙ্লার মা'র মত সতীলক্ষ্মী আর দুলেপাড়ায় কেউ নেই।

কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, কাঁতাটা পেতে দেব মা, শুবি?

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে বালিশটী পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, কাঙালী, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভাল লাগিল, কিন্তু কহিল, জলপানির পয়সা দুটো ত তা হলে দেবে না মা।

না দিক্ গে—আয় তোকে রূপকথা বলি।

আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না, কাঙালী তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল্ তা হলে। রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুর আর সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া—

অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ সকল তাহার পরের কাছে কত দিনের শোনা এবং কত দিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত্ত-কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র—সে এমন উপকথা সুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়—নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—কাঙালীর স্বল্প দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকারে কেবল রুগ্ন মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশানযাত্রার কাহিনী। সেই রথ, সেই রাঙা পা দুটি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া। কেমন করিয়া শোকার্ত্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তারপরে সন্তানের হাতের আগুন! সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালী, সেই ত হরি! তার আকাশজোড়া ধুঁয়ো ত ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই ত সগ্যের রথ! কাঙালীচরণ, বাবা আমার!

কেন মা?

তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুনমার মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো।

কাঙালী অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ—বল্‌তে নেই।

মা সে কথা বোধ করি শুনিতেও পাইল না, তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোটজাত বলে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না ক'রতে পারবে না—দুঃখী বলে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস্! ছেলের হাতের আগুন—রথকে যে আসতেই হবে।

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস্ নে মা, বলিস্ নে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ্ কাঙালী, তোর বাবাকে একবার ধ'রে আন্‌বি, অম্‌নি যেন পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে আমাকে বিদায় দেন। অম্‌নি পায়ে আল্‌তা, মাথায় সিঁদুর দিয়ে—কিন্তু কে বা দেবে? তুই দিবি, না রে কাঙালী? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব! বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

৩

অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্তৃতি বেশি নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেম্‌নি সামান্যভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালী গিয়া কাঁদাকাটি করিল, হাতে পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে এক টাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটা-চারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত কি আয়োজন, খল, মধু, আদার সত্ব, তুলসীপাতার রস—কাঙালীর মা ছেলের উপর রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না ব'লে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি, বাবা! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভাল হই ত এতেই হব, বাগ্দী-দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না!

দিন দুই-তিন এম্‌নি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে যাহা মুষ্টিযোগ জানিত, হরিণের শিঙ্‌ঘষা জল, গেটে-কড়ি পুড়াইয়া

মধুতে ঝাড়িয়া চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কেবৃরেজের বড়িতে কিছু হ'ল না বাবা, আর ওদের ওষুধে কাজ হ'বে? আমি এম্‌নিই ভাল হ'ব।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি ত খেলি নে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এম্‌নি কি কেউ সারে?

আমি এম্‌নি সেরে যাবো। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।

কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফেন ঝাড়িতে, না পারিল ভাল করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না—ভিতরে জল পড়িয়া ধুঁয়া হয়; ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; মায়ের চোখ্ ছল ছল করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণকণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরল-ধারে জল পড়িতে লাগিল।

গ্রামের ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সম্মুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না! সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আন্‌তে পারিস্ বাবা?

কাকে মা?

ওই যে রে—ও গাঁয়ে যে উঠে গেছে -

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল।

কাঙালী বলিল, সে আসবে কেন মা?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বল্‌বি, মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধুলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদা-কাটা করিস্ বাবা, বলিস্, মা যাচ্ছে।

একটু থামিয়া কহিল, ফেরবার পথে অম্‌নি নাপ্‌তে বৌদির কাছ থেকে একটু আল্‌তা চেয়ে আনিস ক্যাঙালী, আমার নাম করলেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালবাসে।

ভাল তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিসের কথা এতবার এতরকম করিয়া শুনিয়াছে যে সে সেইখান হইতেই কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিল।

৪

পরদিন রসিক দুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ সংসারের কাজ সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে। কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেছে—পায়ের ধুলো নেবে যে!

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথ-যাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া দিয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধুলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দির পিসি দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধুলো।

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশনবসন দেয় নাই, কোন খোঁজ খবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধুলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রাখালের মা বলিল, এমন সতীলক্ষ্মী বামুন কায়েতের ঘরে না জন্মে' ও আমাদের দুলের ঘরে জন্মালো কেন! এইবার ওর একটু গতি ক'রে দাও বাবা—ক্যাঙ্‌লার হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।

অভাগীর অভাগের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া এ কথা যেন তীরের মত বিঁধিল।

সেদিন দিনের-বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটাও কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। কি জানি, এত ছোট-

জাতের জন্যও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়—কিন্তু এটা বুঝা গেল রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

কুটীর-প্রাঙ্গণে একটা বেল গাছ ছিল, একটা কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দরওয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কসাইয়া দিল; কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা, একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাট্‌তে লেগেছিস্?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ, এ যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ দরওয়ানজী। বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানী দরওয়ান তাহাকেও একটা অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়া ছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকা-হাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভাল হয় নাই, তাহারাই আবার দরওয়ানজীর হাতে পায়ে ধরিতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন। কারণ, অসুখের সময় যে কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালীর মা তাহারই হাতে ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছে।

দরওয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাতমুখ নাড়িয়া জানাইল, এ সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন; গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্তা। লোকগুলো যখন হিন্দুস্থানীটার কাছে ব্যর্থ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারি বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল অতবড় অসংগত অত্যাচারের কথা যদি কর্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না। হায় রে অনভিজ্ঞ! বাঙলা দেশের জমিদার ও তাহার কর্ম্মচারীকে সে চিনিত না। সদ্যোমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, অধর রায় সেইমাত্র

সন্ধ্যাহ্নিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কে রে?

আমি কাঙালী। দরওয়ানজী আমার বাবাকে মেরেছে।

বেশ করেছে। হারামজাদা খাজনা দেয় নি বুঝি?

কাঙালী কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাটতেছিল—আমার মা মরেচে—, বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।

সকাল-বেলা এই কান্না-কাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল না কি! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস্ রে, এখানে একটু গোবরজল ছড়িয়ে দে! কি জাতের ছেলে তুই?

কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।

অধর কহিলেন, দুলে! দুলের মড়ার কাঠ কি হবে শুনি?

কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে ব'লে গেছে! তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে ব'লে গেছে, সক্কলে শুনেছ যে। মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ মুহূর্ত্তে স্মরণ হওয়ায় কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্ গে। পারবি?

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যের জন্য তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়—পাজি, হতভাগা, নচ্ছার!

কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের উঠানের গাছ, বাবুমশায়! সে যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ!

হাতে-পোঁতা গাছ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দে ত!

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্ম্মচারীরাই পারে।

কাঙালী ধুলো ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন সে যে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ, ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না।

গোমস্তার নির্ব্বিকার চিত্তে দাগ পর্য্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকরি তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখ ত হে, এ ব্যাটার খাজনা বাকী পড়েছে কিনা। থাকে ত জাল-টাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয়—হারামজাদা পালাতে পারে।

* * * *

মুখুয্যেবাড়ীতে শ্রাদ্ধের দিন—মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকী। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, ঠাকুরমশাই, আমার মা ম'রে গেছে।

তুই কে? কি চাস্ তুই?

আমি কাঙালী। মা ব'লে গেছে তেনাকে আগুন দিতে।

তা দিগে' না।

কাছারির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, ও বোধ হয় একটা গাছ চায়। এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, শোন আব্দার। আমারই কত কাঠের দরকার—কাল বাদে পরশু কাজ। যা যা, এখানে কিছু হবে না—এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে-যা, মুখে একটু নুড়ো জেলে নিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দিগে'।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ছেলে ব্যস্তসমস্ত ভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখ্ছেন ভটচাজমশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হ'তে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙালী আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘণ্টা-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ানো হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তারপরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত—শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাকাব্য

ইংরাজি এপিক্‌শব্দের অনুবাদে মহাকাব্য-শব্দের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ মিলে কি না তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে আলংকারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহাকবিগণের চিন্তার কারণ কিছুই রাখেন নাই। কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য এ দেশে চলিত আছে, এবং ঐ সকল মহাকাব্য সম্ভবতঃ অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা চলে কি না, তাহা লইয়া একটা তুমুল সমস্যা গোড়াতেই দাঁড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত এপিক্‌ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে সর্ব্বদা সম্মত হন না। প্রথমতঃ, এ দুই গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলী অত্যন্ত উৎকটরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মহাকাব্য বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি আখ্যা দিলে, বোধ করি, এই দুই গ্রন্থের মর্যাদা রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উহাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়।

বস্তুতই মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়। কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জ্জুনীয় যে অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য নহে। কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয় যে শ্রেণীর—যে পর্য্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর সে পর্য্যায়ের গ্রন্থ নহে। একের নাম মহাকাব্য দিলে, অন্যকে মহাকাব্য বলা কিছুতেই সংগত হয় না।

রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহাসিকত্বে ও ধর্ম্মশাস্ত্রত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান্‌ থাকিয়াও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে উহাতে কাব্যরসও যথেষ্ট পরিমাণে

বিদ্যমান। মহর্ষি বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উঁহারা যাহা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব রহিয়া গিয়াছে,—হয়ত উঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু কবিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

রামায়ণ-মহাভারতে কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই, মহর্ষিদ্বয়কে মহাকবি ও তাঁহাদের কাব্যদ্বয়কে মহাকাব্য না বলিলে চলে না; কেন-না, ভাষাতে আর কোন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা এই কাব্যদ্বয়ের সঙ্গত নামকরণ চলিতে পারে। কুমারসম্ভব-কিরাতার্জুনীয়কে আপাততঃ মহাকাব্যের শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দিয়া আমরা রামায়ণ-মহাভারতকেই মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

মনে হইতেছে মেকলে কোথায় বলিয়াছেন, সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে। সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস করে, অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে পায় না। বলা বাহুল্য, মেকলের অনেক উক্তির মত এই উক্তিটিকেও সুধীজনে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার আস্ফালন-সত্ত্বেও ইউরোপ-খণ্ডে কবিত্বের যেরূপ স্ফূর্ত্তি দেখা গিয়াছে, তাহাই তাহার প্রমাণ। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় মেকলের ঐ উক্তির ভিতর একটু প্রচ্ছন্ন সত্য আছে। সভ্যতা কবিত্বের মস্তক চর্ব্বণ না করিতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যকে বোধ করি সশরীরে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার বলা আবশ্যক, মহাকাব্য-শব্দ আমি আলঙ্কারিক-সম্মত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব ও প্যারাডাইস লষ্টকে আমি এ স্থলে মহাকাব্যের মধ্যে ফেলিতেছি না। রামায়ণ-মহাভারত যে পর্য্যায়ের কাব্য, সেই পর্য্যায়ের কাব্যকেই আমি মহাকাব্য বলিতেছি। পৃথিবীতে কত কবি কত কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য সেই কোন্ কালে রচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর একখানাও রচিত হইল না। পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যে লেখকের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই; কিন্তু সন্দেহ হয়, কেবল হোমারের নামে প্রচলিত গ্রন্থ-দুইখানি ব্যতীত আর কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত কবিত্বের অবনতি হইয়াছে, এ-কথা কেহই বলিতে পারিবে না। কিন্তু শেক্সপীয়রের নাম মনে রাখিয়াও

অকুতোভয়ে বলা যাইতে পারে, ইউরোপ-মহাদেশেও একবারের বেশী হোমারের জন্ম হয় নাই।

বস্তুতই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার পর কত হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না। কেন এরূপ হইল, তাহার কারণ চিন্তনীয়; কিন্তু সেই কারণ-আবিষ্কারে লেখকের ক্ষমতা নাই। তবে এক একবার মনে হয়, মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা, বোধ করি, আর সেই শ্রেণীর মহাকাব্য-উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে।

রামায়ণ-মহাভারত ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা মনুষ্যসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে সেই সমাজকে আধুনিক হিসাবে সভ্য বলিতে পারা যায় না। মনুষ্যসমাজের সে অবস্থা আবার কখনও ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা জানি না, কিন্তু তাৎকালিক সমাজে যে সকল ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইত, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। আমরা এমন কল্পনায় আনিতে পারি না যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি কোন ইউরোপের রাজসভায় অতিথিস্বীকার করিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মীকে ষ্টীমারে তুলিয়া প্রস্থান করিতেছেন, ও তাহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ ইউরোপের নরপালবর্গ ওয়াশিংটন অবরুদ্ধ করিয়া দশ বৎসরকাল বসিয়া আছেন। ডিলারী বন্দীকৃত লর্ড মেথুয়েন্‌কে গাড়ীর চাকায় বাঁধিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার বন্ধুর উপত্যকায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কোন দিনের টেলিগ্রামে দেখিবার কেহ আশা করেন না। সিডান্-ক্ষেত্রে বিস্মার্ক লুই নেপোলিয়ান্‌কে হস্তগত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বুক চিরিয়া নেপোলিয়ান্-বংশের শোণিতের আস্বাদগ্রহণ আবশ্যক বোধ করেন নাই। ত্রেতাযুগ-অবসানের বহুদিন পরে বঙ্গদেশে লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষাও তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তজ্জন্য লাঙ্গুলের ব্যবহার করিতে হয় নাই।

সেকালের এই অসভ্যতা আমাদের চোখে বড়ই বীভৎস ঠেকে, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেকালের সামাজিকতার আর একটা দিক্ আছে, একালে সে দিক্‌টাও তেমন দেখিতে পাই না। বার্ক এক সময়ে আপনার মহাপ্রাণতার ঝোঁকে বলিয়াছিলেন, শিভাল্‌রির দিন গত হইয়াছে। শিভালরি-নামক

অনির্ব্বাচ্য বস্তু নগ্ন বর্ব্বরতার সহিত নিরাবরণ মনুষ্যত্বের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সমুৎপন্ন। একালে মানুষে মানুষের রক্তপান করিয়া জিঘাংসার তৃপ্তি করিতে চাহে না বটে, কিন্তু আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কটাক্ষমাত্র শাসনে, পত্নীর অপমান স্বচক্ষে দেখিয়াও, আত্মসংযমে সমর্থ হয় কি না, বলা যায় না। একালের রাজারা মালকোঁচা মারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে অবতীর্ণ হন না সত্য বটে, কিন্তু ভীমরতিগ্রস্ত পিতার একটা কথা রাখিবার জন্য ফিজিদ্বীপে নির্ব্বাসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন কি না, বলিতে পারি না। অশ্বত্থামা ঘোর নিশাকালে সুখসুপ্ত বালকবৃন্দের হত্যাসাধন করিয়া ভীষণ ক্রূরতা দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সভা ডাকিয়া ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া সেই ক্রূরতার সমর্থন তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ-সহায় পাণ্ডবগণ যখন জয়বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া নিশাকালে শত্রুশিবিরে ভীষ্মের নিকট দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভীষ্মকে তাঁহার জীবনটুকু দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের লৌহবর্ম্মের অন্তরালে কারেন্সি নোটের গোছা লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে মনুষ্যসমাজের বাহিরের খুঁটিটা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। মনুষ্যের বাহিরের পরিচ্ছদটা সম্পূর্ণ বদলাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের ভিতরের গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের রাজারাজড়াও বোধ করি, সময়মত কৌপিনধারী হইয়া সভামধ্যে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না, কিন্তু এখনকার অন্নহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিরূপতা পোশাকের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্ব্বরতা ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোন আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ, কোনরূপ রঙ-ফলানো ছিল না। একালেও ক্রূরতা, বর্ব্বরতা ও পাশবিকতা হয়ত ঠিক তেমনি বর্ত্তমান আছে, তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ স্থাপিত হইয়া তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সম্প্রতি চীনদেশে সভ্য ইউরোপের সম্মিলিত সেনা যে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে তাহাতে আটিলা ও জঙ্গিস্ খাঁর প্রেতাত্মার আর লজ্জিত হইবার কোন কারণই নাই।

বস্তুতই চারি হাজার বৎসরের ইতিহাস সংক্ষেপভাবে তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র অধিক বদলায় নাই; তবে সমাজের মূর্ত্তিটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং মনুষ্যসমাজের অবস্থা যে-কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেই কাব্যের মূর্ত্তিও যে তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। বিস্ময়ের কারণ থাক্ আর নাই থাক্, আধুনিক কালের সাহিত্যে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের আর আবির্ভাব হয় নাই, এবং আর যে কখনও হইবে তাহা আশা করাও দুষ্কর। সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়া গিয়াছে। কালের যখন অবধি নাই ও পৃথ্বী যখন বিপুলা, তখন বড় কবির ও কাব্যের অসদ্ভাব কখন হইবে না; কিন্তু মনুষ্যসমাজের সেই প্রাচীন অবস্থা ফিরিয়া আসিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে মহাকবির ও মহাকাব্যের, বোধ করি, আবির্ভাব আর হইবে না।

বস্তুতই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা, বোধ করি, আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্ম্মিত কৃত্রিম কারুকার্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্তনির্ম্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।

আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতকে এক একবার ভারতবর্ষের হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পাষাণ-কলেবরের অঙ্কদেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত সহস্র বৎসরকাল অঙ্কে রাখিয়া লালন-পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে। হিমাচলের বিশাল বক্ষোদেশ হইতে বিনিঃসৃত সহস্র উৎস হইতে সহস্র স্রোতস্বিনী অমৃতরসপ্রবাহে ভারতভূমিকে আর্দ্র ও সিক্ত করিয়া 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে, সেইরূপ মহাভারতের মধ্য হইতে সহস্র উপাখ্যান, সহস্র কাহিনী, সহস্র কথা সমগ্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্র ধারা প্রবাহিত করিয়া পূণ্যতর ভাবপ্রবাহে জাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ রাখিয়া

বহুকোটী লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্টি ও কান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ যেমন হিমাচলের স্তরবিন্যস্ত স্তরপরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে কত বিস্ময়কর জীবের অস্থিকঙ্কাল উদ্ধার করিয়া অতীতের লুপ্তস্মৃতি কালের কুক্ষি হইতে উদ্ঘাটন করেন, সেইরূপ প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই বিশাল গ্রন্থের স্তরপরম্পরা হইতে ভারতীয় জনসমাজের অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত নিদর্শনের চিহ্ন ধরিয়া ইতিহাসের অতীত অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অগ্রদূত—আল্-বেরুনী

বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সভ্যতার মধ্যে সংস্কৃতিগত সমন্বয়, মিলন, ঐক্য ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জন্য এক শ্রেণীর সুধীমণ্ডলী যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা যে সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইতে পারিতেছে না, তাহার মূল কারণ সংস্কৃতি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব, এবং ব্যাপারটিকে উদারভাবে দেখিবার ও বুঝিবার মত দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি একই বস্তু। যতগুলি ধর্ম্ম আছে, ততগুলি সংস্কৃতিও আছে। আপন আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাকে লোকে যেমন অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য মনে করে, সংস্কৃতিকেও সেই ভাবে দেখিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে; সংস্কৃতি ধর্ম্ম হইতে আলাদা বস্তু। ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক জগতের বস্তু, কিন্তু সংস্কৃতি পার্থিব জগৎকে লইয়া। মানবীয় আচার পদ্ধতি, শিক্ষাদীক্ষা, মানসিক উন্নতি, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব—এই সবের সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব মনোভাবই হইতেছে সংস্কৃতি। জাতির সর্ব্ববিধ বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির চরমতম পরিণতি হইতেছে তাহার সংস্কৃতি। এ কথা সত্য যে, ধর্ম্মের আদর্শ সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম একই বস্তু নহে। সেই জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন যতই কঠিন বোধ হউক না কেন, বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়-সাধন কঠিন ত নহেই, বরং যুগে যুগে প্রত্যেক দেশেই তাহা হইয়া আসিতেছে। ইহার জন্য দরকার প্রকৃত জ্ঞান ও উদার মনোভাব।

ভারতবর্ষ ও গ্রীস এই দুইটি অতি প্রাচীন সভ্য দেশ। এই দুইটি দেশের মধ্যে নানা বিষয়ে সংস্কৃতিগত সমন্বয় ও মিলনের চেষ্টা হইয়াছিল, সে প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। পিথাগোরাস হইতে আরম্ভ করিয়া (অথবা তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে) মেগাস্থিনিসের যুগ পর্য্যন্ত কতভাবে আর্য্য ও গ্রীক সভ্যতার মধ্যে আদান প্রদান হইয়া গিয়াছে। সেই ভাবে প্রাক্-ইস্‌লামের যুগ হইতে আরব ও ভারতের মধ্যে নানা বিষয়ে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল। উত্তর ভারতের সুপ্রসিদ্ধ মৌলানা সৈয়দ সোলায়মান্ নদবীর "আরব ও হিন্দ কি তাআল্লুকাত্" নামক মূল্যবান্ পুস্তকে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ইস্‌লামের যুগেও বহু মুসলমান ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, রাজ্যবিজয়ের উদ্দেশ্যে নয়, এ দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে। দেশ-বিজয়ের বাসনা তাহার বহু পরে হয়। কিন্তু পৌত্তলিকতার বিরোধী মুসলমানগণ এ দেশের পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখিয়া আর অধিকদূর অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা এ দেশের সংস্কৃতিকে অবহেলা করিতে লাগিলেন। প্রায় তিন শত বৎসর এইরূপ অবহেলার মধ্যে চলিল। তারপর সুলতান মাহ্‌মুদের সময় একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি সেই ছিন্ন তার যোজনা করিয়া আবার মোহন সুরে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইনি মহামনীষী পণ্ডিত আবু রয়হান্ আল্-বেরুনী। যে পথ এত দিন বন্ধ ছিল, মনীষী আল্-বেরুনী তাহা বিশ্বের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। আরব ও ভারতের মধ্যে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের জন্য তিনি সে যুগে যাহা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট চিরঋণী।

যে সব বিদেশী লেখক প্রাচীন ভারতবর্ষসম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে আল্-বেরুনীকে আমরা অতি উচ্চাসন প্রদান করিতে পারি। পৃথিবীর এক প্রান্তে বসিয়া পাঁচ-দশখানা বই পড়িয়া অপর দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া তাহাকে নিজের প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল বলিয়া চালাইয়া দিবার দুঃসাহস অনেক লেখকের আছে। কিন্তু আল্-বেরুনী সে ধরণের লেখক ছিলেন না। তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা এ যুগেও দুর্লভ। একাদিক্রমে সাত বৎসর ভারতের ভাষা বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া, এ দেশের জনসাধারণ ও পণ্ডিত শ্রেণীর লোকের সহিত প্রাণখোলাভাবে মিলিয়া-মিশিয়া সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় তাঁহার এই বিরাট্ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ও আরব দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার বিষয় অতি ব্যাপক—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, গণিত, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি। এই সব বিষয় তিনি নিরপেক্ষ দর্শকের মত তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া গ্রন্থ

লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচনার সব চেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত মতামতের আভাস খুবই কম আছে।

আল্-বেরুনীর জীবনবৃত্তান্ত খুব ঘটনাবহুল নহে। অতি সংক্ষেপেই তাহা বর্ণনা করিতেছি। তাঁহার পুরা নাম আবু রয়হান্ মহম্মদ ইব্‌নে আহ্‌মদ্ আল্-বেরুনী। মধ্য এসিয়ার খোওয়ারিজম্ নামক রাজ্যে ৯৬৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বীয় পল্লীতে তিনি অল্প বয়সে সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও গণিতবিদ্যা শিক্ষা করেন, এবং তথায় কিছু দিন শিক্ষকতা করিতে থাকেন। পরে ১০১৩ খৃঃ অব্দে উক্ত খোওয়ারিজম্ রাজ্য সুলতান মাহ্‌মুদ অধিকার করেন। সেই সময়ে আল্-বেরুনী স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সুলতান মাহ্‌মুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তাহাতে তিনি সুলতানের কোপে পতিত হন। পরে সুলতান তাঁহাকে বন্দী করিয়া ভারতে প্রেরণ করেন। তিনি বাধ্য হইয়া ভারতে যে ভাবে জীবন-যাপন করিতেছিলেন তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া দুষ্কর। কারণ, তাঁহার লিখিত বিবরণে তিনি অপরের সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছিলেন, নিজের সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই বলেন নাই। ভারতে অবস্থানকালে তাঁহাকে যত্রতত্র যাইতে দেওয়া হইত না। কিন্তু হিন্দু পণ্ডিত ও সাধুদের সহিত মিলিবার ও মিশিবার অনুমতি তিনি পাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর। অবসরসময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখিতে লাগিলেন; এবং কয়েক বৎসর বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তিনি হিন্দু বিজ্ঞান, দর্শন, ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ ও গণিতবিদ্যা শিখিয়া ফেলিলেন; এবং সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দ্বারা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্বন্ধে কয়েকখানা মূল্যবান্ পুস্তক লিখিলেন।

ইতিপূর্ব্বে যে সব মুসলমান লেখক হিন্দুদের ধর্ম্ম, সামাজিক ব্যবস্থা, দর্শন ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, আল্-বেরুনী যে তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁহার রচিত গ্রন্থই সে পরিচয় প্রদান করিবে। তাঁহার "কিতাব আত্ তহকীক আল্ হিন্দ" একখানা বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, উহার সহিত ইস্‌লামিক দর্শন বিশেষতঃ সুফি মতবাদের বিশেষ পার্থক্য নাই; অন্ততঃ মূলগত আদর্শ বিষয়ে। একজন নিরপেক্ষ দর্শকের মত তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখিলেন যে, হিন্দু মানসিকতার অধঃপতনের মূল কারণ উহাদের দর্শন বা

শাস্ত্রের মধ্যে নাই। সাধারণের মধ্যে বিদ্যা-চর্চ্চা কমিয়া আসাতে পৌরোহিত্যের প্রভাব বৃদ্ধি পাইল এবং তাহা হইতে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ও স্ফুরণ আর হইল না। তিনি এই উক্তি কেবল হিন্দুদের বেলায় করেন নাই। তাঁহার মতে মুসলিম মানসিকতার অধঃপতনের মূল কারণ তুর্ক-প্রাধান্য-বৃদ্ধি।

ভারতবর্ষসম্বন্ধে পক্ষপাতবিহীন সঠিক বিবরণ লিখিবার প্রেরণা তিনি তাঁহার গুরু আবু সোহলের নিকট প্রাপ্ত হন। তিনি আল্-বেরুনীকে বলেন, ভারত-বিষয়ক এমন গ্রন্থ লিখিতে হইবে যাহাতে সত্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। তাই মহাত্মা আল্ বেরুনী গুরুর আদেশ নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার "কিতাবুল হিন্দে"র মুখবন্ধে লিখিতেছেনঃ—
"আমি হিন্দু ধর্ম্ম ও সভ্যতাসম্বন্ধে লিখিতে অগ্রসর হইলাম। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অপ্রামাণিক অভিযোগ দিব না। আমি যদিও মুসলমান, তবুও তাহাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে যেমনভাবে দেখিয়াছি, ঠিক সেই ভাবে বর্ণনা করিতে কাতর হই নাই। তাহাদের ধর্ম্ম-নীতি যদিও ইস্লামের অনুরূপ নহে, তবুও তাহা কোনওরূপ রং ফলাইয়া লিখি নাই—ইহা নিরপেক্ষ ব্যক্তির ঘটনা-বর্ণনা মাত্র। ইহাতে আমার অতিরঞ্জন কিছুই থাকিবে না।"

অনেক অহিন্দু প্রাচীন ভারতের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বহু ভ্রমে পতিত হন। কারণ, তাঁহারা অনুবাদের অনুবাদ তস্য অনুবাদ পড়িয়া সাত নকলে আসল খাস্তা করিয়া দেন। দশম ও একাদশ শতাব্দীর ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহারা বলেন যে, ভারতের হিন্দুগণ বিভিন্ন জাতিতে এমন ভাবে বিভক্ত ছিল যে, তাহাদের মধ্যে কোনরূপ ঐক্য ছিল না। কিন্তু শত পার্থক্যের মধ্যেও সমগ্র হিন্দু সমাজে একটা একজাতীয়তার ভাব ছিল, তীক্ষ্ণদর্শী আল্-বেরুনী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন যে, সেই একাদশ শতাব্দীতেও Hindus were a single people, one and undivided—হিন্দুরা একই অবিভক্ত জাতি ছিল। সত্য বটে, দেশে নানাবিধ দেবদেবীর পূজা আরাধনা ছিল, নানাবিধ দল ও উপদল ছিল, এবং দার্শনিক মতও নানা প্রকার ছিল। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? সমস্ত দল ও উপদল তাহাদের বিভিন্ন আদর্শ লইয়া পরস্পরের সহিত শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত পাশাপাশি বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। উচ্চশিক্ষিত হিন্দুগণ দেবদেবীসম্বন্ধে সাধারণ লোক হইতে পৃথক্ ধারণা পোষণ করিতেন। দেবদেবীতে বিশ্বাস সাধারণের জন্য দরকারী মনে করিলেও তাঁহারা নিজেরা উহাতে প্রগাঢ়ভাবে

বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং তাঁহারা প্লেটোর মত বিশ্বাস করিতেন যে, God is in the singular number—"ঈশ্বর একবচনাত্মক আদর্শ।"

আল্-বেরূনীর মতে, হিন্দুদের বিভিন্ন দার্শনিকগণের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তাহা বাহ্যিক, মৌলিক নহে। তিনি সমস্ত মতবাদ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই সব মতবাদের মধ্যে একটা সাধারণ ভিত্তি আছে। রসায়ন, গণিত, বস্তুবিজ্ঞান, বিশ্ববিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা ছিল। ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন দেবদেবীকে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ উদারভাবে দেখিতেন। সেই জন্য এক দল অন্য দলের সহিত মতের জন্য যুদ্ধ করিত না। বিভিন্ন স্থানে সামাজিক আচার-ব্যবহার কিছু কিছু বিভিন্ন ছিল, কিন্তু সমগ্র দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র একই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও জীবন-সম্বন্ধে একই আদর্শ ছিল।

সে যুগের হিন্দুদের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া আল্-বেরূনী তাহাদের ত্রুটিবিচ্যুতির কথা লিখিতেও ভুলেন নাই। একপ্রকার দাসমনোভাব ধীরে ধীরে তাহাদিগকে গ্রাস করিতেছিল। পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাহারা কাহারও সহিত জ্ঞানের আদান প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিল না। একটু গর্ব্বিত, একটু গোঁড়া ও নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা তাহাদের বৈশিষ্ট্য হইয়া পড়িয়াছিল। আর কেহ যে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ইহা তাহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না।

হিন্দু সমাজের জাতিভেদ-প্রথাকে আল্-বেরূনী সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। তিনি উহাকে সমর্থন করেন নাই, তবে খুব ধীরভাবেই এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। জাতিভেদ-প্রথার জন্য দশম শতাব্দীর হিন্দু সমাজ দায়ী নহে। তাহারও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে উহার উৎপত্তি। আল্-বেরূনী এ কথাও বলিতে ভুলেন নাই যে, এই প্রকার জাতিভেদ-প্রথা অন্যান্য বহু দেশেও ছিল। পারস্যেও উক্ত প্রকার জাতিভেদ-প্রথা ছিল। হিন্দু ধর্ম্মের চরমতম বিকাশে জাতিভেদ-প্রথার স্থান নাই। কারণ, তখন ব্রাহ্মণ হিন্দুও শূদ্রের নিকট মাথা নত করে।

আল্-বেরূনী গীতোর একটা শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, গীতার এক স্থানে আছে:—ঈশ্বর জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দয়া বিতরণ করেন। যদি মানুষ সৎকর্ম্ম করিতে গিয়ে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়, তবে তিনি সেই সৎকর্ম্মকে মন্দ বলিয়া ধরেন। এখানে একটা কথা লক্ষ্য করিতে

হইবে যে, হিন্দু ধর্ম্মের এই প্রকার উদার ব্যাখ্যা বর্ত্তমান যুগের সংস্কারবাদী হিন্দু পণ্ডিতের কথা নয়। সেই দশম শতাব্দীতে যুক্তিবাদী ভিন্নদেশীয় মুসলমান দার্শনিক হিন্দু ধর্ম্মকে যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা তাঁহারই অপক্ষপাতপূর্ণ গবেষণার ফল।

আল্-বেরূনী সে যুগের হিন্দুদের আর একটা প্রধান দোষ লক্ষ্য করিয়াছেন। সেটা হইতেছে তাহাদের তীব্র আগ্রহের অভাব। হয়ত ইহা সাহসের অভাবে নয়, কিন্তু ইহা তাহাদের ছিল। আর এই জন্য তাহারা খুব বড় বড় কাজ করিতে অশক্ত হইয়া পড়িতেছিল। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, বহু বিজ্ঞ হিন্দু ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করিতেন ; এবং মূর্ত্তিপূজার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ ছিল না। আবার তিনি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, একদল গোঁড়া ও সংস্কারাপন্ন লোক ঈশ্বরসম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব সব রকম কথাই বিশ্বাস করিতেন। ইহার কারণ কি? আল্-বেরূনী বলিতেছেন, ইহার প্রধান কারণ দার্শনিক পণ্ডিতগণের সাধারণের মধ্যে সত্যপ্রচারের আগ্রহের অভাব। ঈশ্বরসম্বন্ধে যখন সাধারণ লোকের বিশ্বাস ও দার্শনিকের বিশ্বাসের মধ্যে বিরোধ বাধিত, তখন দার্শনিক পণ্ডিতগণ হয় দার্শনিক মত পরিত্যাগ করিতেন, অথবা জনসাধারণকে তাহাদের জ্ঞানানুসারে ঈশ্বরসম্বন্ধে জ্ঞান দান করিতেন।

হিন্দু দর্শন ছিল মূলতঃ esoteric (আভ্যন্তরীণ)। ইহা কুসংস্কার ও আচার-মূলক বিশ্বাস হইতে মুক্ত। কিন্তু হিন্দু দার্শনিক ও সুধীগণ সাধারণের মধ্যে এই সব উচ্চ ভাব ও দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিবার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য গ্রহণ করেন নাই। হিন্দু দার্শনিকদের এই আচরণকে আল্-বেরূনী সমর্থন করেন নাই।

জ্ঞানবিজ্ঞানের কতকগুলি শাখায় হিন্দুরা যে খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আল্-বেরূনী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের সাহিত্য তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রীত ও মুগ্ধ করিয়াছিল। হিন্দু-সাহিত্যের মধ্যে বেদকে তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, সমগ্র বেদটা একখানি গ্রন্থ, যদিও ইহা চারিভাগে বিভক্ত। তাঁহার যুগের ব্রাহ্মণগণ ইহা পাঠ করিতেন বটে কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহার অর্থ বুঝিতেন না। বেদকে তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পুরাণ তাঁহার মতে ঋষিদের রচিত গ্রন্থ। পুরাণ অষ্টাদশ খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে

অনেক গাল-গল্প থাকিলেও বহু নীতি ও উপদেশে ইহা পরিপূর্ণ; এবং ইহার অনেক গল্প রূপক। স্মৃতিশাস্ত্র বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে আইন, কার্য্যবিধি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিষয় আছে।

বিজ্ঞানালোচনার জন্য যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি আর্য্যদের জানা ছিল; এবং তাঁহাদের বিজ্ঞান বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল, যথা, বস্তুবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মাপবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁহারা প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। আল্-বেরুনী আর্য্যদের জ্যোতির্বিদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষসম্বন্ধে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, জ্যোতির্বিদ্যাসম্বন্ধে আর্যদের জ্ঞান গ্রীক হইতেও স্পষ্ট ছিল। কিন্তু ফলিত জ্যোতিষকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই; এবং এ কথাও বলিয়াছেন যে, সে যুগের অনেক দার্শনিক হিন্দু তাহাতে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। রসায়ন ও ঔষধতত্ত্বে আর্য্যদের যে বিশেষ জ্ঞান ছিল, তাহা আল্-বেরুনী বার বার বলিয়াছেন। চরকের গ্রন্থ ঔষধ বিজ্ঞানের মূল ও প্রামাণিক গ্রন্থ।

পঞ্চতন্ত্রখানি অনুবাদ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু গল্প অপেক্ষা বিদ্যার্জ্জনের দিকে তাঁহার বেশী ঝোঁক ছিল বলিয়া তিনি তাহাতে হাত দেন নাই।

আল্-বেরুনী অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন, কতকগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন শ্রেণী বিভাগ করেন। আবার কতকগুলির লিপি উদ্ধারও করিয়াছিলেন; এবং তিনি অনেক গ্রন্থকে অবজ্ঞা ও বিস্মৃতির গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়া লোকলোচনের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। বহু দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ যে অমর কীর্ত্তি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দশম শতাব্দীর ভারতের এক উজ্জ্বল ইতিহাস। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথায় বলিতে হয়, "যথার্থবাদী ঐতিহাসিক বলিয়া, ভারতের প্রাচীন বিদ্যার একাগ্রচিত্ত অনুশীলনকারী বলিয়া সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে আল্-বেরুনীর নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হয়, এবং তাঁহার বই সযত্নে পঠিত ও আলোচিত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে সত্য পরিচয়-স্থাপনের চেষ্টায় জ্ঞানকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন বলিয়া আল্-বেরুনী সমস্ত সভ্য মানবের সাধুবাদের যোগ্য।"

আজ আমরা জাতিসমন্বয়, ধর্ম্মসমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক মিলন ও সম্প্রীতির

কথা আলোচনা করি, অথচ যাহাদের সহিত সমন্বয় ও মিলন করিতে যাইব, তাহাদের ভিতরের খবর একেবারেই রাখি না। আর যাহা রাখি, তাহা মিস্ মেয়ো, অথবা স্যার উইলিয়াম মূইরের পক্ষপাতপূর্ণ একদেশদর্শী গ্রন্থ পাঠ করিয়া। আমাদিগকে এই পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং আল্-বেরূনীর পন্থা অবলম্বন করিয়া অপরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।

আল্-বেরূনীর বহু পরে ভারত-সম্রাট্ শাহ্জাহান-পুত্র মহাত্মা সাধক দারা শিকোহ্ এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন; এবং তিনি সেই উদ্দেশ্যে কতিপয় পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। "মাজমাউল বাহরায়েন"-অর্থাৎ "দুই সাগরের মিলন" নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি আমাদিগকে এই পথের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। মহাজন-নির্দ্দেশমত সেই সব পথ ধরিয়া যদি আমরা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পরস্পরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বিষয় আলোচনা করি এবং পূর্ব্ব হইতে বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব পরিত্যাগ করি, তবে আশা করা যায়—মহামনীষী আল্ বেরূনীর সাধনা সার্থক হইবে, মহাপ্রাণ সাধক দারা শিকোহের আত্মবলিদান সফল হইবে, এবং ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতিগত সমন্বয়, মিলন ও সদ্ভাব সম্ভব হইবে।

—রেজাউল করীম

স্বদেশমন্ত্র

বাহ্য জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে প্রত্যক্ষ শক্তি-সংগ্রহ-রূপ, প্রমাণ-বাহন, শতসূর্য্য-জ্যোতিঃ আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি-প্রতিঘাতী প্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষীর উদ্ঘাটিত, যুগ-যুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্ব্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ব্বপুরুষদিগের অপূর্ব্ব বীর্য্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্ব-কাহিনী।

একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী স্বরে, পূর্ব্ব-দেবদিগের আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্রিত পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গীতে অপূর্ব্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান ইত্যাদির দৃশ্য উপস্থিত হইয়াছে। একদিকে পাশ্চাত্ত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্য্যসমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্ত্য দেশে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায় রাজনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায় ত্যাগ। বর্ত্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে—বৃথা ভবিষ্যৎ আধ্যাত্ম কল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্ব্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছি—

"ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ।
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।।"

একদিকে, নব্য ভারত-ভারতী বলিতেছেন, পতি-পত্নী-নির্ব্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত; কারণ, যে বিবাহ আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্ব্বাচন করিব; অপরদিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

একদিকে, নব্য ভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্ত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্ত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন হইব; অপরদিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহ-চর্ম্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?

একদিকে, নব্য ভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্ত্য জাতিরা যাহা করে, তাহাই ভাল; ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপরদিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান!

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টাযত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই?

আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ কি সর্ব্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।" যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষ সর্ব্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। কিন্তু একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, "বুঝি কোনও ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল।"

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা; পাশ্চাত্ত্য অনুকরণ-মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে ভালমন্দের জ্ঞান, আর বুঝি বিচার শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গেরা যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই

ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?

পাশ্চাত্ত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল; পাশ্চাত্ত্য নারী স্বয়ংবরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান; পাশ্চাত্ত্য পুরুষ আমাদের বেশ, ভূষা, অশন, বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ; পাশ্চাত্ত্যেরা মূর্ত্তিপূজা দোষাবহ বলে, অতএব মূর্ত্তিপূজা অতি দূষিত, সন্দেহ কি?

পাশ্চাত্ত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দাও। পাশ্চাত্ত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে, অতএব সর্ব্ববর্ণ একাকার হও। পাশ্চাত্ত্যেরা বাল্যবিবাহ সর্ব্বদোষের আকর বলে, অতএব তাহা অতি মন্দ নিশ্চিত।

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য—ইহাই বিচার করিতেছি না, তবে যদি পাশ্চাত্ত্যদিগের অবজ্ঞা দৃষ্টিমাত্রই আমাদের রীতি-নীতির জঘন্যতার কারণ হয়, তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্ত্তব্য।

বলবানের দিকে সকলে যায়, গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গায়ে কোনওপ্রকার একটু লাগে, দুর্ব্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশ-ভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের সজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!! চতুর্দ্দশ শত বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্শীরা এক্ষণে আর "নেটিভ" নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রহ্মণ্যগৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্য্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্ত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি উহারা অনার্য্যজাতি॥ উহারা আর আমাদের কেহ নহে!!

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা-সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের বা নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই

"মায়ের" জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামানবের ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারত-বাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সুন্দর

যারা ভাঁর পণ্ডিত তারা সুন্দরকে প্রদীপ ধরে দেখতে চলে আর যাঁরা কবি ও রূপদক্ষ তারা সুন্দরের নিজেরই প্রভায় সুন্দরকে দেখে' নেয়, অন্ধকারের মধ্যেও অভিসার করে তাদের মন। আলোর বেলাতেই কেবল সুন্দর আসেন দেখা দিতে, কালোর দিক থেকে তিনি দূরে থাকেন—একথা একেবারেই বলা চলে না, বিষম অন্ধকার না বলে বলতে হ'ল বিশদ অন্ধকার—যদিও ভাষাতত্ত্ববিদ্ এরূপ কথায় দোষ দেখবেন। কালো দিয়ে যে আলো এবং রঙ সবই ব্যক্ত করা যায় সুন্দরভাবে তা রূপদক্ষ মাত্রেই জানেন। এই যে সুন্দর কালো এর সাধনা বড় কঠিন। সেইজন্য জাপানে ও চীনদেশে একটা বয়স না পার হলে কালি দিয়ে ছবি আঁকতে হুকুম পায় না গুরুর কাছ থেকে শিল্পশিক্ষার্থীরা। যে রচনায় রস রইলো সেই রচনাই সুন্দর হ'ল এটা স্থির, কিন্তু রস পাবার মত মনটি সকল মানুষেই সমানভাবে বিদ্যমান নেই, কাজেই এটা ভাল ওটা ভাল নয় এই রকম কথা ওঠে। মেঘের সঙ্গে ময়ূরের মিত্রতা, তাই কোন্ একদিন নিজের গলা থেকে গন্ধর্ব্বনগরের বিচিত্র রঙের তারা-ফুলে গাঁথা রঙীন মালা ময়ূরের গলায় পরিয়ে দিয়ে মেঘ তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলে। মানুষ প্রথম ভাবলে, এমন সুন্দর সাজ কারো নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সে দেখলে বকের পাতি পদ্মফুলের মালার ছলে সুন্দর হয়ে মেঘের বুক থেকে মাটির বুকে নেমে এল,—মানুষ বল্লে, ময়ূর ও বক এরা দুইটিই সুন্দর। আবার এল একদিন জলের ধারে সারস পাখী—মেঘ যাকে নিজের গায়ের রঙে সাজিয়ে পাঠালে। এমনি একের পর এক সুন্দর দেখতে দেখতে মানুষ বর্ষাকাল কাটালে, তারপর শরতে দেখা দিলে আকাশে নীলপদ্মমালার দুটি পাপড়িতে সেজে নীলকণ্ঠ পাখী। এমনি ঋতুর পর ঋতুতে সুন্দরের সন্দেশ-বহ আসতে লাগলো একটির পর একটি মানুষের কাছে—সবশেষে এলো রাতের কালো পাখী আকাশপটের আলো নিভিয়ে অন্ধকার দুখানি পাখনা মেলে—পৃথিবীর কোন ফুল, আকাশের কোন তারার সঙ্গে মানুষ তার তুলনা খুঁজে না পেয়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো।

এই যে একটি মানুষের কথা বল্লেম, এমন মানুষ জগতে একটি দুটি পাই যার কাছে সুন্দর ধরা দিচ্ছেন সকল দিকে নানা সাজে নানা রূপে বর্ণে সুরে ছন্দে! ময়ূরই সুন্দর, কর্কবিন্দ্ধ নয়, কাক নয় এই কথা যারা বলছে এমন মানুষই পৃথিবী ছেয়ে রয়েছে দেখতে পাই।

যার চোখ সুন্দরকে দেখতে পেলে না আজন্ম তার চোখের উপরে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা ঘষে ঘষে ক্ষইয়ে ফেল্লেও ফল পাওয়া যায় না, আবার যে সুন্দরকে দেখতে পেলে সে অতি-সহজেই দেখে নিতে পারলে সুন্দরকে, কোনো গুরুর উপদেশ পরামর্শ এবং ডাক্তারি দরকার হ'ল না তার, বিনা অঞ্জনেই সে নয়নরঞ্জনকে চিনে নিলে।

মাটি থেকে আরম্ভ করে সোনা পর্য্যন্ত, যে ভাষায় কথা চলে সেটি থেকে ছন্দোময় ভাষা পর্য্যন্ত, তারের সুর থেকে গলার সুর পর্য্যন্ত বহুতর উপকরণ দিয়ে রূপদক্ষেরা রচনা ক'রে চলেছেন সুন্দরের জন্য বিচিত্র আসন, মানুষের কাজে কতটা লাগবে কি না লাগবে এ ভাবনা তাঁদের নেই। কাদায় যে গড়ে সে কাদাছানা থেকেই সুন্দরের ধ্যান ক'রে চলে, না হ'লে গড়ার উপযুক্ত ক'রে মাটি কিছুতে প্রস্তুত করতে পারে না সে—একথাটা কারিগরের কাছে হেঁয়ালী নয়। চাষের আরম্ভ থেকেই সোনার ধানের স্বপ্ন জমীতে বিছিয়ে দেয় চাষা, কিন্তু যার সুন্দরের ধ্যান মনে নেই সে যখন ভাল মাটি নিয়ে ব'সে যায় এবং দেখে মাটি বাগ মানছে না তার হাতে, তখন সে হয়তো বোঝে হয়তো বোঝেও না কথাটার মর্ম্ম।

ছন্দ, সুর-সাধা এবং রঙ-প্রস্তুত ও তুলি-টানার প্রকরণ সহজে মানুষ আয়ত্ত করতে পারে, কিন্তু তুলি-টানা হাতুড়ি-পেটা কলম-চালানোর আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত সুন্দরের ধ্যানে মনকে স্থির রাখতে সবাই পারে না, এমন কি যারা রূপদক্ষ তারাও সময়ে সময়ে লক্ষ্য হারিয়ে ফেলছে তাও দেখা যায়।

যে রচনাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তার মধ্যে রচনার কল-কৌশল ধরা যায় না—কথা সে যেন ভারি সহজে বলা হয়ে যায় সেখানে। এই যে সহজ গতি এ থাকে না যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয় তাতে—কৌশল নৈপুণ্য সবই চোখে পড়ে। কবিতা থেকে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, ছবি মূর্ত্তি সব থেকে এটা প্রমাণ করা চলে। কর্ম্ম কোনো রকমে নিষ্পন্ন হ'ল এবং কর্ম্ম খুব হাঁকডাক ধুমধামে নিষ্পন্ন হয়ে গেল কিন্তু কর্ম্মের জঞ্জালগুলো চোখে পড়লো না।

আমি একবার একটা ছাপার কল অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। যন্ত্রটা একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষের কাজ একা করছে, মানুষের চেয়ে সুচারু ও দ্রুতভাবে। এতে ক'রে ভারি একটা আনন্দ হ'ল, কিন্তু একটি পাখীকে উড়তে দেখে যে আনন্দ তার সঙ্গে সেদিনের আনন্দের তফাৎ ছিল। পাখীর ডানার মধ্যে নানা কল-বল কি ভাবে কাজ করছে তার খোঁজই নেই, ওড়ার সুন্দর ছন্দই সেখানে দেখা দিয়ে মনকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কোন্ দেশে তার ঠিক নেই। সৃষ্টির নিয়মে সমস্ত সুন্দর জিনিষ আপনার নির্ম্মাণের কৌশল লুকিয়ে চল্লো দর্শকের কাছ থেকে এবং এই নিয়মই মেনে চল্লো সমস্ত সুন্দর জিনিষ যা মানুষে রচনা ক'রলে—যেখানে নির্ম্মাণের নানা প্রকরণ ও কৌশল ধরা প'ড়ে গেল সেখানেই রচনার সৌন্দর্য্য হানি হ'ল, কলের দিক্ ফুটলো কিন্তু রসের দিক্ সৌন্দর্য্যের দিক্ চাপা প'ড়ে গেল। ঘুড়ি যখন আকাশে ওড়ে তখন যে কলটি তাতে বেঁধে দেয় কারিগর, সেটি বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে যায় তবেই সুন্দর ঠেকে ঘুড়িখানির ওড়ার ছন্দ। জাহাজ এমন কি উড়ো কল তারাও দেখায় সুন্দর এই কারণে এবং সবচেয়ে দেখায় সুন্দর গঙ্গার উপরে নৌকাগুলি যার চলার হিসেব ও কল-বল প্রত্যক্ষ হয়েও চক্ষুশূল হচ্ছে না।

সুন্দর জিনিষের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা—যেমন রূপ, তেমনি ভাব। বহিরঙ্গ যা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়ে সুন্দর বর্ত্তমান হ'ল। চোখের বাইরে যে পরকলা তার সঙ্গে চোখের ভিতরে যে মণিদর্পণ তার যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য হ'ল; তখনই সুন্দর-ভাবে দেখতে পাওয়া গেল বিশ্বের জিনিষ, চশমার কাঁচে আঁচড় প'ড়লো চোখ রইলো পরিষ্কার, কিংবা চোখের মণিতে ছানি প'ড়লো চশমা রইলো ঠিকঠাক, এ হ'লে সুন্দর দেখা একেবারেই সম্ভব হ'ল না।

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভদ্রতা

ভদ্রতা আত্মীয়তার চেয়ে কিছু কম এবং সামাজিকতার চেয়ে কিছু বেশী। আত্মীয়তা আন্তরিক, সামাজিকতা আনুষ্ঠানিক। ভদ্রতা উভয়ের মধ্যে সেতু-স্বরূপ, এবং উভচর।

এই বন্ধনের গুণেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা সম্ভবপর হয়, নচেৎ বাকি শুধু উচ্ছৃঙ্খল একাকার পশুত্ব, কিংবা মুক্ত নিরাকার দেবত্ব।

অবশ্য যেখানে ভালবাসা, ভক্তি, ভয় বা অন্য কোন ভ-পূর্ব্বক ভাবাত্মক সম্বন্ধ বিদ্যমান, সেখানে ভদ্রতার কথা ওঠেই না,—কারণ, খণ্ড ত সমগ্রের অন্তর্গত। যেখানে সন্তুষ্ট করবার ইচ্ছে স্বাভাবিক, সেখানে ব্যবহার ত আপনা হইতেই শুধু শিষ্ট কেন, মিষ্টই হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে অপরিচয় বা অতি পরিচয় বা ঔদাসীন্যবশতঃ মন সহজে অনুকূল নয়, সেইখানেই ভদ্রতার শিক্ষা ও চর্চ্চার প্রয়োজন। অর্থাৎ মনোভাব যেমনই থাকুক না কেন, লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নাম ভদ্রতা। এবং যে সমাজ যত সভ্য, তার লোক-ব্যবহার তত সদ্ভাবমূলক ও সুরুচিব্যঞ্জক।

সকলের মত এক না হলেও যেমন কার্য্যক্ষেত্রে অধিকাংশের মতে মত দিতে হয়, নইলে কাজ চলে না; তেমনি সকলের মন সমান না হলেও, সামাজিক অনুষ্ঠানে সৌভ্রাত্র ও সৌষ্ঠব রক্ষার্থে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়, তাকে বলে রীতি। ভদ্রতা রীতিমাত্র নয়, তার চেয়ে কিছু বেশী উদার। কারণ রীতি ক্রিয়া-কর্ম্মক্ষেত্রে ও স্বশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ; কিন্তু ভদ্রতা সমাজবিশেষ ও স্থানবিশেষ ছাড়িয়ে সকল সমাজ এবং সকল অবস্থায় পরিব্যাপ্ত। মানুষমাত্রেই পরস্পরের কাছে তা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা দাবি করতে পারে।

অপরপক্ষে নীতির তুলনায় ভদ্রতার ক্ষেত্র অনেক সংকীর্ণ। কোমর বেঁধে পৃথিবীর দুঃখ দূর বা পরের উপকার করতে যাওয়া, কিংবা ন্যায়ান্যায়ের বিচারপূর্বক চলা, অথবা মহৎ কর্তব্য পালন করা ভদ্রতার এলাকা নয়। যারা কাছাকাছি আছে, কিংবা ঘটনাচক্রে এসে পড়েছে, তাদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করাই তার মূল উদ্দেশ্য। সার্থক এবং উপস্থিত নিয়ে তার কারবার,—কিন্তু অভাবপক্ষে তারই মধ্যে খণ্ডপ্রলয় বেধে যেতে পারে।

কিন্তু রীতির সঙ্গে ভদ্রতার এইটুকু সাদৃশ্য আছে যে, সব সময় সকলের প্রতি সকলের মনে সমান সদ্ভাব থাকা যখন সম্ভব নয় তখন অন্ততঃ বাইরের প্রকাশের সুষমাবিধানার্থে অনুষ্ঠানের নায়-ব্যবহারকেও কতকগুলি নিয়মাধীন করা সমাজ আবশ্যক মনে করে। আর নীতির সঙ্গে তার এইটুকু সাদৃশ্য আছে যে, মানুষের অন্তরতম প্রদেশে যদি মানুষের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি না থাকত ও পরস্পরের মনে আঘাত দেবার সহজ অপ্রবৃত্তি না হ'ত, তাহ'লে দীর্ঘকাল ধরে বহু লোকের পক্ষে সে নিয়ম রক্ষা করে চলা প্রায় অসম্ভব হ'ত। সুতরাং ভদ্রতাকে সংক্ষেপে লোকব্যবহারের ক্ষুদ্র রীতিনীতি বলা যেতে পারে। কিংবা মনুষ্য সম্বন্ধের 'লু. সা. গু.',—অর্থাৎ প্রত্যেকের পরস্পরের প্রতি সেই পরিমাণ সদ্ভাব-প্রকাশ, যেটুকু নইলে জীবন যান তৈলাভাবে অচল হয়ে পড়ত। কি ঘরে, কি বাইরে, এই সামান্য স্নেহলাভেও যে অনেক সময় মানুষকে বঞ্চিত হতে হয়, সেটি বড়ই দুঃখের বিষয়। অবশ্য সভ্যসমাজে অধিকাংশ লোকই স্পষ্টতঃ অভদ্র নয়; কিন্তু যে মার্জিত ও মোলায়েম, সদাশয় ও সুশ্রী, চৌকোষ ও চোস্ত ব্যবহারকে যথার্থ ভদ্রতা বলা যেতে পারে, তাও সুলভ নয়।

অনেকে আজকাল আক্ষেপ করেন যে, একালের ছেলেদের ভদ্রতা কমে গিয়েছে। যেহেতু অল্প লোকেরই ত্রিকালজ্ঞ হবার সুযোগ ঘটে, সে কারণ আমি এ কথার সমর্থন বা প্রতিবাদ করতে অক্ষম। তবে এইটুকু স্বীকার্য যে, আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার দিন এদেশে গেছে বা যেতে বসেছে।

তার কারণ হয়ত এই যে, একালের লোকের সময়-সংক্ষেপ। প্রত্যেক চিঠির লাইন যোড়া ভিন্ন ভিন্ন পাঠ শিখতে ও লিখতে হ'লে বোধ হয় ইস্কুলের পাঠ বন্ধ করতে হয়। আর উঠতে বসতে যদি প্রত্যেক গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়, কিংবা সকলের কুশল প্রশ্ন অন্তে অন্য কথা পাড়তে হয়, তাহ'লেও আধুনিক জীবনযাত্রা চালানো দায় হয়ে পড়ে।

আর এক কারণ এই হ'তে পারে যে, একালে গুরু-লঘু সম্পর্কের দূরত্বকে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত করবার দিকে আমাদের ঝোঁক হয়েছে। মাকে 'আপনি' বলা, বাপ-খুড়োর সামনে তটস্থ হয়ে থাকা, শাশুড়ী-ননদের কাছে এক হাত ঘোমটা টেনে ইসারায় কথা কওয়ার আমলের তুলনায় আজকাল আমরা হয়ত অপেক্ষাকৃত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি।

কিন্তু এমন যে ব্রাহ্মণ জাতি,—যার তুল্য গুরু সেকালে ছিল না, তারাও যখন কলিকালে পূর্বপ্রাপ্য পদমর্য্যাদা থেকে চ্যুত হ'তে বাধ্য হয়েছেন, তখন অন্যান্য গুরুজনকেও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণে নিজ নিজ বাকি খাজনা এবং উপরি পাওনার লোভ সংবরণপূর্বক সমতল সমকক্ষতার ক্ষেত্রে হাসিমুখে নামতে হবে, এবং কালের সঙ্গে সমপদবিক্ষেপে চল্‌তে হবে। সুতরাং উপরি-উক্ত অনুষ্ঠানের ত্রুটি মার্জনা ক'রে দেখতে হবে যে, সারভূত ভদ্রতার লক্ষণ কি,—যে ভদ্রতা সব দেশের, সব কালের এবং সব পাত্রের।

প্রতীক বা স্মরণচিহ্ন রচনার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মজ্জাগত। অসীমকে সসীমে বাঁধবার, নিরাকারকে সাকারে ধরবার প্রয়াস তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা সকলেই পৌত্তলিক; তবে প্রকাশের তারতম্য আছে, সাকারীকরণের মাত্রাভেদ আছে। মূর্তিও সাকার, মন্ত্রও সাকার,—কিন্তু কম বেশী। বড়কে ছোটর দ্বারা, ব্যষ্টিকে সমষ্টি দ্বারা, অরূপকে রূপ দ্বারা প্রকাশ করবার এই চেষ্টার উদ্দেশ্য অস্পষ্টকে পরিস্ফুট এবং অলক্ষ্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা। তোমার মনে অনেকখানি ভক্তি থাকতে পারে, কিন্তু বাইরে তার কোন চিহ্ন না দেখালে আমিই বা জানব কি ক'রে, তুমিই বা জানাবে কি ক'রে?—অতএব প্রণাম কর। অতএব দাম্পত্য-জীবনের বন্ধন লৌহ দ্বারা স্মরণ করাও, তার আনন্দ সিন্দুর-অলক্তক-তাম্বুলের লোহিত রাগে ব্যক্ত কর; এবং বৈধব্যের শূন্যতা বরণাভরণ-হীন বেশে সূচিত হোক্‌। খৃষ্টের পরার্থপর অমানুষিক যন্ত্রণা একটি ক্রুশের চতুঃসীমায় আবদ্ধ, বিশ্বলক্ষ্মীর অপরিসীম, অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য একটি পদ্মে বিকশিত, ভক্তির চক্ষে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি একটি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত।

এই চিহ্নতন্ত্রে লাভও আছে, যেহেতু মানুষের সহজ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংযত ক'রে আনবার সাহায্য করে, আবার ক্ষতিও আছে, যেহেতু জড়বস্তু দ্বারা চেতনকে, অনুষ্ঠান দ্বারা অনুভূতিকে চাপা দেবারও সাহায্য করে। প্রণাম আন্তরিক ভক্তিজ্ঞাপনও করতে পারে, আবার তার অভাব গোপনও করতে পারে।

সেইজন্য সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের সেই সকল প্রমাণের প্রতি বোধ হয় মানুষের বেশী ঝোঁক হয়েছে, যা অত সুলভ ও ক্ষণস্থায়ী নয়: যা একটিমাত্র নির্দিষ্ট আচরণে পর্য্যবসিত নয়, কিন্তু সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত।

এইজন্যই বলছিলুম যে, আনুষ্ঠানিক বা স্থূল ভদ্রতা অপেক্ষা আজকাল সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর মূল ভদ্রত্বের মূল্য বেশী হতে চলেছে। দেশকাল-ভেদে প্রথমোক্তের নানা-ভিন্ন প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু শেষোক্ত-সম্বন্ধে মতভেদের অবসর কম। ভদ্রতার এই বাহ্য আকৃতিবৈষম্য ভুলে গিয়ে তার অন্তঃপ্রকৃতি বিশ্লেষণের প্রতি মন দিলে দেখতে পাব যে, তার কতকগুলি লক্ষণ সর্ব্বজনীন ও সর্ব্ববাদিসম্মত।

প্রথমতঃ—ভদ্রতার মূল পরহিতৈষণা, এবং তার ফল সংযম। উপস্থিতমত পরের যাতে কষ্ট না হয়,—আমার বাড়ী এসে বা আমার সম্পর্কে থেকে ক্ষণকাল যাতে অন্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে,—ভদ্রলোকের স্বভাবতই এই ইচ্ছা হয়। এবং সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে হলে অনেক সময় নিজের তৎকালীন প্রতিকূল ইচ্ছা দমন করতে হয়, নিজের আপাত সুবিধা বিসর্জন দিতে হয়। আমার যে সময় জরুরী কাজ আছে, সে সময় হয়ত একজন দেখা করতে এলেন, ভদ্রতার নিয়মানুসারে আমার সব কাজ ফেলে রেখে তার আতিথ্যে মনোনিবেশ করতে হবে। কিংবা হয়ত কোন মাননীয় ব্যক্তি আমার মুখের সামনে হককে নয়, সাদাকে কালো বলছেন, আমার কণ্ঠাগ্রে এলেও মুখে বলবার সাধ্য নেই যে, "ওগো, তুমি মিথ্যা কথা বলছ, কিংবা আর একজনকে—"তোমার নিজেরই সম্পূর্ণ দোষে ত্রুটি ঘটেছে", কিংবা অপর একজনকে—"অন্যের নিন্দা করবার আগে একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখলে ভাল হয় না?"

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে সম্প্রতি যে অভদ্রতার প্রাদুর্ভাব হয়েছে, এই প্রসঙ্গে সেজন্য দুঃখপ্রকাশ না ক'রে থাকা যায় না। সরস্বতীর মন্দিরে প্রবেশ করবার সময়ও কি জুতোজোড়াটার সঙ্গে আমরা বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ দলাদলির ভাবটা বাইরে রেখে আসতে পারিনে? অবশ্য সাহিত্যচর্চ্চার যদি কোন উচ্চ লক্ষ্য থাকে ত, সে কেবল লীলা কমলের ব্যজনে অবলীলাক্রমে সাধিত হবে না, তা জানি, -অকল্যাণকে তাড়াতে হলে মধ্যে মধ্যে ঝুলার বাতাসও দেওয়া চাই। কিন্তু তীক্ষ্ম সূক্ষ্ম মারাত্মক অস্ত্র যে-কোন প্রকার রুক্ষ্মার অস্ত্র সাহিত্যরথী ব্যবহার করুন না কেন, ইতরতা বা দুঢ়তার অস্ত্রপ্রয়োগ এস্থলে নিষিদ্ধ হওয়া

উচিত। যিনি বাণীর সেবক হবার স্পর্দ্ধা রাখেন, অশুদ্ধ বাণী ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে বিশেষরূপে বিসদৃশ নয় কি?

স্পষ্টবাদীর দল উল্লিখিত সংযমাত্মক ভদ্রতাকে কপটতার নামান্তর মনে করেন। "আমার বাপু স্পষ্ট কথা" ব'লে আরম্ভ ক'রে তাঁরা মুখে যা আসে তাই বলতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না, বরং গর্ব্বই অনুভব করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মন এবং মুখের মধ্যে একটা পাকা বাঁধ বেঁধে না রাখলে দুদিনও কি সমাজ টিকতে পারে?—আমার ত মনে হয় কতকগুলি কথা বা বিষয়কে একঘরে করা ভালই হয়েছে। স্পষ্টবাদিতার দোহাই দিয়ে ভদ্রসমাজে সে বাঁধ ভাঙ্গায় আমি ত কোন বাহাদুরি বা সুবিধা দেখতে পাইনে। সামান্য একটি খিল খুলে দিলে অতি বড় বন্ধনও সহজে শিথিল হয়ে পড়ে, একটি পরদা তুলে ফেল্লেও অনেকটা আব্রু নষ্ট হ'তে পারে। কথার সংযম কিছু কম গুরুতর জিনিস নয়। যদি তা কপটতাই হয় ত সে-পরিমাণ কপটতা সমাজরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। আমাদের কান যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূক্ষ্ম শব্দের বেশী শুনতে পায় না; চোখ যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দূরতার বেশী দেখতে পায় না; তেমনি বোধ হয় অখণ্ড সম্পূর্ণ সত্য আমাদের মন গ্রাহ্য বা সহ্য করতে পারবে না ব'লেই ভগবান্ দয়া ক'রে অন্তরের আড়ালে রেখে দিয়েছেন। ঐখানেই ত তাঁর ভদ্রতা!—বেশী তলিয়ে বুঝে লাভ কি? অনেক সময় কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোয়, কিংবা ঐ কথাই একটু ঘুরিয়ে ভাব দিয়ে বলা যেতে পারে যে, অনেক সময় সত্য খুঁজতে খুঁজতে শুধু "নিখিল অশ্রুসাগরকূলে" গিয়ে পৌঁছতে হয়।

কিন্তু অল্প মাত্রায় যা উপকারী, বেশী মাত্রায় তাতেই হিতে বিপরীত হ'তে পারে, যথা, হোমিওপ্যাথি ওষুধ। পরের মনে লাগানো কথা বলব না ব'লেই যে পরের মন-যোগানো কথা বলতে হবে, তার কোন মানে নেই। কেউ কেউ ভদ্রতার সঙ্গে খোসামুদির তফাৎ করতে পারেন না ব'লে নিজের মানরক্ষার জন্য পরকে অপমান করা আবশ্যক এবং কর্ত্তব্য বোধ করেন। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে ব'লে ত আমার বিশ্বাস। ভদ্রতার সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি, খোসামুদির দৃষ্টি কেবল নিজের প্রতি; ভদ্রতা নিজের অসুবিধা ক'রেও পরের সুবিধা করে দিতে উৎসুক, খোসামুদি নিজের সুবিধাটুকুই বোঝে ও খোঁজে; ভদ্রতা চৌকোষ, সরল ও সুন্দর,—খোসামুদি একপেশে, কুটিল ও কুৎসিত। একটু সংসারজ্ঞানের চর্চ্চাই খোসামুদি এড়াবার প্রকৃষ্ট উপায়। যে

পৃথিবীতে এসেছি, সেটা কি রকম জায়গা জানতে না পারলে উন্নতিচেষ্টা করব কি ক'রে?—যেখানে শক্ত, সেইখানেই ভক্ত বা অতি ভক্ত।—যেখানে অক্ষমতা সেইখানেই পরমুখাপেক্ষিতা। ছোট ছেলে কি কম খোসামুদে? তবে তাদের সবই সুন্দর।

আর একটি জিনিস আছে, যা ভদ্রতার বেনামিতে চলে, অথচ বেশী পরিমাণে যা ক্ষতিকর,—সেটি হচ্ছে চক্ষুলজ্জা। এটি আমাদের দেশের ও জাতের একটি রোগবিশেষ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, এবং খুব কম লোকই সে রোগ হ'তে মুক্ত। মনে মনে আমার কোন একটি অনুরোধ রক্ষা করবার মোটেই ইচ্ছা নেই, এমন কি অভিপ্রায় নেই,—অথচ চক্ষুলজ্জায় পড়ে আমি অনুরোধকর্ত্তার সামনে বেশ একটু উৎসাহসহকারেই তার প্রস্তাবে সম্মত হলুম। এ স্থলে যদি বিরক্তভাবে কাজটা ক'রে দিই ত মন্দের ভাল; কিন্তু একবার একজনের জন্য করলেই ত অব্যাহতি পাওয়া যায় না, আর ক্রমাগত অনিচ্ছাসত্ত্বে ঢোঁক গিলুলেও নিজের হজমশক্তির উপর একটু অত্যাচার করা হয়। আবার যদি করব ব'লে না করি, তাহ'লে নিজের কথারও খেলাপী হয় নিজের মনও খুঁৎখুঁৎ করে, আর অনর্থক পরের আশাভঙ্গও করা হয়। মতামত সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ভদ্রতার সঙ্গে একটু দৃঢ়তা মেশানোই উক্ত রোগের একমাত্র চিকিৎসা। অমায়িক অথচ আত্মপ্রতিষ্ঠ লোকপ্রিয় অথচ সত্যনিষ্ঠ,—এমন সংমিশ্রণ এদেশে এত দুর্লভ কেন? কেন খাঁটি লোক যেন রুক্ষ হ'তেই বাধ্য, এবং শিষ্ট শান্ত ব্যক্তির উপর জুলুম হওয়াটাই নিয়ম?—তাও বলি যে দাতা ও গ্রহীতা না হ'লে যেমন দান সম্পূর্ণ হয় না, তেমনি অনুরোধকারীও মাত্রা বুঝে পীড়াপীড়ি করলে তবেই ভদ্রতা রক্ষা করা সম্ভব,—নইলে অযথা টান পড়লে ছিঁড়তে কতক্ষণ!

সংযম যেমন ভদ্রতার প্রধান নিবৃত্তিমূলক লক্ষণ, তেমনি সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি বা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা তার প্রধান প্রবৃত্তিমূলক লক্ষণ। অর্থ-সামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি, রূপগুণ, মানমর্য্যাদা যার যেমনই থাকুক না কেন, কম হ'লেও তাকে পায়ের তলায় ঠাসবার দরকার নেই, বেশী হ'লেও তার পায়ের তলায় পড়ে থাকবার দরকার নেই। যাকে ভাল লাগে তার সঙ্গে গলাগলিও ক'র না, যাকে মন্দ লাগে তাকে গালাগালিও দিও না, সকলের প্রতি সহজ সদয় ব্যবহার ক'র,—এই হচ্ছে ভদ্রতার বিধান। ভদ্রতা ব্যবহারনীতি মাত্র, মনের নিয়ন্তা নয়। তবে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে, বাইরে যে ভাব দেখানো যায়, সেটা ক্রমে

মনের ভিতর পর্যন্ত সংক্রামিত হয়, যেমন রাগের প্রকাশ দমন করতে করতে রাগ কমে আসা সম্ভব। পূর্বে ভদ্রতাকে বাঁধ বলেছি; আবশ্যক স্থলে এই বাঁধই যে প্রাচীরের কাজ করতে পারে, তার আর আশ্চর্য্য কি? যেখানে এই প্রাণের এই আড়ালটুকু রাখতে চাইনে, অর্থাৎ যেখানে প্রকাশই উদ্দেশ্য—সেখানে অবশ্য ভদ্রতার কাজ ফুরায় এবং উচ্চতর নেতার হাতে রাজদণ্ড দিয়ে সে সরে পড়ে।

সেইজন্যই আত্মীয়তা যেখানে শুধু রক্ত নয়, অন্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত ভদ্রতার ব্যবধান সেখানে অনাবশ্যক,—এমন কি অপ্রীতিকর। অতি দুঃখের বিষয়, নিকট এবং স্থায়ী সম্পর্ক স্থলেও যখন সব সময়ে আশানুরূপ মনের মিল থাকে না, তখন আত্মীয়ের মধ্যেও সাধারণতঃ ভদ্রতার নিয়ম উপেক্ষা না করাই ভাল। একসঙ্গে থাকতে গেলে অষ্টপ্রহর মেজাজে মেজাজে স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ হয়ে যে উত্তাপ সঞ্চিত হয়, দৈনিক কর্ম্মজীবনযাত্রায় অনিবার্য ভাবে যে ধূলিজাল উত্থিত হতে থাকে, ভদ্রতার স্নিগ্ধ শান্তিবারিসিঞ্চনই তা কথঞ্চিৎ নিবারণের অন্যতম উপায়। নিজ নিজ পারিবারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই অধিকাংশ লোক বুঝতে পারবেন যে, সময়মত একটু সহৃদয় ব্যবহার, অবস্থা বুঝে একটু সংযম, একটি মিষ্ট কথা, একটি হাসির আলোর অভাবে শেষে পরস্পরের মনে এমন দাগ লেগে যায় যে, হাজার চেষ্টাতেও তা মুছে ফেলা যায় না, ভাঙ্গা জোড়া লাগলেও জোড়ের চিহ্ন চিরকাল থেকে যায়। হাঁড়ি কলসী একসঙ্গে থাকলেই ঠোকাঠুকি হয়, সে কথা সত্য, কিন্তু একটু ঘন করে প্রলেপ দিলে আওয়াজটা কম হয়, এবং টেকেও বেশীদিন! বাঙালীরাও পরিবারগতপ্রাণ। সেই পারিবারিক জীবনের উপর প্রায় তার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ নির্ভর করে। তাই সুখের সংসার গড়ে তোলবার কোন উপচারই আমাদের অবহেলা করা উচিত নয়। বাইরে যতই মানসম্ভ্রম নামডাক থাকুক না কেন, বাড়ীর ভিতরে শান্তি না থাকলে কোন সংসারী লোকের মনই তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। বরং শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ গৃহে এসে বাইরের বিতণ্ডা ও বিরক্তি ভুলতে পারা যায়।

আত্মীয়তা-ক্ষেত্র এত জটিল ও গভীর, এত রকম বাধ্যবাধকতাপূর্ণ ও দেনাপাওনাজড়িত যে সেখানে ভদ্রতার চেহারা ভাল ফোটানো যায় না ও বেশী নীতির কাছঘেঁষা হয়ে পড়ে। ঘরের বাইরে অনাত্মীয় যে বিস্তৃত সমাজ পড়ে আছে, সেইখানেই ভদ্রতার যথার্থ রূপ ও কদর বোঝা যায়, সেইটেই তার প্রকৃত

কর্ম্মক্ষেত্র। কারণ, এই ভদ্রতা-সেতু পার হয়ে তবে ত ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গতায় পৌঁছানো যায়—যদি কপালে থাকে।

ভদ্রতা বিস্তৃত নীতিরাজ্যের সামান্য একটি অংশমাত্র হ'লেও তার গৌরব ও প্রয়োজনীয়তা কিছু কম নয়। কথা ও কার্য্য—এই দুই ক্ষেত্রে তাকে বিভক্ত করা যেতে পারে, এবং দুইয়েরই বিধিনিষেধ আছে। সেগুলি এত লোকবিশ্রুত, বাপমায়ে এত ক'রে সেগুলি ছেলেদের মনে বসাবার চেষ্টা করেন যে, পুনরাবৃত্তি বাহুল্য। জানে শোনে সবাই সব, কিন্তু সব সময় কাজে পেরে ওঠে না, সেইটিই দুঃখের বিষয়। "পাঞ্চ্" নামক বিলাতী হাসির কাগজে মজার কথাগুলি প্রায়ই এই দুই শিরোনামাঙ্কিত থাকে:— এক, "Things that had better been left unsaid;" আর এক, "Things that ought to have been expressed otherwise" অর্থাৎ যা না বললে ভাল হ'ত, এবং যা অন্য রকমে বলা উচিত ছিল। ভদ্রতা সম্বন্ধে বাচনিক নিষেধ অধিকাংশ এই দুই শ্রেণীভুক্ত। এ বিষয়ে "সত্যং ব্রুয়াৎ" শ্লোকে যে লাখ কথার এক কথা বলা হয়েছে, তার উপর আর কিছু বলবার নেই। কার্য্যক্ষেত্রে ভদ্রতার এই রকম কোন মূলমন্ত্র আমাদের শাস্ত্রে আছে কিনা জানি না; তবে ইংরাজিতে যাকে ব্যবহারের "Golden rule" (বা সোনার কাঠি!) বলে, সেটা এস্থলেও খাটে। ছেলেবেলায় তার যে অনুবাদ শুনে হাসি পেত, সেটি এই:—"নিজে ব্যবহৃত হ'তে চাহিবে যেমন, কর কর ব্যবহার অপরে তেমন!" এর ভাষা যেমনই হোক্, ভাব ঠিক আছে; এবং তার এই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, ছোটোখাটো বিষয়ে রীতিরক্ষা, এবং অন্যের যাতে সুবিধা, সাহায্য বা তুষ্টিসাধন হয়, তাই করাই ভদ্রতা; ও তদ্বিপরীত করাই অভদ্রতা।

আমাদের রাজদরবার ছিল না ব'লে কিংবা যে কারণেই হোক্,— ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালাদেশে সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের একটু অভাব লক্ষিত হয়। উচ্চ নীচ সম্বন্ধ ব্যতীত সমকক্ষ মেলামেশার সকল অবয়ব যেন এখানে সম্পূর্ণ নয়। অপর জাতের সঙ্গে ব্রাহ্মণের দেখা হ'লে সাধারণ অভিবাদনের কোন নির্দ্দিষ্ট রীতি; আত্মীয়া ভিন্ন অপর স্ত্রীলোককে সম্বোধন করবার কোন শিষ্ট প্রথা নেই। কিংবা আগে থাকলেও, এখন লোপ পেয়েছে। অন্যান্য বিষয়ে যেমন, এ সব বিষয়েও তেমনি, আমরা দায়ে প'ড়ে ইংরাজী সভ্যতার শরণাপন্ন হয়েছি। কিন্তু প্রত্যেক

খুঁটিনাটি বিষয়ে ইংরাজদের নকল করাটা—বিশেষতঃ সামাজিক ক্ষেত্রে, মোটেই শোভন বা বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য এতদূর এগিয়ে এসে হঠাৎ বেশী পিছিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। আমি একলা ঘরে ব'সে একটা মন-গড়া নিয়ম মানলেই ত যথেষ্ট হল না। দশ জনকে যদি সঙ্গে নিতে চাই ত, সাময়িক অবস্থা বুঝে যা রয় সয় এমন নিয়মই চালাবার চেষ্টা করতে হবে। যা' কালের অতল বিস্মৃতিসাগরে চিরবিলুপ্ত, তীরে ব'সে ব'সে তাকে পুনরুদ্ধার করবার বৃথা চেষ্টায় সময় নষ্ট না ক'রে—এখনো যেটুকু দেশীয়তা প্রচলিত আছে, সেটুকু যাতে নব্যভাবের সঙ্গে জড়িত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত।

আত্মীয়তার বাইরেই ভদ্রতার পূর্ণ প্রকাশ ও প্রয়োজনীয়তা যেমন, তেমনি সেই বাইরের সমাজে, আবার কথোপকথনের ক্ষেত্রেই তার চরম বিকাশ লক্ষিত হয়; কারণ, ক্ষণিক মেলামেশার সঙ্কীর্ণ অবকাশে পরস্পরের জন্য হাতে কলমে বিশেষ কিছু করবার সুযোগ কমই পাওয়া যায়। স্ত্রীলোককে পুরুষমানুষে যে ছোটোখাটো সাহায্যগুলি করতে পারে ও করলে ভাল দেখায়, পুরুষসমাজে পরস্পরের মধ্যে তারও বিশেষ আবশ্যক হয় না,—অবশ্য বয়সের বেশী তফাৎ না থাকলে। কিন্তু সমবয়সী ও সমকক্ষ পুরুষসমাজের কথোপকথন স্থলেও আমাদের কতকগুলি জাতীয় দোষ প্রকাশ পায়, যা সংশোধন করতে পারলেই ভাল। মেয়েরাও সে-দোষবর্জ্জিত নয়। প্রথমতঃ আমরা প্রায় সকলেই বেশী চেঁচিয়ে কথা কই: দ্বিতীয়তঃ তর্কস্থলে আমরা অধিকাংশ লোকেই চটে গিয়ে কূটতর্ক, জিদ বা ব্যক্তিগত খোঁটার আশ্রয় নিই; তৃতীয়তঃ আমরা অন্যের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না ক'রে অধীরভাবে মাঝে বাধা দিয়ে কথা বলি (হিত অথচ মনোহারী বাক্যের চেয়ে কি মনোযোগী অথচ সমজদার শ্রোতা বেশী দুর্লভ নয়?)। চতুর্থতঃ আমরা নিজের উপস্থিত ইচ্ছামত কথা ব'কে যাই, শ্রোতা বুঝে কথার বিষয় এবং মাত্রা নির্দ্ধারণ করিনে। আমার শরীরের অসুখ বা আমার মনের ভাবনার বিস্তারিত বিবরণ যে সকলের রুচিকর না বোধ হ'তে পারে সে কথা ভুলে যাই, এবং অন্যকে কথা বলবার বা মতামত ব্যক্ত করবার অবসর দিইনে।

ফলে দাঁড়ায় এই যে, সকলে একসঙ্গে বলে, কিন্তু কেউ শুনে না!—কিংবা ইংরাজিতে যাকে বলে 'oneman-show' তাই হয়, অর্থাৎ একজন-মাত্র বক্তা, আর সকলে শ্রোতা। অথচ আসলে সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা বা

সমালোচনাই সামাজিক মেলামেশার প্রধান সুখ ও সার্থকতা। পঞ্চমতঃ আমরা জেনে শুনে এমন প্রসংগ উত্থাপন করি যা উপস্থিত লোকের পক্ষে অপ্রীতিকর। অথবা এমন ক'রে কথা বলি যাতে তাদের কারো মনে লাগতে পারে—ভাষায় যাকে বলে "ঠেস দিয়ে কথা বলা"।—দরকার কি? ভদ্রতা যদি নীতি না হয় ত ভদ্রসমাজও নীতি উপদেশ বা শাসনদণ্ডের স্থান নয়। বেশী শাসন করতে চাও সমাজ থেকে তাড়াও; কিন্তু যে যতক্ষণ সমাজে আছে তার সংগে ভদ্র ব্যবহার কর। অভদ্রতা না ক'রেও বোধ হয় একজনকে বোঝানো যায় যে তাকে আমার বড় পছন্দ নয়, এবং সময়ে সময়ে তা বোঝানো আবশ্যকও হয়ে পড়ে; কিন্তু এগুলি ভদ্রতার ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়ম নয়। আত্মীয়তার স্থলে ভালবাসার অভাব ভদ্রতায় পূর্ণ করা শক্ত বটে; কিন্তু অনাত্মীয়ক্ষেত্রে ভদ্রতা, বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ক্ষণকালের জন্যও ভূষিত হওয়া ত সহজ ব'লেই বোধ হয়। পর যখন এত অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়, তখন সেটুকু তার জন্য না করাটাই আশ্চর্য্য, করায় কিছু বাহাদুরী নেই। অর্থ বা মানের দম্ভে যাঁরা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন ও মানুষকে মানুষ জ্ঞান করেন না, তাঁরা ভুলে যান যে, মানুষ নইলে মানুষের একদিনও চলে না এবং চিরদিন কারো সমান যায় না।

পরিশেষে আবার বলি যে, ভদ্রতা সর্ব্বরোগের মহৌষধ না হ'লেও, এবং তার প্রসার বা গভীরতা বেশী না থাকলেও, তা ঘরে বাইরে অতি আবশ্যকীয় উপাদেয় জিনিস, এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য,—শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। এক দিনের জন্যও যদি ভদ্রতা সমাজ থেকে ছুটি নেয়, তাহ'লে কি ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হয়, তা মনে করতেও কি হৃৎকম্প হয় না? এক হিসেবে ভদ্রসমাজের সকলেই যেন একটি পাৎলা বরফখণ্ডের উপর নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে,—পায়ের তলায় একটু ভাঙ্গলেই অতল জলে মজ্জমান হবার সম্ভাবনা;—কিন্তু ভাগ্যক্রমে সহজে ভাঙ্গে না। এই ধূলিম্লান পৃথিবীর রুক্ষতাকে মোলায়েম ক'রে এনে দৈনিক জীবনযাত্রার যাতে একটু শ্রী সম্পাদন করতে পারি, সকলেরই কি সেই চেষ্টা করা উচিত নয়? যদি কেউ এর আনুষ্ঠানিক কর্ত্তব্য থেকে রেহাই পেতে পারে ত সে কেবল সেই সকল অসাধারণ লোক, যাঁরা এমন কোন বৃহৎ কাজ বা মহৎ চিন্তায় লিপ্ত আছেন যাতে সমাজের ছোটোখাটো আদেশ পালন করবার সময় পাওয়া অসম্ভব এবং সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকতে হয়;—যাঁরা সংসারে থেকেও সংসার ও সমাজকে অতিক্রম করেছেন। শুধু ভদ্রতার দ্বারা বড় কাজ কিছু হবে না সত্য, কিন্তু

ছোট নিয়েই ত আমাদের অধিকাংশের অধিকাংশ জীবনের কারবার,—ছোট কাজ, ছোট কর্ত্তব্য, ছোট সুখ, ছোট দুঃখ। আমাদের বড় বড় ঋষিরাও ত প্রার্থনা করেছিলেন—"যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।" যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ, তাহাই আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।

—ইন্দিরা দেবী